কাভারিং ইসলাম

এডওয়ার্ড ডব্লিউ সাঈদ

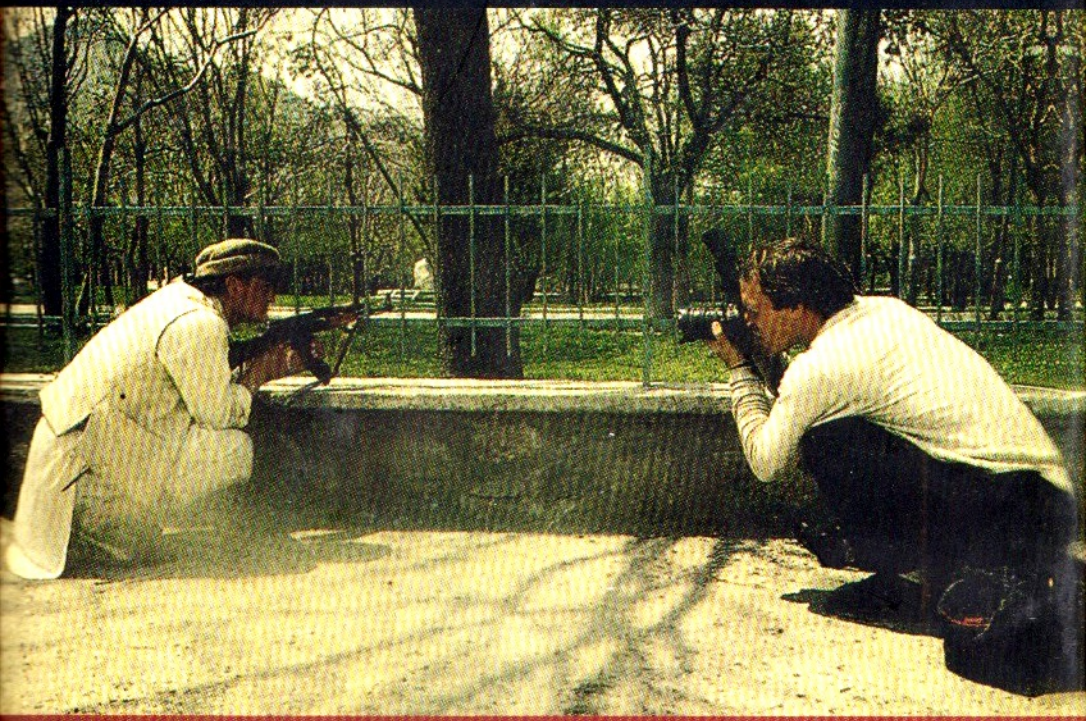

ভূমিকা ও ভাষান্তর

ফয়েজ আলম

প্রচার মাধ্যম ও বিশেষজ্ঞরা যেভাবে নির্ধারণ করে দেয়
অবশিষ্ট পৃথিবীর প্রতি আমাদের দৃষ্টিভঙ্গি

এডওয়ার্ড সাঈদ পণ্ডিত, নন্দনতাত্ত্বিক ও সক্রিয় রাজনীতিকের বিরল সমন্বয়। সকল ক্ষেত্রেই তিনি আমাদের চ্যালেঞ্জ করেন, উদ্দীপ্ত করেন।

- ওয়াশিংটন পোস্ট বুক ওয়ার্ল্ড

ইরানের জিম্মি সঙ্কট থেকে উপসাগরীয় যুদ্ধ ও ওয়ার্ল্ড ট্রেড সেন্টারে বোমা বিস্ফোরণের মধ্য দিয়ে পশ্চিম এখন 'ইসলাম' নামক এক ভূতের আছরে অস্থির। প্রচার মাধ্যম এবং সেই সাথে সরকারী, বিদ্যায়তনিক ও কর্পোরেট বিশেষজ্ঞদের নির্মিত ভাবমূর্তির কারণে ইসলাম যেন সন্ত্রাস ও ধর্মোন্মাদনার আরেক নাম। একই সময়ে, ইসলামী দেশগুলো 'ইসলাম'-এর নামে বৈধ করে নিচ্ছে তাদের জনসমর্থনহীন ও প্রায়শই দমনমূলক শাসন ব্যবস্থা।

আমাদের এক প্রধানতম গণচিন্তাবিদ অনুসন্ধান করে দেখেছেন প্রচার মাধ্যমের নির্মিত আদিম ইসলামের ভাবমূর্তির গোড়াটা কোথায়, এ থেকে উদ্ভূত পরিস্থিতিগুলো কেমন। রাজনৈতিক ভাষ্য ও সাহিত্য সমালোচনার সমন্বয়ে এডওয়ার্ড সাঈদ দেখিয়েছেন ইসলাম সম্পর্কে সবচেয়ে 'নিরপেক্ষ' কাভারেজের পেছনেও সক্রিয় থেকেছে গোপন আন্দাজ ও বয়ানী বিকৃতি।

এডওয়ার্ড সাঈদ আমেরিকার সেইসব গুটিকয় ব্যক্তির একজন যারা বাকী পৃথিবী সম্পর্কে বোধগম্য কথা বলেন (লিখেনও চমৎকার)।

- গার্ডিয়ান

মূল্য : ২০০ টাকা

ফয়েজ আলম, কবি, গবেষক, প্রাবন্ধিক; জন্ম ১৯৬৮, নেত্রকোনার আটপাড়া থানার যোগীরনগুয়া গ্রামে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগ থেকে অনার্সসহ এম. এ. পাশ করার পর প্রাচীন বাঙালি সংস্কৃতি বিষয়ক গবেষণার জন্য এম ফিল. ডিগ্রী লাভ করেন। এখন কাজ করছেন ময়মনসিংহের পালাসাহিত্যে বাঙালি সমাজ ও সংস্কৃতির রূপ নিয়ে পিএইচ. ডি. ডিগ্রীর জন্য।

সাহিত্য ও চিন্তার ক্ষেত্রে বিচিত্রমুখি বিচরণ তার। এশিয়া ও আফ্রিকার প্রাক্তন-উপনিবেশগুলোয় গত কয়েক দশক ধরে উত্তর-উপনিবেশি ভাবনার যে প্রলম্বিত উদ্বোধন চলছে তার প্রাণাবেগ ও দৃষ্টি ধারণ করে আমাদের বুদ্ধিবৃত্তিক ও সৃজনশীল গতিপ্রকৃতি যাচাই করে নিতে আগ্রহী ফয়েজ আলম। মানবিক দায়বোধ ও ঐতিহ্যঘনিষ্ঠতার পটভূমি থেকে উদ্বুদ্ধ তার ভাবনার নতুনত্ব ও তার অন্তর্দৃষ্টি আলোড়িত করবে যে-কোনো মনোযোগী পাঠকের চিন্তার জগতকে।

লেখকের অন্যান্য গ্রন্থ : *ব্যক্তির মৃত্যু ও খাপ-খাওয়া মানুষ* (কবিতা, ১৯৯৯), *প্রাচীন বাঙালি সমাজ ও সংস্কৃতি*, (গবেষণা, ২০০৪), *এডওয়ার্ড সাঈদের অরিয়েন্টালিজম* (অনুবাদ, ২০০৫), *উত্তর-উপনিবেশি মন* (প্রবন্ধ, ২০০৬, *জ্যাক দেরিদা* (যৌথ সম্পাদনা, ২০০৬)।

কা ভা রিং ই স লা ম

www.pathagar.com

www.pathagar.com

কাভারিং ইসলাম

এডওয়ার্ড ডব্লিউ সাঈদ

ভূমিকা ও ভাষান্তর

ফয়েজ আলম

www.pathagar.com

কাভারিং ইসলাম
এডওয়ার্ড ডব্লিউ সাঈদ

ভূমিকা ও ভাষান্তর
ফয়েজ আলম
১৯৯৭ সালের ভিন্টেজ সংস্করণ থেকে ভাষান্তরিত

© লেখক

সংবেদ প্রকাশনা ২

প্রথম প্রকাশ
ফেব্রুয়ারি ২০০৬

প্রকাশক
পারভেজ হোসেন
সংবেদ, ৮৫/১, ফকিরেরপুল, ঢাকা-১০০০

প্রচ্ছদ
মূল বইয়ের ছবি অবলম্বনে

কম্পোজ
কালজয়ী কম্পিউটার্স
৫ আজিজ সুপার মার্কেট (২য় তলা), শাহবাগ, ঢাকা ১০০০

মুদ্রণ
সংবেদ প্রিন্টিং পাবলিকেশন, ৮৫/১, ফকিরেরপুল, ঢাকা

মূল্য : দুইশত টাকা

ISBN 984 32 1896 0

একমাত্র পরিবেশক
মাওলা ব্রাদার্স, ৩৯, বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০
ফোন : ৭১৭৫২২৭, ৭১১৯৪৬৩

Covering Islam by Edward W. Said, February 2006, Published by : Parvez Hossain, Sangbed. 85/1, Fakirerpool. Dhaka-1000. Price : Tk. 200.00

www.pathagar.com

উৎসর্গ : মরিয়ম সাঈদ

www.pathagar.com

www.pathagar.com

অনুবাদকের ভূমিকা

এক.

জ্ঞান ও ক্ষমতা সম্পর্ক নিয়ে পৃথিবী জুড়ে লেখালেখির ঐতিহ্য বেশ পুরোনো। এমনকি উপনিবেশের শেষ পর্যায়েই অনেকে এ দুয়ের জোটবদ্ধ কুকর্মের আভাসটা ধরতে পেরেছিলেন। তবে এ বিষয়ে গভীর অন্তর্দৃষ্টি ও অনুসন্ধিৎসা নিয়োজিত হয় আরো পরে, ক্রমান্বয়ে, যার ফলে আমরা সি. রাইট মিলস্, আনওয়ার আবদেল মালেক, মিশেল ফুকো, নোয়াম চমস্কি, এডওয়ার্ড সাঈদের রচনার মতো অসামান্য কাজের সাক্ষাৎ পাই। ক্ষমতার তাবেদার প্রাতিষ্ঠানিক পণ্ডিত, পক্ষপাতমুখি বুদ্ধিজীবী, চরম জাতীয়তাবাদী ও জাত্যাভিমানী লেখকরা সচেতন বা অসচেতনভাবে তাদের জ্ঞান ও বুদ্ধিকে যেভাবে ক্ষমতার প্রয়োজনে নিয়োজিত করেন তা আমাদের কাছে আর কোনো রহস্য নয়, পুরো বিষয়টি এখন উন্মোচিত, নগ্ন, ঘৃণিত।

ক্ষমতার তাত্ত্বিক দিক নিয়ে যাঁর কাজ এখন পর্যন্ত সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করা হয়, সেই মিশেল ফুকো মনে করেন ক্ষমতা সর্বব্যাপী, তা ছড়িয়ে পড়ে সকল কিছুতেই। তাঁর তাত্ত্বিক সিদ্ধান্তের একটা প্রমাণ হতে পারে আজকের প্রচার মাধ্যমের মতিগতির বিশ্লেষণ, বিশেষত পশ্চিমা প্রচার মাধ্যম এবং তাদের অনুকরণে তৃতীয় বিশ্বের প্রচার মাধ্যমের একটা অংশ। পণ্ডিত, শিক্ষক, কবি-সাহিত্যিকদের কুক্ষিগত করার পাশাপাশি ক্ষমতা প্রচার মাধ্যমকেও দলভুক্ত করার চেষ্টা চালিয়ে যায়। এই চেষ্টা বিশ্বজনীন, নির্বিশেষে মানবীয়; স্থান ও কাল ভেদে এর রূপ ভিন্ন হতে পারে—কিন্তু মূল প্রবণতায় ফারাক নাই। ক্ষমতার স্বার্থে ব্যবহৃত হওয়ার জন্য প্রচার মাধ্যমের ওপর যে চাপ পর্যায়ক্রমে আরোপ করা হয়েছে সম্ভবত এখনই তা সর্বোচ্চ বিন্দু ছুঁয়ে আছে।

কীভাবে তা ঘটে? কী কারণে, কোন প্রেক্ষিতে? তার প্ররোচক পরিস্থিতিগুলো কী কী?... এসব জিজ্ঞাসাও জবাব নিয়েই রচিত এডওয়ার্ড সাঈদের প্রখ্যাত গ্রন্থ *কাভারিং ইসলাম*। বইটি প্রচার মাধ্যমের তৎপরতা সম্পর্কে... বলা ভালো, প্রচার মাধ্যমে যে অংশটি ক্ষমতার তাবেদার তার কু-কুর্মের বিশ্লেষণ নিয়ে। তবে এখানে সাঈদের বিশ্লেষণের কাঁচামাল অর্থাৎ উপাত্ত নেয়া হয়েছে ইসলাম সম্পর্কিত প্রচারণা থেকে।

ইরানী বিপ্লবের সময় যুক্তরাষ্ট্র সরকারের সাম্রাজ্যবাদী মনোভাবের সহায়ক হিসেবে আবির্ভূত হয় কিছু প্রচার মাধ্যম। তৎকালীন ইরানের সবচেয়ে প্রভাবশালী নেতা খোমেনির চরিত্র হননসহ ঘটনার বিবরণে বিকৃতি, ঐতিহাসিক, সাংস্কৃতিক ও ধর্মীয় দিক থেকে ইরানকে হেয় করাসহ সবধরনের প্রচেষ্টা চালায় ওরা। যেহেতু ইরান মুসলিম দেশ তাই ইরানীদেরকে ধর্মীয়ভাবে হেয় করার অর্থ ইসলামের বিরুদ্ধে প্রচারণা। ঠিক এ কাজটিই করে মার্কিন প্রচার মাধ্যম। কিন্তু সাঈদ দেখিয়েছেন এর মধ্যে কোনো ধর্মীয়

www.pathagar.com

বিদ্বেষ নেই, এমন নয় যে তা খ্রিস্টান ধর্ম ও ইসলাম ধর্মের মধ্যে ঘটিত সংঘাত। বরং পুরো ব্যাপারটিই রাজনৈতিক... সাম্রাজ্যবাদী আকাঙ্ক্ষার প্ররোচনায় সংঘটিত।

ইরানের বিরুদ্ধে অপপ্রচারের সাথে সংশ্লিষ্ট উপাত্ত সাঈদের প্রধান অবলম্বন হলেও, ফিলিস্তিনী মুক্তি সংগ্রাম, দক্ষিণ লেবাননে সংগ্রামরত হিজবুল্লাহ গেরিলাদের সম্পর্কে অপ-প্রচারণাও আলোচনাও এসেছে।

কাভারিং ইসলাম-এর প্রথম প্রকাশ ১৯৮১ সালে। *অরিয়েন্টালিজম* লিখে সাঈদ প্রাচ্যতাত্ত্বিক বুদ্ধিজীবী বৃত্তে ধ্বস নামিয়েছিলেন, সৃষ্টি করেছিলেন অসংখ্য বুদ্ধিবৃত্তিক শত্রু। কাভারিং ইসলাম-এ তিনি পশ্চিমা প্রচার মাধ্যমের বড়ো একটা অংশের সাম্রাজ্যবাদী রূপটি উন্মোচন করেন। এর ফলে তিনি আর কখনো প্রচার মাধ্যমের সুনজরে আসতে পারেননি।

*কাভারিং ইসলাম*কে বলা যায় ধারাবাহিক রচনার একটা অংশ। সাঈদের নিজের ভাষায়,

> পশ্চিম... ফ্রান্স, বৃটেন ও বিশেষ করে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সাথে ইসলাম, আরব ও প্রাচ্যের আধুনিক সম্পর্কটা কী রকম আমি তা দেখানোর চেষ্টা করেছি তিনটি ধারাবাহিক বইয়ে; *কাভারিং ইসলাম* তার শেষ কিস্তি। এগুলোর মধ্যে *অরিয়েন্টালিজম* সবচেয়ে সামগ্রিক আলোচনা; ঐ সম্পর্কের বিভিন্ন পর্যায়গুলো সনাক্ত করা হয়েছে ওতে।... পরের বই *দি কোশ্চেন অব প্যালেস্টাইন* একটা লড়াইয়ের কেস হিস্ট্রী। লড়াইটা স্থানীয় আরবদের সাথে ইহুদিবাদী আন্দোলনের (পরে ইসরাইল); আরবদের বেশিরভাগই মুসলমান।... *কাভারিং ইসলামে* আমার বিষয় একেবারেই সাম্প্রতিক; পশ্চিমের চৈতন্যে ইসলামের যে ভাবমূর্তি অঙ্কিত হয়েছে তার প্রতি পশ্চিমের বিশেষ করে আমেরিকার প্রতিক্রিয়া (*কাভারিং ইসলামের ভূমিকা*)।

সাঈদের উদ্ধৃতিটি *কাভারিং ইসলাম* বোঝার ক্ষেত্রে জরুরী সহায়ক সূত্র হতে পারে। *অরিয়েন্টালিজমে* সাঈদ সাম্রাজ্যবাদের যে চেহারা উন্মোচিত করেছেন তারই একটা প্রায়োগিক দৃষ্টান্তের বিশ্লেষণ এ গ্রন্থ। মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ যে প্রচার মাধ্যমকেও তার দোসর বানিয়ে আগ্রাসনের সহায়ক শক্তিরূপে ব্যবহার করছে তার প্রায়-অসংখ্য প্রমাণ আছে বর্তমান গ্রন্থে।

কাভারিং ইসলাম-এ সাঈদ প্রতিদিনের সংবাদ পরিবেশন, ফিচার, প্রবন্ধ-নিবন্ধ, সাক্ষাৎকার ঘেঁটে দেখান পশ্চিমের প্রচার মাধ্যম দীর্ঘদিন ধরে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের মুসলমানদেরকে খুনী, সন্ত্রাসী, অপহরণকারী হিসাবে চিত্রিত করে আসছে। অথচ বাস্তবে কেবল সংখ্যালঘু একদল মুসলিমই সন্ত্রাসী তৎপরতায় জড়িত, তাদের অধিকাংশই প্রথম দিকে কোনো না কোনোভাবে প্রত্যক্ষ মার্কিন সহায়তায় সন্ত্রাসী গ্রুপ গড়ে তুলেছিল। আবার প্রতিটি মুসলিম দেশেই যে চরমপন্থী মুসলিম সন্ত্রাসীদের বিরুদ্ধে বিশাল উদারনৈতিক গোষ্ঠী তৎপর সে কথা উল্লেখও করা হয় না।

ফিলিস্তিনী মুসলমানদের স্বাধীনতা সংগ্রামকে অথবা সাম্রাজ্যবাদী আগ্রাসনের মুখে আত্মরক্ষার জন্য ইরানের যুদ্ধকৌশলকে ব্যাখ্যা করা হয় সন্ত্রাসী তৎপরতা বলে, কিন্তু আগ্রাসনের নিন্দা করা হয় না। এ হল প্রচার মাধ্যমের ভাষ্য সৃষ্টির রাজনীতি,

www.pathagar.com

প্রাচ্যতত্ত্বের বাস্তব প্রয়োগ। প্রাচ্যতত্ত্ব মুসলমানদের সম্পর্কে যে নমুনা তৈরি করেছে তা-ই চাপিয়ে দেয়া হচ্ছে গোটা মুসলিম জনগোষ্ঠীর ওপর। একদল সন্ত্রাসী মুসলমানের দৃষ্টান্ত দেখিয়ে বলা হচ্ছে ইসলাম সন্ত্রাসের ধর্ম, মুসলমান মানেই সন্ত্রাসী। সাঈদ আমাদেরকে পশ্চিমা প্রচার মাধ্যমের এই তৎপরতা ও তার ভাষ্যের রাজনীতি সম্পর্কে সতর্ক করেন।

দুই.

বিষয় তো বটেই, সাঈদের বিশ্লেষণের ভঙ্গিটাও গুরুত্বপূর্ণ; *কাভারিং ইসলাম*-এও আমরা সেই অসাধারণ কৌশলের অন্তর্দৃষ্টি থেকে বঞ্চিত হইনি। তিনটি অধ্যায়ের মোট দশটি পরিচ্ছেদে সাঈদ পদ্ধতিগতভাবে সনাক্ত করেছেন ইসলাম সম্পর্কে প্রচার মাধ্যমের এ জাতীয় প্রচারণার শুরুটা কোথায়, আর কিভাবেই তা বর্তমান রূপ লাভ করে।

১৯৭৩ সালে যুক্তরাষ্ট্রের সাম্রাজ্যবাদী আগ্রাসনের বিরুদ্ধে আরব দেশগুলো তাদের তেলের অস্ত্র নিয়ে দাঁড়াবার চেষ্টা করলে আরব-পশ্চিম সম্পর্ক একটা নতুন মাত্রা পায়, যার সাথে সম্পর্কিত বর্তমান পরিস্থিতি। এর আগে আরবরা ছিলো আধিপত্যের অধীন ও সংগ্রামরত, আর পশ্চিম আধিপত্যশীল... এই রকম একটা সম্পর্ক স্থিত হয়েছিল দুই দিকের মধ্যে। '৭৩ সালে তেলের সরবরাহ বন্ধ হয়ে যাওয়ায় আমেরিকানদের জ্বালানী সঙ্কট দেখা দেয়। এ সঙ্কটের বোধ যতটা না বাস্তব তার চেয়ে বেশি প্রচারণা। বাড়তি লাভের জন্য তেল কোম্পানীও তেলের দাম বাড়িয়ে দেয়, একই কারণে তেলের মজুদ থাকা সত্ত্বেও কৃত্রিম সঙ্কট সৃষ্টির চেষ্টা চলে। এই গোটা প্রক্রিয়াটি প্রচার মাধ্যমের একটি অংশ কর্তৃক গৃহীত হয় বিশ্বস্ততার সাথে। এর সাথে সংশ্লিষ্ট সাংবাদিকরা প্রকৃত অনুসন্ধানী দৃষ্টি নিয়ে তদন্ত করে দেখেননি সঙ্কটের বোধটা কৃত্রিম কিনা, বরং তেল কোম্পানী ও সরকারের মনোভাবটাই বিশ্বস্ততার সাথে প্রচার করেন। ফলে অচিরেই আমেরিকানদের মধ্যে এমন একটা অনুভূতি তৈরি হয় যে, আরব দেশগুলোর মানুষেরা অন্যায়ভাবে তেল আটকে দিয়ে তাদের স্বচ্ছন্দ জীবনে সঙ্কট নিয়ে এসেছে। এসময় প্রচার মাধ্যম মুসলমানদেরকে ভিলেন হিসেবে চিত্রিত করতে শুরু করে। সিনেমা, টিভি, পত্রপত্রিকায় প্রকাশিত বিজ্ঞাপনে প্রায়ই দেখা যায় তেলের মালিক আরব শেখেরা অত্যন্ত দুশ্চরিত্র মানুষরূপে আবির্ভূত। ক্রমে এ মনোভাব ছড়িয়ে পড়ে সাধারণ মানুষের মধ্যে। তেল সঙ্কটের নিষ্পত্তি হওয়ার পর ঠিক উল্টো কোনো প্রক্রিয়া অর্থাৎ আরবদের আবার আগের মতো দেখানোর প্রয়াস কিন্তু প্রচার মাধ্যমের পক্ষ থেকে হয়নি। ফলে আরবদের সম্পর্কে খারাপ ধারণাই গণমানসে স্থায়ী হয়ে যায়।

১৯৭৫ সালে কমেন্টারী পত্রিকায় বেশ কিছু নিবন্ধ লেখেন ডানিয়েল প্যাট্রিক ময়নিহান ও রবার্ট ডব্লিউ থুকার। লেখাগুলোর বক্তব্য ছিলো প্রাক্তন-উপনিবেশগুলোকে স্বাধীন হতে দেয়া ঠিক হয়নি; কারন তারা পশ্চিমকে উৎপাত করছে, ভেঙ্গে ফেলছে ঐতিহ্যক নিয়ম-শৃঙ্খলা। এখন প্রয়োজন এই সব দেশকে আবার দখল করে নেয়া। ১৯৭৫ থেকে ৭৭ পর্যন্ত মধ্যপ্রাচ্য বিষয়ে অনুষ্ঠিত বিভিন্ন সেমিনারে একই মনোভাব প্রকাশ পায়। ১৯৭৮ সাল থেকে ইরানে গোলযোগ শুরু হলে ইসলাম সম্পর্কে পশ্চিমের

www.pathagar.com

মনোভাব এবং ইরানের প্রতি পশ্চিমের দৃষ্টিভঙ্গি স্থিত হয় একই বিন্দুতে এসে। ইরানের স্বৈরশাসক রেজা পাহলভীকে যুক্তরাষ্ট্রে আশ্রয় দেয়া হয়, এদিকে তেহরানস্থ মার্কিন দুতাবাস দখল করে নেয় বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্ররা, ৫২ জন মার্কিন কূটনৈতিককে জিম্মি করে। ফলে ইরানীরা মার্কিনদের চোখে হয়ে ওঠে শয়তানের নমুনা, সেই সাথে সকল মুসলমানই।

প্রধানত তেল ও ইরান কেন্দ্রিক পশ্চিমা মনোভাব আরোপিত হয় গোটা মুসলিম বিশ্বের ওপর। সেই সাথে আগুনে তেল ঢালার মতো ঘটনা ঘটাতে থাকে একদল জঙ্গী মুসলমান। এরা বিভিন্ন দেশে বোমা বিস্ফোরণ ঘটায়, আরো বিস্ফোরণের হুমকি দেয়। সবমিলিয়ে নিরপেক্ষ মানুষের মধ্যেও মুসলমানদের প্রতি সহানুভূতি কেবলই কমতে থাকে। একেবারেই সংখ্যালঘু জঙ্গী মুসলমানদের ভাবমূর্তিও আরোপিত হয় মুসলমান ও ইসলাম ধারণাটির ওপর।

আরেকটি জিনিষ বিশ্লেষণে তুলে আনেন সাঈদ, তা হচ্ছে প্রচার মাধ্যমের প্রচারণার তাত্ত্বিক উৎস। সাঈদ দেখান চাকুরী, অর্থ ও খ্যাতির লোভে পশ্চিমের কতিপয় পণ্ডিত তাদের সরকার ও করপোরেশনগুলোর চাহিদামতো ইসলামের বিরুদ্ধে বিষোদগার করে। এই সব তাত্ত্বিকদের আছে প্রাতিষ্ঠানিক পরিচিতি ও বিশ্বস্ততা। ফলে ইসলাম সম্পর্কে তাদের বক্তব্যও বিশ্বস্ততা অর্জন করে ও প্রচার মাধ্যমের লোকদের দ্বারা গৃহীত হয়। কোনো সাংবাদিক যখন ইসলাম সম্পর্কে লিখতে যান তখন তিনি ইসলামের পরিচয় দিতে গিয়ে তার বিশ্বস্ত পণ্ডিতের লেখা থেকেই উদ্ধৃত করেন। এভাবে ইসলাম সম্পর্কিত কিছু ধারণা লাভ করে সত্যের মর্যাদা, যার পেছনে সাম্রাজ্যবাদী জ্ঞান ও জ্ঞানীদের ভূমিকাও ছিলো গুরুত্বপূর্ণ।

ইসলাম সম্পর্কে পশ্চিমের জ্ঞানের স্বরূপ তুলে ধরতে গিয়ে সাঈদ জ্ঞানের উৎপাদন ও বিস্তৃতি সম্পর্কে অত্যন্ত জরুরী আলোচনা করেছেন "জ্ঞান ও ক্ষমতা" অধ্যায়ে। তিনি দেখিয়েছেন জ্ঞান হলো তাফসীর, একরকম ব্যাখ্যা, যার মধ্যে প্রভাব থাকে স্থান, কাল, পাত্র ও পরিবেশের। কাজেই ইসলাম সম্পর্কে পশ্চিমের জ্ঞান হচ্ছে ইসলাম সম্পর্কে পশ্চিমা-পণ্ডিতদের তাফসীর। এই তাফসীর যেহেতু লাভজনক প্রতিষ্ঠান, সরকার ও করপোরেশনের ছাত্রছায়ায় সম্পন্ন হয়, তাই তাতে সরকারী ও জাতীয় মতেরও প্রতিফলন ঘটে। আর এভাবে রাষ্ট্রের সাম্রাজ্যবাদী ইচ্ছা প্রতিষ্ঠান-পণ্ডিতবর্গ-প্রচার মাধ্যম হয়ে জায়গা করে নেয় গণপর্যায়ে বহমান সংস্কৃতিতে। তাই আজ ইসলাম মানেই সন্ত্রাস, হত্যা, রক্তপাত, স্বৈরাচার ইত্যাদির সমাহার।

ইসলামের এই যে ভাবমূর্তি, তা কোন দিক দিয়ে ক্ষতিকর সে ব্যাখ্যাও দিয়েছেন সাঈদ। এধরনের অপ্রপ্রচারণা একদিকে পশ্চিমের রাজনৈতিক সম্প্রদায়কে উস্কে দিয়ে ইসলামী রাষ্টগুলোর বিরুদ্ধে যুদ্ধ শুরু করাতে পারে, যার একটা প্রবণতা আমরা দেখছি গত দুই দশক ধরে; অন্যদিকে এর প্রতিক্রিয়া স্বরূপ ইসলামী দেশগুলোতেও পশ্চিম-বিরোধিতা বাড়ছে। সাঈদ সতর্কতামূলক ইঙ্গিত দিয়ে বলেন এমন একদিন আসতে পারে অনেক যুদ্ধ ও হত্যাযজ্ঞের পর ইসলাম প্রকৃত অর্থেই ক্ষমতা অর্জন করবে। তখন যে ধরনের প্রতিক্রিয়া ও হিংসাত্মক কার্যকলাপের মধ্য দিয়ে তা ঘটবে

www.pathagar.com

তারই প্রতিফলন ঘটতে পারে ভবিষ্যত কালের মুসলমানদের মধ্যে। গ্রন্থের শেষ প্যারায় সেই দিকটায় আলোকপাত করেছেন সাঈদ—

> পশ্চিমে ইসলাম সম্পর্কিত জ্ঞানের ইতিহাস যদি দখল ও আধিপত্যের সাথে অত্যন্ত ঘনিষ্টভাবে বাঁধা হয়ে থাকে, তাহলে এখন সেই বাঁধন ছিঁড়ে ফেলে দেয়ার সময় এসে গেছে। এ ব্যাপারে যে কোনো মাত্রার জোরপ্রদানই বেশি বলে গণ্য হবে না। কারণ তা না হলে আমরা যে দীর্ঘস্থায়ী উত্তেজনা... হয়তো যুদ্ধেরও মুখোমুখি হব কেবল তা-ই নয়, বিভিন্ন মুসলিম সমাজ ও রাষ্ট্রসমেত গোটা মুসলিম বিশ্বের কাছে তুলে ধরব বহু যুদ্ধ, অকল্পনীয় দুর্ভোগ ও সর্বনাশা অভ্যুত্থানের সম্ভাবনাও। এ ছাড়াও আছে এমন এক বিজয়ী "ইসলাম"-এর প্রসঙ্গ যা তার ভূমিকা পালনের জন্য প্রতিক্রিয়া, রক্ষণশীলতা ও বেপরোয়া মনোবৃত্তির মধ্য দিয়ে প্রস্তুত হয়ে থাকবে। জোর আশাবাদিতার আলোকেও কিছুতেই সুখকর নয় সে সম্ভাবনা।

কাভারিং ইসলাম গ্রন্থের এ বৈশিষ্ট্যের মধ্যেই আমরা পাই সাঈদের কণ্ঠস্বর... মানবতাবাদী, সাহসী, নিজস্ব নৈতিক অবস্থানের কাছে দায়বদ্ধ এক মানুষ। পৃথিবীর যে কোনো মানুষের ওপর পরিচালিত আগ্রাসন, দমন-নিপীড়নের বিরুদ্ধে তিনি সোচ্চার। সে মানুষ হতে পারে ব্যক্তি, বা ক্ষুদ্র গোষ্ঠী কিংবা বৃহৎ কোনো জাতি; সেই ব্যক্তি বা জাতি আগ্রাসন ও দমনের শিকার হলে সাঈদের বুদ্ধিবৃত্তিক চৈতন্য আহত বোধ করে। তিনি পরিষ্কার জানতেন যে, কোনো মানুষের ওপর আধিপত্য বা দমন-পীড়ন ডেকে আনবে একইরকম প্রতিক্রিয়া, যা পরিশেষে বিশ্বজনীন মানব সমাজের জন্যও অশান্তিদায়ক। তাই সম ও সহ অবস্থান ছিল তাঁর আকাঙ্ক্ষিত প্রকল্প। এর প্রকাশ আছে তার অন্যান্য রচনায়। *কাভারিং ইসলাম*ও তার ব্যতিক্রম নয়।

তিন.

এডওয়ার্ড ডব্লিউ সাঈদের জন্ম ১৯৩৫ সালে, ফিলিস্তিনের জেরুজালেমে, এক খ্রিস্টান পরিবারে। ইসরাইলের সামরিক আগ্রাসনের কারণে আরো অনেক ফিলিস্তিনী পরিবারের মতো সাঈদের পরিবারও উদ্বাস্তু হয়ে মিশরে পাড়ি জমায়। এরপর সাঈদ চলে যান আমেরিকায়, ওখানে পড়াশোনা শেষে কলাম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে ইংরেজি ও তুলনামূলক সাহিত্যের অধ্যাপনায় যোগ দেন। ওখানেই আমৃত্যু কর্মরত ছিলেন। দীর্ঘদিন ক্যান্সারের সাথে লড়াই করে ২০০৩ সালের সেপ্টেম্বরে মৃত্যুবরণ করেন বিশ শতকের অন্যতম শ্রেষ্ঠ এই চিন্তাবিদ ও বুদ্ধিজীবী।

২০০৩ সালে এডওয়ার্ড সাঈদের দুঃখজনক মৃত্যুর পর এদেশে অনেক লেখক-বুদ্ধিজীবী, সাহিত্যিক, সাংবাদিক আন্তরিক শোক ও শ্রদ্ধা জানিয়েছেন, যার সংখ্যা ও মাত্রাগত পরিমাণ এককথায় বিশাল। ২০০৪ সালে *অরিয়েন্টালিজমে*র অনুবাদ বেরুবার পর অত্যন্ত আগ্রহব্যঞ্জক সাড়া পাই। বিভিন্ন পাঠচক্র, সেমিনার, সাহিত্যিক আড্ডায় সাঈদ সম্পর্কে কথা বলতে গিয়ে দেখেছি বিশ শতকের এই অসাধারণ মনীষীর ব্যাপারে আমাদের বিশেষত তরুণ প্রজন্মের আগ্রহ অপরিসীম। পশ্চিমের সাম্রাজ্যবাদী

www.pathagar.com

আগ্রাসনের বিরুদ্ধে আমাদের লড়াইয়ে সাঈদকেও যে গুরুতপূর্ণ পথপ্রদর্শক মনে করা হয় এগুলো তারই প্রমাণ। এজন্যই *কাভারিং ইসলাম* অনুবাদে হাত দিই।

অনুবাদের ব্যাপারে প্রকাশক, কথাসাহিত্যিক পারভেজ হোসেন উৎসাহ উদ্দীপনা যুগিয়ে আমাকে সচল রেখেছেন। আন্তর্জাতিক রাজনীতির বিশ্লেষক ওবেইদ জায়গীরদার ইরানী বিপ্লবের আভ্যন্তরীণ গতিধারা সম্পর্কে অনেক বিষয় অবহিত করায় সংশ্লিষ্ট অংশের অনুবাদ সহজ হয়েছে। স্ত্রী জোহরা প্রায় সার্বক্ষণিকভাবে লেগেছিলেন, কাজটা শেষ হওয়ার আগ পর্যন্ত। আমার লেখার প্রতি তার আগ্রহ অফুরন্ত। আজকের কাগজের সাহিত্য সম্পাদক শামীম রেজা তাঁর পাতায় *কাভারিং ইসলাম*-এর ভূমিকা অংশের অনুবাদ ছেপেছেন বিশেষ যত্ন সহকারে। কথাশিল্পী ফখরুল চৌধুরী ও মনির জামান এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাজবিজ্ঞান বিভাগের দ্বিতীয় বর্ষের ছাত্র মুজিব রহমানের উদ্দীপক সঙ্গ এ অনুবাদের ক্ষেত্রেই নয় কেবল, অন্যান্য লেখাতেও ফলপ্রসূ ভূমিকা রেখেছে। এদের সবাইকে ধন্যবাদ।

সেন্টার ফর স্টাডি অব সোশিওলজি এন্ড এনথ্রোপলজির উদ্যোগে অনুষ্ঠিত এডওয়ার্ড সাঈদ স্মরণ সভার সাথে সংশ্লিষ্ট সকলকে এ সুযোগে ধন্যবাদ জানাই। এদেরই উদ্যোগে অনুষ্ঠিত তিনটি জনবহুল পাঠচক্রের কথাও মনে করি।

ফয়েজ আলম
মিরপুর, ঢাকা।
২২শে জানুয়ারি

www.pathagar.com

সূচিপত্র

অনুবাদকের ভূমিকা
ভিন্টেজ সংস্করণের ভূমিকা ১৫
ভূমিকা ৪৬

প্রথম অধ্যায়
সংবাদ হিসেবে ইসলাম

১. ইসলাম ও পশ্চিম ৬৭
২. তাফসীরকারী সম্প্রদায় ৯৩
৩. পরিপ্রেক্ষিতে শাহজাদীর কাহিনী ১১৯

দ্বিতীয় অধ্যায়
ইরান কাহিনী

১. পবিত্র যুদ্ধ ১২৯
২. হারানো ইরান ১৪০
৩. অপরীক্ষিত গোপন আন্দাজ ১৫২
৪. অন্য এক দেশ ১৫৯

তৃতীয় অধ্যায়
জ্ঞান ও ক্ষমতা

১. ইসলাম বিষয়ে তাফসীরের রাজনীতি : রক্ষণশীল ও বিরোধী জ্ঞান ১৬৭
২. জ্ঞান ও তাফসীর ১৮২

তথ্যসূত্র ১৯১

www.pathagar.com

www.pathagar.com

ভিন্টেজ সংস্করণের ভূমিকা

কাভারিং ইসলাম প্রকাশিত হয় পনর বছর আগে। এর মধ্যে মার্কিন এবং পশ্চিমা প্রচার মাধ্যমের নজর তীব্রভাবে ঘনীভূত হয়েছে মুসলমান ও ইসলামের ওপর। এর অনেকটাই অতিরঞ্জিত, ছাঁচ-বানানোর দোষে দুষ্ট এবং উন্মত্ত বৈরিতায় আচ্ছন্ন; আমার বইয়ে যতটা বর্ণনা করেছিলাম তার চেয়ে বেশি। আসলে ছিনতাই ও সন্ত্রাসে ইসলামের ভূমিকা, 'আমাদের' এবং আমাদের জীবনযাপনের রীতিনীতির ওপর ইরানের মত কট্টর দেশগুলোর হুমকি প্রদানের বর্ণনা এবং দালান-কোঠা উড়িয়ে দেয়া, বাণিজ্যিক বিমান বিস্ফোরণ ও পানি সরবরাহ ব্যবস্থায় বিষ প্রয়োগের সর্বশেষ ষড়যন্ত্র প্রভৃতি আন্দাজী কথাবার্তা ক্রমেই উস্কে দিচ্ছে পশ্চিমের চৈতন্য। ইসলামী বিশ্বের ব্যাপারে একদল বিশেষজ্ঞ এখন খ্যাতনামা। জরুরী পরিস্থিতিতে সংবাদ প্রোগ্রাম বা টকশো-য় গৎবাঁধা ধারণার ভিত্তিতে বুদ্ধিবৃত্তিক ফতোয়া জারির জন্য এদেরকে এনে সামনে খাড়া করা হয়। কিছুকাল আগেও মনে করা হতো মুসলিম বা অ-শ্বেতাঙ্গদের সম্পর্কে প্রাচ্যতাত্ত্বিক ধারণা পোষণ করা একরকম নেতিবাচক ব্যাপার। এখন ওসবেরই যেন পুনরুজ্জীবন শুরু হয়েছে। এই মুহূর্তে এমন এক সময়ে ঐসব ধারণা জনপ্রিয় হচ্ছে যখন অন্য কোনো সাংস্কৃতিক পরিচয়ের মানুষদেরকে বর্ণ বা ধর্মের দিক থেকে ভুলভাবে তুলে ধরলে অত সহজে পার পাওয়া যায় না। পশ্চিমে এখন ভিনদেশী সংস্কৃতিকে ছোটো করার সর্বশেষ গ্রহণযোগ্য উপায় হলো ক্ষতিকর উদ্দেশ্যে সুপরিকল্পিত সাধারণীকরণ। সামগ্রিকভাবে মুসলিম মন বা চরিত্র কিংবা ধর্ম অথবা সংস্কৃতি সম্পর্কে যা বলা হয় তা আফ্রিকান, ইহুদি, অন্যান্য প্রাচ্যজাতি কিংবা এশীয়দের সম্পর্কিত মূলধারার আলোচনায় বলা অসম্ভব।

অবশ্য গত দেড় দশক ধরে মুসলমান এবং ইরান, সুদান, ইরাক, সোমালিয়া, আফগানিস্তান, লিবিয়ার মত ইসলামী দেশের পক্ষ থেকেও অনেক সমস্যাজনক ঘটনা ঘটানো হয়েছে, উস্কানি এসেছে। আক্রমণাত্মক ঘটনাসমূহের এই সংক্ষিপ্ত তালিকাটির কথা বিবেচনা করা যায়: ১৯৮৩ সালে লেবাননে বোমা বিস্ফোরণে নিহত হয় ২৪০ জন মার্কিন মেরিন, যার দায় স্বীকার করে একটি ইসলামী সংগঠন; আত্মঘাতী মুসলমানরা বিস্ফোরণে উড়িয়ে দেয় বৈরুতস্থ মার্কিন দূতাবাস, ওখানেও প্রচুর লোকক্ষয় হয়। ১৯৮০'র দশকে লেবাননের শিয়া গ্রুপগুলো বহু আমেরিকানকে জিম্মি করে অনেকদিন আটকে রাখে। বিমান ছিনতাইয়ের অনেকগুলো ঘটনা ঘটে, যার দায় স্বীকার করে বিভিন্ন মুসলিম গ্রুপ; এর মধ্যে সবচেয়ে জঘন্য হলো টিডব্লিউ ফ্লাইট ছিনতাই, বৈরুতে। একই সময়ে ফ্রান্সেও অনেকগুলো বোমা বিস্ফোরণ ঘটে। ১৯৮৮

www.pathagar.com

সালে মুসলিম সন্ত্রাসীরা স্কটল্যান্ডের লকারবির আকাশে বোমা বিস্ফোরণে উড়িয়ে দেয় প্যানআম-এর ফ্লাইট নম্বর ১০৯। লেবানন, জর্দান, সুদান, ফিলিস্তিন, মিশর, সৌদি আরব ও অন্যান্য দেশের বিদ্রোহী দলগুলোর প্রতি সহানুভূতিশীল ও মদদদাতা হিসেবে ইরান হাবেভাবে তার ভূমিকা স্বীকার করে নেয়। সোভিয়েত ইউনিয়নের দখলমুক্ত হওয়ার পর এখন আফগানিস্তান যেন গৃহযুদ্ধরত বিভিন্ন ইসলামী গোত্র ও দল নিয়ে ফুটন্ত এক কড়াই। যুক্তরাষ্ট্রের অর্থ, অস্ত্র ও প্রশিক্ষণ নিয়ে বেশকিছু ইসলামী দল—বিশেষ করে তালেবান—দখল করে নিয়েছে গোটা দেশ। যুক্তরাষ্ট্রে প্রথমদিকে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত গেরিলাদের একটা অংশ এখন অন্যান্য দেশে কাজ করছে, মনে হয় এরাই মধ্যপ্রাচ্যে মার্কিন মিত্র মিশর ও সৌদিআরবে গণঅসন্তোষ সৃষ্টির চেষ্টায় রত; ১৯৯৩ সালে আমেরিকায় ওয়ার্ল্ড ট্রেড সেন্টারে বোমা বিস্ফোরণের দায়ে সাজাপ্রাপ্ত ওমর আবদেল রহমান এদের মতই একজন। সালমান রুশদির ব্যাপারে খোমেনির ফতোয়া (ফ্রেব্রুয়ারী ১৪, ১৯৮৯) এবং তাকে হত্যার জন্য বহু মিলিয়ন ডলার পুরস্কারের ঘোষণা যেন ইসলামের ভয়াবহতা এবং আধুনিকতা ও উদারনৈতিক মূল্যবোধের বিরুদ্ধে এর মরণপণ যুদ্ধের প্রামাণিক নমুনায় পরিণত হয়। তেমনি এ ঘটনায় প্রমাণিত হয় যে ইসলাম সমুদ্র পেরিয়ে পশ্চিমের হৃদপিণ্ডেও পৌছে যেতে পারে—উস্কানি দিতে পারে, হুমকি ও চ্যালেঞ্জ জানাতে পারে।

১৯৮৩ সালের পর থেকে ইসলামে বিশ্বস্ত মুসলমানরা সবখানে খবরের শিরোনামে পরিণত। আলজিরিয়ায় ওরা মিউনিসিপ্যাল নির্বাচনে জেতে; কিন্তু মিলিটারী ক্যু'র কারণে ক্ষমতায় যেতে পারেনি। আলজিরিয়া সত্যিই এক হৃদয়বিদারক গৃহযুদ্ধের ভয়াবহ যন্ত্রণায় পতিত। ওখানে মুসলিম দলগুলো আর্মির সাথে লড়ছে; খুন হয়েছে হাজার হাজার সাংবাদিক, লেখক, শিল্পী, বুদ্ধিজীবী। একটি জঙ্গী ইসলামী দল সুদানের ক্ষমতায়। এর প্রধান হাসান আল তোরাবীকে প্রায়ই দেখানো হয় ইসলামী পোষাকে সজ্জিত, অন্যের অনিষ্টকারী শয়তান হিসেবে। মিশরে জঙ্গী ইসলামীদের হাতে খুন হয়েছে ডজন ডজন নির্দোষ ইউরোপীয় ও ইহুদি পর্যটক। ওখানে গত কয়েক দশকে বিশাল শক্তিধর হয়ে উঠেছে মুসলিম ব্রাদারহুড এবং জামাআত ইসলামী। অন্য দলগুলোর তুলনায় জামাআত ইসলামী অনেক মারমুখী ও কট্টর। ফিলিস্তিনে গাজা ও পশ্চিম তীরের ইন্তিফাদা আন্দোলনের শিকড় কাটার জন্য ইসরাইল এককালে হামাসকে মদদ দিতো। সেই হামাস ও তার ইসলামী জিহাদ এখন ইসলামী চরমপন্থীদের সবচেয়ে ভীতিকর নমুনা; সাংবাদিকরা সবচেয়ে বেশি রিপোর্ট প্রকাশ করেছে এ দলটির কর্মকাণ্ড সম্পর্কে। এদের অনেক জঘন্য কাজের মধ্যে আছে বহু আত্মঘাতী বোমা বিস্ফোরণ, যাত্রীবাহী বাস উড়িয়ে দেয়া, অনেক সাধারণ ইসরাইলী হত্যা। মার্কিন প্রচারমাধ্যমে সন্ত্রাসী নামে প্রচারিত হিজবুল্লাহ গেরিলা দলও কম ভয়ংকর নয়। এরা নিজেদেরকে দাবী করে দক্ষিণ লেবাননের তথাকথিত নিরাপত্তা এলাকায় ইহুদি দখলদার বিরোধী যোদ্ধা হিসেবে; তা-ই মনে করে স্থানীয়রাও।

www.pathagar.com

১৯৯৬ সালের মার্চে মিশরের বন্দর নগরী শার্ম আল শেইখ-এ বিরাট এক আন্তর্জাতিক সম্মেলন ডাকা হয় সন্ত্রাস নিয়ে আলোচনার জন্য, যার তৎকালীন নমুনা হিসেবে নেয়া হয় ইসরাইলী নাগরিকদের ওপর পরিচালিত তিনটি আত্মঘাতী বোমা হামলা। প্রেসিডেন্ট বিল ক্লিনটন, প্রধানমন্ত্রী শিমন পেরেজ, প্রেসিডেন্ট হোসনী মোবারক এবং চেয়ারম্যান ইয়াসির আরাফাতসহ বহু রাষ্ট্রনায়ক এতে অংশ গ্রহণ করেন। পেরেজ তার বক্তৃতার মাধ্যমে সাধারণ মানুষের মনে এক ফোঁটা সন্দেহ ধারণেরও অবকাশ রাখেননি যে, এ সবের জন্য একমাত্র দায়ী হলো "ইসলাম"* এবং ইরানের ইসলামী প্রজাতন্ত্র। প্রচার মাধ্যমও তার প্রচারণায় তেমন সন্দেহ পোষণের ফাঁক রাখেনি। যুক্তরাষ্ট ও পশ্চিমের প্রচার মাধ্যমের পরিবেশ এতটাই উত্তপ্ত ছিলো যে ১৯৯৫ সালের এপ্রিলে ওকলোহামা সিটিতে বোমা ফাটার পর সর্বত্র সতর্ক সংকেত বেজে ওঠে যে, মুসলমানরা আবার আঘাত হেনেছে। আমার মনে পড়ে (মন খারাপ করে ঘরে বন্দী থাকার সময়) সেদিন বিভিন্ন পত্রিকা, নিউজ-নেটওয়ার্ক, গুরুত্বপূর্ণ রিপোর্টার মিলিয়ে অন্তত গোটা পঁচিশেক লোক আমাকে ফোন করে। আমাকে ফোন করার পেছনে তাদের সবার মনে একটা ধারণাই কাজ করেছে: যেহেতু আমি মধ্যপ্রাচ্য থেকে এসেছি এবং ঐ অঞ্চল সম্পর্কে লেখালেখি করি তাই আমি অন্য সবার চেয়ে বেশি কিছু জানি। আরব, মুসলিম ও সন্ত্রাসের মধ্যে যে সম্পর্ক বানিয়ে নেয়া হয়েছে তার জোর ঐ দিনই সবচেয়ে প্রবল হয়ে দেখা দেয় আমার কাছে। আমাকে যতটা তীব্রতার সাথে অপরাধী মনোভাবাপন্ন করে তোলার চেষ্টা হয়, ঠিক ততটাই অপরাধবোধে ভুগতে বাধ্য করা হয় আমাকে। প্রচার মাধ্যম আমাকে আক্রমণ করে, তার মোদ্দা কারণ হলো ইসলাম—কিংবা বলা যায়—ইসলামের সাথে আমার সম্পর্ক।

স্বদেশী সার্বদের জাতিগত গণহত্যার শিকার বসনীয়দের ক্ষেত্রেও একই ঘটনা ঘটেছে। কিন্তু ওখানে, যেমন ডেভিড রিফ এবং অন্যরা দেখিয়েছেন, ভয়ংকর নির্মম ঘটনাগুলো ঘটে শেষ হয়ে যাওয়ার আগে পর্যন্ত কিছুই করা হয়নি ইউরোপ বা যুক্তরাষ্ট্রের তরফ থেকে। বসনিয়ায় জাতিসংঘের বিপুল মানবিক সাহায্যের বিষয়টি হয়তো তাদের মহত্ত্বই, কারণ অন্য সবখানে তো মুসলমানদের দেখা হয় আগ্রাসী শক্তি হিসেবে যাদের সঠিক প্রাপ্য হলো নির্যাতনমূলক মন্তব্য, হুমকি, নিষেধাজ্ঞা, তদন্ত, একঘরেকরণ, মাঝে মধ্যে বিমান হামলা। চেচনিয়ার মুসলমানদের দমনের জন্য রাশিয়ার রক্তক্ষয়ী চেষ্টাও বিবেচনায় আনা দরকার। যেমন লিবিয়া ও ইরাকের বেলায়: যুক্তরাষ্ট্র ১৯৮৬ সালের এপ্রিলের এক সন্ধ্যায় লিবিয়ায় বেপরোয়া বোমা হামলা চালায়, ইরাকের বিরুদ্ধে পুরোদস্তুর যুদ্ধ করার পর আবার ১৯৯৩ সালে এবং ৯৬ সালে অনেকবার বিমান হামলা করে (আক্রমণের প্রায় পুরোটাই দেখানো হয় সিএনএন টিভিতে)। পশ্চিমের মানুষেরা মনে করে এইসব আক্রমণ সঠিক ছিলো. যদিও অনেক নিরীহ মানুষ ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। মুসলিম সোমালিয়ায় যুক্তরাষ্ট্রের মানবিক হস্তক্ষেপের বিরুদ্ধে কেউ কিচ্ছু বলেনি। সোমালিয়ার ব্যাপারটাও শেষ পর্যন্ত লেজেগোবরে করে

* যেখানে ইসলাম শব্দটি উর্ধ্ব কমার ভেতরে রয়েছে সেখানে "ইসলাম" বলতে বুঝতে হবে পশ্চিমের অপ-প্রচারণায় সৃষ্ট ইসলামের ভাবমূর্তি, তা ধর্মস্বরূপ ইসলামকে বোঝায় না।

www.pathagar.com

শেষ হয়েছে, এক যুগ পূর্বের লেবানন অভিযানের মত। ইরাক, লিবিয়া, চেচনিয়া ও বসনিয়ার ঘটনাগুলো ভিন্ন ভিন্ন। কিন্তু বিশ্বব্যাপী মুসলমানদের চোখে একটা জায়গায় এগুলোর সাদৃশ্য আছে। তা হলো পশ্চিমা, বিশেষত খ্রিস্টীয় শক্তি ইসলামের বিরুদ্ধে এক বিরতিহীন যুদ্ধে রত। এভাবে মেরুকরণ আরো পোক্ত হয়েছে এবং দুই সংস্কৃতির মধ্যে আলাপ-আলোচনার সুযোগ হয়েছে অন্তর্হিত। অনেক মুসলমান লিখেছেন যে, যদি বসনীয়, ফিলিস্তিনী ও চেচনীয়রা মুসলমান না হতো এবং যদি 'সন্ত্রাস' ইসলাম থেকে উদ্ভূত না হতো, তাহলে পশ্চিমা শক্তিগুলো আরো কিছু করতো। ইসরাইল তো আরব মুসলমানদের জায়গা দখল করে নিজের অঙ্গীভূত করে নিয়েছে, তার কোনো শাস্তি হয়নি। তা হলে কেবল মুসলমানরা কেন লজ্জাজনক ও পক্ষপাতমূলক শত্রুতার শিকার? বহু আমেরিকানের কাছে ইসলাম সমস্যা ছাড়া আর কিছুই নয়।

কাজেই, ছবিটা জটিল। ইসলামী বিশ্বে আবেগের বিস্ফোরণ ঘটছে। এবং অনেক সংগঠিত বা অসংগঠিত সন্ত্রাসী ঘটনাও ঘটেছে মার্কিন ও ইসরাইলী লক্ষ্যবস্তু ঘিরে। ইসলামী বিশ্বে উৎপাদনহীনতা ও নিম্ন-জীবনমান, মত-প্রকাশে নিষেধাজ্ঞা, গণতন্ত্রের তুলনামূলক অনুপস্থিতি, একনায়কত্বের ভয়ংকর উত্থান, কঠোর নিয়ন্ত্রণ ও দমনমূলক সরকার ইত্যাদির কোনো কোনোটি সন্ত্রাস, নির্যাতন ও লিঙ্গচ্ছেদের মত ঘটনা উৎসাহিত করে। সব মিলিয়ে ইসলামী বিশ্বের সামগ্রিক পরিস্থিতি অবনতির দিকে। এর মধ্যে আছে সৌদি আরব, মিশর, ইরাক, সুদান আলজিরিয়া প্রভৃতি প্রধান প্রধান ইসলামী দেশ। এ ছাড়াও, বেশ কিছু সংখ্যক মুসলমান আছেন যারা সাম্প্রতিক মুসলিম বিশ্বের সকল দুর্দশার অষুধ হিসেবে সরলীকরণসূত্রে সাত শতকের মক্কার অস্পষ্ট কল্পনার দিকে মুখ করে দাঁড়িয়েছেন। এদের কর্মকাণ্ডও যে প্রবলভাবে নিরুৎসাহব্যঞ্জক তা অস্বীকার করা ভণ্ডামীর শামিল।

আমার কথা হলো ইসলামকে ব্যাখ্যা করা বা নির্বিচারে দোষারোপ করার জন্য 'ইসলাম' লেবেলটির ব্যবহার এখন আক্রমণের একটা কায়দায় পরিণত, যা ইসলাম ও পশ্চিমের স্বঘোষিত প্রতিনিধিদের মধ্যে পারস্পরিক শত্রুতা আরো বাড়িয়ে দিচ্ছে। ইসলামি বিশ্ব কোটি কোটি মানুষ, বহু সংখ্যক দেশ, সমাজ, ঐতিহ্য, ভাষা এবং অসংখ্য ভিন্ন ভিন্ন অভিজ্ঞতার সমাবেশ। সেখানে যা হচ্ছে 'ইসলাম' কথাটি তার একটা ক্ষুদ্র অংশের পরিচায়ক মাত্র। এই বিপুল ব্যাপারগুলোকে কেবল 'ইসলামি' লেবেলে সংকুচিত করা সরল মিথ্যাচার ছাড়া আর কিছু নয়; যুক্তরাষ্ট্র, বৃটেন ও ইসরাইলে সক্রিয় প্রাচ্যতাত্ত্বিকেরা যত উচ্চস্বরে ও জোরের সাথেই বলুন না কেন যে, ইসলামি সমাজের গোড়া থেকে আগা পর্যন্ত পরিচালিত হয় ইসলামের দ্বারা, দার-আল-ইসলাম একটি একক সংসক্ত সত্তা, এবং ইসলামে মসজিদ ও রাষ্ট্রের মধ্যে কোনো ফারাক নাই ইত্যাদি। এগুলো সবচেয়ে দায়িত্বহীন ধরনের সাধারণীকরণ, যা অন্য কোনো ধর্মীয়, সাংস্কৃতিক পরিসংখ্যানগত গোষ্ঠী সম্পর্কে প্রয়োগ করা অসম্ভব। পশ্চিমা সমাজের জটিল তত্ত্বমালা, সমাজ-সংগঠন, ইতিহাস, সংস্কৃতি নিয়ে ক্রমশ বদলে যাওয়া বিচিত্র বিশ্লেষণ, অন্বেষার সাজানো-পরানো ভাষা সম্পর্কে আমরা যেমন আশাবাদী, তেমনি আশা করি ইসলামি সমাজ সম্পর্কে তাদের বিশ্লেষণও যেন ওরকম হয়।

www.pathagar.com

অথচ পণ্ডিতি বিশ্লেষণের বদলে আমরা পাই সাংবাদিকসুলভ অতিরঞ্জিত বিবৃতি। এগুলোর ওপরই আরেকদফা রঙ চড়ায় প্রচার মাধ্যম। এদের কাজের ওপর অস্পষ্ট ভীতির মতো ঝুলে থাকে 'মৌলবাদ' নামের ধারণাটি, প্রায়ই তারা এর উল্লেখ করে। অথচ এ কথাটির সাথে গাঢ়— বর্তমানে অস্পষ্ট হয়ে যাওয়া—সম্পর্ক রয়েছে হিন্দুত্ববাদ, খ্রিস্ট ধর্ম, ইহুদি ধর্ম ও সংস্কৃতির। ইসলাম ও মৌলবাদের মধ্যে ইচ্ছাকৃতভাবে সৃষ্ট সম্পর্ক পাঠকদের মনে এ ধারণাই নিশ্চিত করে যে, ইসলাম ও মৌলবাদ একই ব্যাপার। ইসলামের বিশ্বাস, এর প্রতিষ্ঠাতা ও অনুসারীদের সম্পর্কে সাধারণীকরণ এবং ইসলামকে কিছু রীতিনীতি ও ছাঁচ-এ সংকুচিত করে নিয়ে আসার এই যে প্রবণতা তা ইসলামের সাথে জড়িত প্রতিটি নেতিবাচক ব্যাপার—সন্ত্রাস, আদিমতা, পূর্বাগানুকৃতি, ভীতিকর বৈশিষ্ট্য ইত্যাদি বাড়িয়ে দেয়ার পেছনে অব্যাহত কারণ হিসেবে বর্তমান। এইসব করা হচ্ছে, অথচ 'মৌলবাদ'-কে সংজ্ঞায়িত করা হয়নি, 'চরমপন্থী', 'মূলানুগ' কথাগুলোর পরিষ্কার অর্থ বা পটভূমি নির্দেশ করা হয়নি (যেমন এভাবে বলা যে, মুসলমানদের ৫%, ১০% কিংবা ৫০% মৌলবাদী)।

১৯৯১ সাল থেকে আমেরিকান একাডেমী অব আর্ট এন্ড সায়েন্স তার ছত্রছায়ায় গবেষণারত একদল গবেষক কর্তৃক 'মৌলবাদ' বিষয়ে আবিষ্কৃত মতামত প্রকাশ করছে ৫টি বিরাট খণ্ডে। যদিও ইহুদি ও খ্রিষ্টান ধর্ম ও সংস্কৃতি সম্পর্কেও আলোচনা আছে, তবু আমার সন্দেহ ইসলামকে মাথায় রেখেই কাজটার সূচনা। সম্পাদকদ্বয় মার্টিন ই. মার্টিন ও আর. স্কট এপ্লবাই। অনেক নামী দামী প্রাতিষ্ঠানিক গবেষক এতে অংশগ্রহণ করেন, যার মোট ফলাফল হলো মনোগ্রাহী একগুচ্ছ অভিসন্দর্ভের সমাহার। গ্রন্থটির একটি সমালোচনা লিখেছেন আয়ান লাস্টিক, যা লেখকের তীব্র অন্তর্দৃষ্টিতে চমৎকার আলোকিত। তার মতে, ওতে মৌলবাদের কোনো পরিচয়ও উঠে আসেনি। লাস্টিক যোগ করেন, "সম্পাদক এবং লেখকরা যেন জোর গলায় এ-ই বলতে চেয়েছেন যে, 'মৌলবাদ'-এর সংজ্ঞা দেয়া অনুচিত।" যদি বিশেষজ্ঞরাই একে সংজ্ঞায়িত করতে না পারেন, তাহলে 'মুসলিম' কথাটি দেখেই অতিআগ্রহ ও বিদ্বেষ নিয়ে ঝাঁপিয়ে-পড়া গলাবাজরা আরো খারাপ করবেন এটিই স্বাভাবিক। তবে, তারা অন্তত পাঠকদের মধ্যে সতর্কতা ও উদ্বেগ উস্কে দেয়ার কাজে সম্পূর্ণ সফল।

একটি সুনির্দিষ্ট সাধারণ নমুনার কথা আলোচনা করা যাক। ন্যাশনাল সিকিউরিটি কাউন্সিলের প্রাক্তন সদস্য পিটার রডম্যান *ন্যাশনাল রিভিউ*-এর মে ১১, ১৯৯২ সংখ্যায় লিখেন, "পশ্চিম এখন বাইরের একদল পূর্বাগানুগ জঙ্গীর চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি, যারা পশ্চিমের সকল রাজনৈতিক চিন্তাধারার প্রতি বিদ্বেষ দ্বারা চালিত, খ্রিস্টানদের প্রতি বহুযুগের প্রতিশোধ প্রবণতায় তাড়িত।" তার কথায় যেন সংযত প্রথম পক্ষের ভঙ্গি। বিশ্লেষণের অনুপস্থিতি লক্ষণীয়, তেমনি প্রমাণ-অসম্ভব ঢালাও সাধারণীকরণ: যেমন 'খ্রিস্টান জাতির প্রতি বহুযুগের প্রতিশোধ প্রবণতায় তাড়িত'; শেষের 'খ্রিস্টান জাতি' কথাটিও যেন বেশি প্রভাবশালী ও বড় হয়ে বেজে ওঠে, নিরলংকার কিন্তু প্রকৃত অর্থবহ 'খ্রিস্টানত্ব' কথাটির তুলনায়। রডম্যান চালিয়ে যান:

www.pathagar.com

"ইসলামী বিশ্বের অধিকাংশই সামাজিক বিভক্তির করায়ত্ত, বস্তুগত সমৃদ্ধির প্রশ্নে পশ্চিমের কাছে হীনমন্যতায় নিরাশ, পশ্চিমের সাংস্কৃতিক প্রভাবের কারণে মহাত্যক্ত, তার ক্ষোভ দ্বারা চালিত (যাকে বার্নার্ড লুইস বলেছেন 'ক্রোধের রাজনীতি')।" তার বিষাক্ত পশ্চিম-বিরোধিতা কেবল একটা কৌশল নয়। এ ধরনের জ্ঞানভাষ্যে লুইসের ভূমিকা নিয়ে আমি আলাদা আলোচনা করবো একটু পরে। ইসলামের হীনমন্যতা, ক্ষোভ ও ক্রোধের কোনো প্রমাণ দেননি রডম্যান। কেবল আখ্যা দেয়াই যথেষ্ট। 'পশ্চিমা জগত' বা 'খ্রিস্টানবিশ্ব' সম্পর্কে আলোচনা করলে রডহ্যাম যুক্তির যে জাল ও নানামাত্রার বিশ্লেষণ ছড়াতেন এখানে যেন সে সবের প্রয়োজন নেই। কারণ প্রাচ্যতাত্ত্বিক চিন্তার ঐতিহ্য ও প্রচার মাধ্যমের ছাঁচে ইসলাম কোনো যুক্তিপ্রমাণ ছাড়াই অভিযুক্ত ও সাজাপ্রাপ্ত। আমরা জিজ্ঞেস করতে চাই মুসলিম বিশ্বের বিলিয়ন বিলিয়ন লোকের প্রত্যেকেই কি ক্রোধ ও হীনমন্যতায় ভোগে? ইন্দোনেশিয়া, পাকিস্তান বা মিশরের প্রতিটি নাগরিকই কি পশ্চিমা প্রভাবে বিদ্বিষ্ট? এসব মৌলিক প্রশ্নের উত্তর কিভাবে পাওয়া যাবে? অথবা মূল ব্যাপার কি এই যে, আমরা যেভাবে অন্যান্য সংস্কৃতি ও ধর্ম পরীক্ষা নিরীক্ষা করে দেখি, ইসলামকে সেভাবে বিশ্লেষণ করা অসম্ভব—এ কারণে যে, ইসলাম 'স্বাভাবিক' মানবীয় অবিজ্ঞতার চেয়ে ভিন্ন কিছু? কিংবা এ কারণে যে, ইসলামকে মনে হয় মানসিক ব্যাধিগ্রস্ত মানুষের মত?

অথবা মুসলিম-বিদ্বেষী ডানিয়েল পাইপের কথা ধরা যাক। তার প্রধান বৈশিষ্ট্য হলো প্রাচ্যতাত্ত্বিক হিসেবে তিনি ইসলামকে 'জানেন' মর্মস্পর্শীভাবে ভয়ংকর এক ব্যাপার হিসেবে। তিনি *দি ন্যাশনাল ইন্টারেস্ট*-এর বসন্ত ১৯৯৫ সংখ্যায় একটি 'ভাবনা'খণ্ডে নিজেকে অভিব্যক্ত করেন এই শিরোনামে "মধ্যপন্থী বলে কেউ নেই: মৌলবাদী ইসলামের সাথে কারবার"। 'খণ্ড'টির কোথাও তিনি মৌলবাদী ইসলামকে তার স্বাভাবিক বৈশিষ্ট্যের অপরাধ থেকে রেহাই দেননি। তার মতে সেই স্বাভাবিক বৈশিষ্ট্য হলো, "মূল আত্মিক শক্তির বিবেচনায় প্রচলিত ধর্মগুলোর চেয়ে বরং এ জাতীয় অন্যান্য আন্দোলন (যেমন কমিউনিজম, ফ্যাসিজম)-এর সাথে এর মিল বেশি।" অবশ্য মূলানুগ ইসলাম কি জিনিস তা ব্যাখ্যা করার প্রয়োজন বোধ করেননি তিনি। খানিক পর আবার আরেক দফা সাদৃশ্য হাজির করেন পাইপ: "অন্যান্য উদ্ভট মতবাদের সাথে মূলানুগ ইসলামের খুঁটিনাটি বিষয়ে পার্থক্য থাকলেও, তৎপরতার ক্ষেত্র ও উদ্দেশ্যের বিচারে এগুলো সবই এক। কমিউনিজম ও ফ্যাসিজমের মত এরও রয়েছে একটি অগ্রগামী মতবাদ; নতুন সমাজ গঠন এবং মানুষের উন্নয়নের একটি সম্পূর্ণ পরিকল্পনা; সেই সমাজের ওপর পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ; এবং রক্তপাতের জন্য প্রস্তুত, এমনকি অস্থির, ক্যাডারদল।" যারা বলেন রাজনৈতিক ইসলামই ইসলামের মূল স্রোত পরিচালিত করছে তাদেরকে ব্যঙ্গ করেন পাইপ; তিনি পাল্টা যুক্তি দিয়ে দেখান তার সবচেয়ে মৌলবাদী ইসলামের প্রচণ্ড মূর্তি এখন আমাদের ওপর ছাড়াও হয়েছে। পাইপের 'মৌলবাদী' ইসলাম মারমুখি, অযৌক্তিক, অপ্রতিরোধ্য, সম্পূর্ণ আপোষহীন; তা এখন গোটা পৃথিবীকে এবং বিশেষত 'আমাদেরকে' হুমকি দিচ্ছে। যদিও খোদ

www.pathagar.com

মার্কিন স্টেট ডিপার্টমেন্টের পরিসংখ্যান অনুযায়ী ব্যাপ্ত ও সংখ্যার হিসেবে সন্ত্রাসে মধ্যপ্রাচ্যের অবস্থান ষষ্ঠস্থানে।

সংক্ষেপে, মৌলবাদ = ইসলাম = যা কিছুর সাথে আমাদের এখনই যুদ্ধ করতে হবে তার সব, অর্থাৎ শীতল যুদ্ধের দিনে কমিউনিজমের সাথে যা করেছি। প্রকৃতপক্ষে পাইপ বলেন ইসলামের বিরুদ্ধে যুদ্ধ আরো ভয়ংকর, আরো পরিপূর্ণ ও বিপদজনক। রডম্যান ও পাইপ কেউ বাইরের লেখক নন, এরা চরমপন্থী কোনো দলের উন্মত্ত সদস্যও নন। এদের রচনা অবশ্যই মূলধারার কাজ এবং একটি বাস্তব উদ্দেশ্যে নিবেদিত: তা হলো নীতি নির্ধারকদের সিরিয়াস দৃষ্টি আকর্ষণ। এদের মতামত কত বিস্তৃত তার খানিকটা বোঝা যাবে ১৯৮৭ সালের জুলাইয়ের ৬ তারিখের *ইউএস নিউজ এন্ড ওয়ার্ল্ড রিপোর্ট* -এ। ওখানে লেখা হয়, "ইসলামি বিশ্বের প্রায় সবখানে ক্ষমাহীন ও অপরিবর্তনীয় মৌলবাদ জনপ্রিয় আবেগে পরিণত হয়েছে। তা পশ্চিমা বিশ্বকে বেকায়দায় পেয়ে গেছে, বিশেষ করে যখন রাজনৈতিক উদ্দেশ্য ও ইসলাম ধর্মের মত্ত আবেগ এক হয়েছে ভয়ংকর ফলাফল সৃষ্টির জন্য। এখনো এমন প্রমাণ পাওয়া যায়নি যে, খোমেনি কর্তৃক ঘোষিত বিপ্লবী লক্ষ্যমালার প্রতি অধিকাংশ মৌলবাদী শ্রদ্ধাশীল। তবে এ বার্তা এখন ক্রমশ বিস্তৃত হচ্ছে।" এরপর একই পত্রিকার অক্টোবর ১৬, ১৯৮৭ সংখ্যায় লেখা হয়: ইরানের বিভিন্ন গোত্রের মুসলমান ও শিয়াদের বিশ্বাসের অঙ্গ হলো শহীদ বিষয়ক জটিল মানসিক টান। এখন তরুণ সুন্নী সংখ্যাগরিষ্ঠদের মধ্যেও এ আবেগ জাগ্রত।" ইসলাম বিষয়ক আলোচনার সময় জাতীয় রীতিনীতি একপাশে সরিয়ে রাখা হয়। মরক্কো থেকে উজবেকিস্তান পর্যন্ত ছড়ানো বহু মিলিয়ন সুন্নী তরুণের মধ্যে শহীদ হওয়ার আবেগ যে ছড়িয়ে পড়ছে সে কথা কতটা পরিবর্তনশীল? আবার তা যদি হয়েও থাকে তা হলে তার প্রমাণ কি?— কেউ এসব প্রশ্ন তোলার প্রয়োজন বোধ করে না।

এরপর দেখা যেতে পারে রোববারের *নিউইয়র্ক টাইমস*-এর 'উইক ইন রিভিউ'-এর চমকের কথা। এর ২১ জানুয়ারী, ১৯৯৬ তারিখের সংখ্যার শিরোনাম ছিলো: "লাল হুমকি শেষ; কিন্তু দোরগোড়ায় ইসলাম"। নিচে এলেইন সিয়োলিনোর দীর্ঘ নিবন্ধ। লেখাটি যদিও 'একদিকে/অন্যদিকে' জাতের যুক্তির ফর্মূলায় সাজানো, তবু এ লেখা থেকে, লেখকের ভাষায় "কমিউনিস্ট হুমকি কত আদিম ও সুসংগঠিত সে সম্পর্কিত পুরোনো বিতর্কের আদলে চলমান সাম্প্রতিক কালের অন্যতম উত্তপ্ত ও ঘৃণ্য একটি প্রাতিষ্ঠানিক বিতর্ক" সম্পর্কে মোটামুটি ধারণা করা যায়। খোঁচা-মারা শিরোনাম ছাড়াও সিয়োলিনোর নিবন্ধ যেন পাঠকের পাঁজরে কনুই মেরে সেই দিকে নিয়ে যায় যাতে ইসলামকে (সবুজ হুমকি) পশ্চিমের স্বার্থের জন্য বিপদজনক মনে হয়। এজন্য (যেমন ন্যাটো সেক্রেটারী জেনারেল ক্লেইজ, নেউট গিঙরিচ, বার্নার্ড লুইস, শিমন পেরেজ, এবং প্রায় সর্বত্রগামী স্টিভেন এমারসনসহ) বহুসংখ্যক সাক্ষীরও উল্লেখ করা হয়। এ ছাড়া, পৃথিবীব্যাপী ষড়যন্ত্র-ভীতি থিসিসের সমর্থক হিসেবে উল্লেখ করা হয় বহু মার্কিন-মদদপুষ্ট রাষ্ট্রনায়কের নাম, যেমন- বেনজীর ভুট্টো, হোসনি মোবারক; তানসু সিলার। বিপরীত পক্ষে উল্লেখ করা হয় কেবল জর্জ টাউনের অধ্যাপক জন

www.pathagar.com

এসপোসিটোর কথা। এ ভদ্রলোক গভীর আবেগের সাথে ইসলাম সম্পর্কিত ভীতির তত্ত্ব খণ্ডন করেছেন তার সংবেদনশীল ও যৌক্তিক রচনা *দি ইসলামিক থ্রেট : মিথ ওর রিয়্যালিটি?*-তে।

সুতরাং ইসলাম হলো বহু নীতিনির্ধারণী কেন্দ্র বা প্রচার মাধ্যমের মূল আলোচ্য। এসব আলোচনায় এই একটা বিষয় এড়িয়ে যাওয়া হয় যে, প্রধান প্রধান ইসলামী গ্রুপগুলো মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মিত্র ও গ্রাহকদেশ, অথবা মার্কিন আওতার মধ্যে: যেমন সৌদি আরব, ইন্দোনেশিয়া, মালয়েশিয়া, পাকিস্তান, মিশর, মরক্কো, জর্দান ও তুরস্ক। এসব দেশে জঙ্গী মুসলমানদের কিছুটা উত্থান ঘটার কারণ হলো সরকার প্রধানরা প্রকাশ্যে যুক্তরাষ্ট্র কর্তৃক সমর্থিত। প্রায়শ গণবিচ্ছিন্ন, সংখ্যালঘু এইসব সরকার যুক্তরাষ্ট্রের অভিভাবকত্ব মানতে বাধ্য হয়, স্বয়ং আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের কারণে, মুসলিম এজেন্ডা হিসেবে নয়। আমেরিকার মর্যাদাকর ও প্রভাবশালী নীতিনির্ধারণী সংস্থা 'কাউন্সিল ফর ফরেন রিলেশনস' সম্প্রতি মুসলিম পলিটিকস রিপোর্ট এন্ড স্টাডি গ্রুপ প্রতিষ্ঠা করেছে। এটি ইসলাম সম্পর্কে ব্যাপক দৃষ্টিভঙ্গির মতামত গ্রহণ করে, যার কিছু কিছু সত্যিই প্রশংসনীয় ও তথ্যবহুল। এ সত্ত্বেও কাউন্সিলের ত্রৈমাসিক *ফরেন এ্যাফেয়ার্স*-এ প্রায়ই দ্বিমেরুমুখি বিতর্ক ছাপা হয়: যেমন "ইসলাম কি হুমকি?"—সে প্রশ্নের পক্ষে ইতিবাচক উত্তরের জন্য জুডিথ মিলার আর নেতিবাচক যুক্তি দেয়ার জন্য লিয়ন হেডারের বিতর্ক (*ফরেন এ্যাফেয়ার্স*, বসন্ত, ১৯৯৩)। কিছুটা সহানুভূতি থাকলে বুঝতে কষ্ট হয় না যে এতে একজন মুসলমান অস্বস্তি বোধ করবেন এই ভেবে যে, তার বিশ্বাস, সংস্কৃতি ও তার মানুষদের দেখানো হচ্ছে হুমকির উৎস হিসেবে এবং তাকে পূর্ব-নির্ধারিতভাবে জড়িয়ে দেয়া হচ্ছে সন্ত্রাস, মারপিট ও "মৌলবাদ"-এর সাথে, হোক না বিতর্কের মধ্য দিয়ে।

এইরকম ছাঁচ তৈরির প্রক্রিয়ায় অবিরাম একটি ধারা মালমশলা ঢেলে দিচ্ছে ইসরাইলী পত্রপত্রিকা বইগুলোর পক্ষ থেকে; এই আশায় যে, এর ফলে হয়তো আরো বেশি আমেরিকান ও ইউরোপীয় মানুষ ইসরাইলকে বিবেচনা করবে ইসলামী সন্ত্রাসের শিকার হিসেবে। ১৯৪৮ সালে মধ্যপ্রাচ্যের গোটা ব্যাপারটা ঘিরে তথ্যযুদ্ধ শুরু হওয়ার পর থেকে প্রতিটি ইসরাইলী সরকার ইসরাইলের এই চিত্রটিকে আরো বিস্তৃত করে ছড়িয়ে দিয়েছে। বিষয়টি নিয়ে অন্যত্র আলোচনা করেছি। তবু এখানে জোর দিয়ে এইটুকু বলে রাখা জরুরী যে, ইসলাম এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রে আরবদের সম্পর্কে এহেন দাবী তোলার আসল উদ্দেশ্য ইসলামের প্রধান প্রতিপক্ষ ইসরাইল ও আমেরিকা যা করছে তা আবডালে রাখা। এই দুই দেশ বহু ইসলামী দেশে বোমা মেরেছে ও দখলাভিযান চালিয়েছে (মিশর, জর্দান, সিরিয়া, লিবিয়া, সোমালিয়া, ইরাক), চারটি দেশের অনেকখানি আরব-ইসলামী অঞ্চল দখল করেছে; জাতিসংঘে আমেরিকা প্রকাশ্যে সমর্থন করেছে এইসব দখলদারিত্বকে। অধিকাংশ আরবের বিবেচনায় ইসরাইল হলো উদ্ধত আঞ্চলিক পারমাণবিক শক্তি, প্রতিবেশীদের প্রতি একেবারেই শ্রদ্ধাবোধহীন; নিজের বোমাবর্ষণ ও মানুষ খুনের সংখ্যা ও পুনরাবৃত্তির ব্যাপারে, ঘরছাড়া করা, নি:সম্বল করার ব্যাপারে—বিশেষত ফিলিস্তিনীদেরকে—একেবারে

www.pathagar.com

নিরুদ্বেগ (মুসলমানের হাতে যত ইসরাইলী খুন হয়েছে তার তুলনায় ইসরাইলের হাতে খুন-হওয়া মুসলমানের সংখ্যা অনেকগুণ বেশি)। আন্তর্জাতিক আইন ও ডজন ডজন জাতিসংঘ-সিদ্ধান্ত অমান্য করে ইসরাইল পুব জেরুজালেম ও গোলান হাইট নিজ সীমানাভুক্ত করে নিয়েছে, দক্ষিণ লেবানন দখল করে আছে ১৯৮২ সাল থেকে, ফিলিস্তিনীদেরকে জাতি দূরের কথা, নিম্ন-মানবিক প্রাণী হিসেবে বিবেচনার করার নীতি গ্রহণ করেছে এবং যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যপ্রাচ্য নীতির ওপর তার নিজের প্রভাব এমনভাবে লেপে দিয়েছে যে এর ফলে বিশ কোটি আরব মুসলমানের স্বার্থ চাপা দিয়ে বড় হয়ে উঠেছে চল্লিশ লক্ষ ইহুদির স্বার্থ। এই হলো ঘটনা; এবং তা কোনো মতেই বার্নার্ড লুইসের জনপ্রিয় প্রাচীন ফর্মূলা অনুযায়ী এই নয় যে, পশ্চিমা 'আধুনিকতা'র ওপর মুসলমানরা ক্ষিপ্ত, যে-আধুনিকতা কতিপয় শক্তির বিরুদ্ধে ইসলামের প্রতিশোধ প্রবণতাকে বোধগ্রাহ্য করেছে। ইসরাইল ও যুক্তরাষ্ট্রের মতো ঐসব শক্তি নিজেদের মনে করে উদারতাবাদী গণতান্ত্রিক। অথচ ঠিক উল্টো মেরুতে দাঁড়িয়ে আত্মস্বার্থ ও নিষ্ঠুরতার নিয়মে চড়াও হয় দুর্বলের ওপর। ১৯৯১ সালে যুক্তরাষ্ট্র যখন ইরাকের বিরুদ্ধে বেশ কিছু দেশের একটি জোটের নেতৃত্ব দেয় তখন সে বলে দখলদারিত্ব ও আগ্রাসন উল্টে দেয়ার কথা। ইরাক যদি মুসলিম দেশ না হতো এবং তেলসমৃদ্ধ ঐ এলাকাটিই দখল না করতো যাকে মনে করা হয় যুক্তরাষ্ট্রের রিজার্ভ, তাহলে হয়তো গোটা অভিযানটিই ঘটতো না। যেমন ইসরাইল পশ্চিম তীর ও গোলান হাইট দখল করেছে, পুব জেরুজালেম নিজ সীমানাভুক্ত করে নিয়েছে, বসতি স্থাপন করছে; কিন্তু যুক্তরাষ্ট্র কখনো মনে করেনি ওখানে তার হস্তক্ষেপ দরকার।

আমি বলছি না যে, ইসলামের নামে ইসরাইলী ও পশ্চিমাদেরকে আক্রমণ ও আহত করেনি মুসলমানরা। আমি বলছি লোকেরা প্রচার মাধ্যমে যা পড়ে এবং দেখে তার অধিকাংশ এমন একটা অবস্থা তুলে ধরে যেন আগ্রাসন ব্যাপারটার উদ্ভবই ইসলাম থেকে, যেন ইসলাম আসলে তা-ই। এভাবে স্থানিক ও নিরেট পরিস্থিতি দৃশ্যের আড়ালে চলে যায়। অন্য ভাবে বলা যায় যে, কভারিং ইসলাম হলো একরকম পক্ষপাত তৎপরতা যা 'আমাদের' কৃতকর্ম অস্পষ্ট করে রাখে, এবং মুসলমান ও আরবরা ত্রুটিপূর্ণ স্বভাবের কারণে আসলে 'কী' তা তুলে ধরে।

আলোচনায় আমি এমন লেখকদের উদ্ধৃত করবো না যারা ইসলাম ও মধ্যপ্রাচ্য বিষয়ে গুরুত্বহীন, স্বভাবগত ভাবেই ছিটগ্রস্ত, অপ্রাসঙ্গিক। বরং মূলধারার সাংবাদিকতা—যেমন মার্টিন পেরেজের *দি নিউ রিপাবলিক* এবং মর্টন জুকারম্যানের *দি আটলান্টিক* থেকে নমুনা তুলে ধরবো। সম্পাদকদ্বয়ের দুজনই ইসরাইলের প্রবল সমর্থক, তাই ইসলামের বিরুদ্ধে। পেরেজের ব্যাপারটাই আলাদা। আমেরিকার প্রচার মাধ্যমে আর একজনও খুঁজে পাওয়া যাবে না যিনি দীর্ঘকাল (প্রায় দুইযুগ) ধরে এমন প্রবল বর্ণ-বিদ্বেষ ও অশ্রদ্ধা নিয়ে কোনো সংস্কৃতি ও জনগোষ্ঠীর বিরুদ্ধে সরব কণ্ঠে লেগে আছেন, যেমন ইসলাম ও আরবদের বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়ে আছেন পেরেজ। তার বিষের খানিকটা এসেছে যে-কোনো মূল্যে ইসরাইলকে সমর্থনের চেষ্টা থেকে। তবে বহু বছর ধরে তিনি যা বলে এসেছেন তার অনেক কিছু যুক্তিগ্রাহ্য প্রতিরোধ চেষ্টার

www.pathagar.com

মধ্যেও পড়ে না। তার কলামে নিখাদ, যুক্তিহীন এবং রুচিগর্হিত বদনাম সত্যিই যে কোনো তুলনায় নজিরবিহীন।

তার মনে ইসলাম ও আরব এক ও অভিন্ন, তাই পালাক্রমে তাদের আঘাত করা যেতে পারে। ১৯৮৪ সালের মে'র ৭ তারিখে প্রকাশিত একটি লেখা থেকে উদ্ধৃত করা যাক, যেখানে তিনি তার দেখা একটি নাটকের কথা বলছেন :

> আবরদের দখলকৃত জেরুজালেমে বোমা থেকে বাঁচার জন্য নির্মিত একটি আশ্রয় কেন্দ্রে এক পর্যটক জার্মান ব্যবসায়ী, এক আমেরিকান ইহুদি ও এক ফিলিস্তিনী আরব এক সাথে জায়গা নিয়েছেন। নাটকের জার্মান ও ইহুদি লোকটির মধ্যে গাঢ় হয়ে আসা সহানুভূতির মধ্যে কিছুটা চমক আছে বললে বলা যেতে পারে, কিন্তু আরবদের প্রতি—তাদের সংস্কৃতির নির্দিষ্ট প্রবণতার মধ্য দিয়েই নিশ্চিত—উন্মাদ আরবদের প্রতি যে মানসিকতা গড়ে তুলে আমাদের বিশ্ববাদী সংস্কৃতি তার মধ্যে তেমন চমক নাই। সে (আরব) তার ভাষার দ্বারাই বিষাক্ত, পরিষ্কার দেখতে পারে না কোনটা বাস্তবতা কোনটা কল্পনা, আপোষকে ঘৃণা করে, কঠিন-জটিল পরিস্থিতির জন্য অন্যকে দোষারোপ করে। সে তার হতাশার চোকামুখের প্রকাশ ঘটায় উদ্দেশ্যহীন কিন্তু সাময়িক তৃপ্তিদায়ক রক্তপাতের মধ্য দিয়ে। এটি একটি রাজনৈতিক নাটক। এর আবেদনময়তার দিকটা নৈরাশ্যবাদী, যাকে নাটকটির সত্যি দিকও বলা যায়। আমরা নাটকের ঐ আরবকে দেখেছি ত্রিপোলিতে, দামেস্কে, এবং সম্প্রতি গাজায় একটি বাস ছিনতাই করতে এবং জেরুজালেমে রাস্তা ভর্তি নিরীহ ইহুদিদের গুলি করে খুন করতে। স্টেজে সে অবশ্যই একটি কাল্পনিক চরিত্র। বাস্তবে সে নয়, তার 'মধ্যপন্থী' ভাই, যে কল্পনার নির্মাণ।

বহু সপ্তাহ ধরে এ লেখা ছাপা হয় তার পত্রিকায়। অথচ এই পত্রিকাটি রীতিমত বিখ্যাত—এক সময় ছিলো উদারপন্থী। ওয়াশিংটন ও নিউইয়র্কের প্রভাবশালী লোকেরা এর পাঠক। জুন ২৪, ১৯৯১ সালে আরেক লেখায় তিনি আমাদের আশ্বস্ত করেন যে, "একটি জনগোষ্ঠীর রাজনৈতিক প্রকাশ হলো ইসরাইল—পোল্যান্ড, জাপান, বা ইংল্যান্ডের মত।" এর রাজনৈতিক পরিচয় নিরাপদ (ভারত ও ফিলিস্তিনের মত নয়)। অতপর ১৯৯৩ সালের সেপ্টেম্বরের ৬ তারিখের সংখ্যায় তিনি তার অভিসন্দর্ভ এগিয়ে নিয়ে যান, "আরবদের নিকট ইহুদিরা বরাবর জবরদখলকারী, অবাঞ্ছিতই থেকে যাবে। আমাদের সময়ে বিদেশী-ভীতি কেবল আরবদের একার নয়। এখন এমন এক সময় যখন রাষ্ট্র রাজনীতি ও আত্মপরিচয় একসাথে মিলিয়ে ফেলে, আরব ইসলাম ইসরাইল ও পশ্চিমকে নিয়ে যে হীনমন্যতায় ভুগছে তা বিদেশী-ভীতি। সে নিজের জগত—কেবল নিজের জগত নিয়েই আছে।"

অসামান্য কুৎসা গাওয়ার কাজটি এত লম্বা করে শেষ করেন পেরেজ যে, এর আড়ালে অস্পষ্ট হয়ে যায় এক ঐতিহাসিক বাস্তবতা। তা এই যে, প্রধানত ইউরোপীয় ইহুদিরাই ফিলিস্তিনে আসে। ওখানে তখন অন্য জনগোষ্ঠীর বহুশতকের স্থায়ী বসতি। ইহুদিরা সেই

www.pathagar.com

সব মানুষের সমাজকে ধ্বংস করে, তাদের বাস্তুচ্যুত ও সম্পদচ্যুত করে এবং দেশ থেকে বের করে দেয় তাদের দুই-তৃতীয়াংশকেই। এ ছাড়াও ইসরাইল বহুযুগ ধরে দখল করে রেখেছে ফিলিস্তিন, লেবানন ও সিরিয়ার বেশ খানিকটা এলাকা। পুব জেরুজালেম নিজ ভূমিভুক্ত করে নিয়েছে, যা পৃথিবীর একটি দেশও মেনে নেয়নি। ইসরাইল এমনকি এতটাই ঔদ্ধত্য দেখিয়েছে যে, বহু আরব দেশের বিরুদ্ধে 'পূর্বানুমানের কারণে' যুদ্ধ ঘোষণা করার নিজস্ব অধিকার জারী করেছে। এইসব ঘটনাকে ঠিক মতো ব্যাখ্যা করতে পারেননি পেরেজ। এগুলো ঘটার কারণ হিসেবে কেবল ইসরাইলের মারণাস্ত্রের শক্তির কথাই উলেখ করা যায়। এ জন্য পেরেজ অর্থহীন সন্ত্রাস ও সাংস্কৃতিক হীনমন্যতার অপবাদ অস্থানে অর্থাৎ মুসলমানদের ওপর চাপিয়ে দেন। ১৯৯৬ সালের আগস্টের ১৩ তারিখের সংখ্যায় পেরেজ প্রথমবারের মত বেনিয়ামিন নেতানিয়াহুর শক্তিকেন্দ্রিক নির্লজ্জ রাজনীতির সমর্থন করেন। এবং লিখেন, ইসরাইলকে কাজ করতে হচ্ছে আরব দেশগুলোর সাথে যেখানে "বিজ্ঞান ও শিল্পনির্ভর উত্থানের মত কোনো সাংস্কৃতিক প্রবণতা নেই। হায়! এগুলো হলো সেই সব জাতি যারা একটা ইটও বানাতে জানে না, মাইক্রোচিপস্ তো দূরের কথা।" পেরেজ তার মতকে (যার সাথে মিল আছে আফ্রিকান-আমেরিকানদের সম্পর্কে তার ধারণার, যারা তার কাছে ঐতিহাসিকভাবেই হীনমন্যতার মধ্যে পতিত।) টেনে নিয়ে যান এই সিদ্ধান্তের দিকে: "এই বিরাট ব্যবধান ইসরাইলের প্রতি গভীর, সম্ভবত, অনিয়ন্ত্রিত ক্রোধ সৃষ্টি করবে। তা হয়তো প্রচলিত অর্থে যুদ্ধ বাধাবে না, তবে সন্ত্রাস ও দাঙ্গা আরো বাড়িয়ে দেবে, বিগত বছরগুলো জুড়ে যে সব অভিজ্ঞতার মুখোমুখি হচ্ছে ইসরাইল।" তার প্রিয় দেশ ইসরাইলের বিরুদ্ধে কৃত পাপের অভিযোগে ইসলাম ও আরবদেরকে আক্রমণের জন্য পেরেজ যেভাবে বিস্তৃত, যুক্তিগর্হিত সাধারণীকরণ করেন, তার তুলনা পাওয়া যায় বর্ণনামূলক বা বিনোদনমূলক বই, পত্রপত্রিকা, টেলিভিশন প্রতিবেদন ও সিনেমায়। মিল্টন ভায়র্স্ট *নিউইয়র্কার*-এ অসংখ্য নিবন্ধের লেখক। ওগুলোকে তিনি একত্রিত করে গ্রন্থাকারে রূপ দেন *স্যান্ডক্যাস্‌ল: দি অ্যারাবস ইন সার্চ অব দি মডার্ন ওয়ার্ল্ড* (নপ, ১৯৯৪) শিরোনামে। তীক্ষ্ণ দৃষ্টির পর্যবেক্ষক ভায়র্স্টও ইসলাম সম্পর্কে অপরীক্ষিত পূর্বানুমানের অস্ত্রে কম শক্তিশালী নন। এসব পূর্বানুমান তিনি উপস্থিত করেন সামান্য আত্মসচেতনতা বা বিন্দুমাত্র সন্দেহ ছাড়াই। বইটি নিয়ে যে সব আলোচনা ছাপা হয় তার কোনোটিতে এ সম্পর্কে কোনো সমালোচনা নেই। একমাত্র ব্যতিক্রম দেখা যায় *জার্নাল অব প্যালাস্টাইন স্টাডিজ*-এর শীত, ১৯৯৬ সংখ্যায় মোহাম্মদ আলী খালিদের আলোচনাটিতে। তিনি কিছু নমুনা এক সাথে জড়ো করে খুবই চমৎকারভাবে উপস্থাপন করেছেন। ভায়র্স্টকে তিনি উদ্ধৃত করেন: "প্রচলিত ধাঁচের ইসলামী শহরগুলো বহিরঙ্গের সৌন্দর্যবোধ সম্পর্কে কদাচ সচেতনতার ছাপ বহন করে। এমনকি এখনো আরবরা তাদের রাস্তার দিকে নজর দেয় বলে মনে হয় না। ওগুলো ভরিয়ে রাখে নানান রাবিশে। কিছু প্রত্যক্ষদর্শী মনে করেন জনতার ব্যবহার্য জায়গাগুলোর প্রতি এমন উদাস মনোভাবের জন্য দায়ী হলো ইসলামী সংস্কৃতিতে আত্মকেন্দ্রিকতার প্রবণতা, কেবল বাড়ির চৌহদ্দির মধ্যে সামাজিক জীবনচর্চার অভ্যাস।" আরও আছে।

www.pathagar.com

ভায়র্স্ট বলেন, "খ্রিস্ট ধর্ম মানুষের যুক্তিবোধ গঠনের ক্ষমতাকে শিকল পরাতে ব্যর্থ হয়েছে, ইসলাম এ কাজে সফল। তাদের সংস্কৃতির অন্তর্গত রক্ষণশীলতার প্রতি সহজাত ঝোঁক লক্ষ্য করা যায় আরবদের মধ্যে, নিয়তিবাদের প্রতি যদি না-ও হয়। বুদ্ধিবৃত্তিক চ্যালেঞ্জ ওদের নিকট অস্বস্তিকর।" খালিদ ভায়র্স্টকে যথার্থই মনে করিয়ে দেন যে মুসলমানরাই গ্রীক দর্শনকে লালন করে, পরে তাদের নিকট থেকে গ্রীক দর্শনের ঐতিহ্য লাভ করে ইউরোপীয়রা। তেমনি মুসলমানরা যুক্তিবিদ্যা ও জ্যোতির্বিদ্যার প্রবর্তক এবং এলজেব্রার উদ্ভাবক। অষুধ সম্পর্কিত বিদ্যাকে বিজ্ঞান হিসেবে প্রতিষ্ঠা করে ওরাই।

এসব তথ্যে নিরুৎসাহিত হন না ভায়র্স্ট (কিংবা এগুলোর কিছুই তার জানা নেই)। তিনি নিশ্চিত মনে কথা বলেন "সৃজনশীল চিন্তার প্রতি মৌলিক বিদ্বেষ সম্পর্কে, যা ক্রমশ ইসলামের প্রধান বৈশিষ্ট্য হয়ে উঠছে" এবং দাবী করেন "আরব ও তুর্ক উভয় জাতির মুসলমানই এক কথায় মেনে নেয় যে, বুদ্ধিবৃত্তিক মাপকাঠির বিচারে তাদের সভ্যতা পশ্চিমের সভ্যতার কাছে কিছুই নয়।" কারণ "আধুনিক পৃথিবীকে দেয়া পশ্চিমের প্রকৃত উপহার বুদ্ধিবৃত্তির প্রতি আনুগত্য আরব সভ্যতাকে প্রায় স্পর্শই করেনি।"

এগুলো যেন আত্মরক্ষামূলক বা বিদেশী-ভীতির প্রকাশ। এসব বিবৃতিতে আমি হতাশাব্যঞ্জক যে-সাধারণ লক্ষণ দেখতে পাচ্ছি তা এই যে, এগুলোর সৃষ্টি ভায়র্স্ট, পেরেজের মত অসংখ্য স্ব-ঘোষিত মুখপাত্রদের দ্বারা। এরা যে ইসলামকে আক্রমণ করে তার মোদ্দা কারণ হলো ইসলামের প্রতি তাদের অমন প্রকাশ্য বিদ্বেষ। পশ্চিমের তুলনায় ইসলাম ধর্মের নিকৃষ্টতা দেখানোর জন্য ইসলামকে এভাবে উপস্থাপন করা হয়। ধরে নেয়া হয় ইসলাম এর বিরোধিতা করা, প্রতিবাদ করা ও প্রবল ক্রোধ প্রকাশ করার জন্য দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। এ ছাড়া, *নিউইয়র্কার, নিউইয়র্ক রিভিউ অব বুকস* কিংবা *আটলান্টিক মান্থলি*'র মত গুরুত্বপূর্ণ জার্নালও মুসলিম বা আরব লেখকদের নিবন্ধের (এমনকি সাহিত্যকর্মের) অনুবাদ ছাপে না। এরা ভায়র্স্টের মত বিশেষজ্ঞদের দিয়ে লেখানো রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক পরিস্থিতির বিশ্লেষণ প্রকাশ করে, যা সত্য তথ্যাদির ওপর রচিত নয় বরং উপরোক্ত নমুনার মতো পূর্বানুমানের ওপর ভর করে লেখা। এইসব চর্চার সমালোচকরা (যেমন খালিদ) কদাচ মূলধারায় এসে এদের আধিপত্যে চ্যালেঞ্জ জানান।

প্রচার মাধ্যম, কৌশল বিষয়ক জার্নাল ও প্রাতিষ্ঠানিক কাজকর্মে ইসলাম সম্পর্কিত জীর্ণ ধারণাগুলির প্রচারণা কী পরিমাণ ক্ষতি করেছে তার দু'একটি গুরুত্বপূর্ণ বিশ্লেষণের একটি হলো ইয়াচারি ক্যারাবেলের লেখা একটি নিবন্ধ (*ওয়ার্ল্ড পলিসি*, গ্রীষ্ম, ১৯৯৫)। তিনি এই ধারণা দিয়ে শুরু করেন যে, স্নায়ুযুদ্ধ অবসানের পর থেকে অন্যায় মনোযোগ ঢেলে দেয়া হয়েছে ইসলামের দিকে। তিনি যথার্থই বলেন, তখন গণমাধ্যমগুলো ইসলামের নেতিবাচক ছবিতে পূর্ণ। "আমেরিকার কলেজ, নামকরা বিশ্ববিদ্যালয় কিংবা অন্যান্য জায়গায় ছাত্রদের জিজ্ঞাস করে দেখুন 'মুসলিম' শব্দটি শুনে ওদের মধ্যে কি চিন্তা জাগে। অনিবার্যভাবে প্রায় একই জবাব মিলবেঃ দাড়িঅলা, অস্ত্রধারী, উন্মত্ত

www.pathagar.com

সন্ত্রাসী—তাদের এক নম্বর শত্রু আমেরিকাকে ধ্বংস করতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ।" ক্যারাবেল উদাহরণ স্বরূপ উল্লেখ করেন যে, এবিসির মর্যাদাময় ২০/২০ সংবাদ প্রোগ্রামও "অনেকগুলো খণ্ড প্রকাশ করেছে। ওগুলোর আলোচনায় এ কথাই বলা হয় যে, ইসলাম আল্লাহর পথে নিবেদিত যোদ্ধাদের নিয়ে জিহাদে রত এক ধর্ম। বিশ্বব্যাপী মুসলিম সন্ত্রাসীদের শাখাপ্রশাখা সম্পর্কে একটি তদন্ত প্রতিবেদন প্রকাশ করে *ফ্রন্টলাইন*।" ক্যারাবেল হয়তো ইঙ্গিত করেছেন জিহাদের ভীতি ছড়িয়ে দেয়ার উদ্দেশ্যে এমারসন কর্তৃক নির্মিত পিবিএস ফিল্ম *জিহাদ ইন আমেরিকা*'র কথা। এমনকি *সেক্রেড রেজ* বা *ইন দি নেম অব গড* জাতীয় উস্কানিধর্মী শিরোনামের বিনোদনমূলক বইগুলোর কথাও হয়তো নির্দেশ করে থাকবেন ; এসব বই ইসলাম ও বিপদজনক অসহিষ্ণুতার সম্পর্ক আরো দৃঢ় ও অনিবার্য হিসেবে দেখায়। "একই কথা বলা যায় মুদ্রণ প্রচার মাধ্যম সম্পর্কেও" ক্যারাবেল বলেন, "মধ্যপ্রাচ্য বিষয়ক প্রতিবেদনের সাথে সচরাচর একটি মসজিদ বা একদল নামাজরত মানুষের ছবি থাকবেই।"

দেড়যুগ আগে প্রকাশিত *কভারিং ইসলাম*-এর প্রথম সংস্করণে আমি যেমন বর্ণনা করেছিলাম, উপরোক্ত সকল কারণে পরিস্থিতি আরো খারাপ হয়েছে। যেমন এখন বহু সংখ্যক নতুন ফিচার ফিল্ম বানানো হয়েছে (ক্যারাবেল আমাদের মনে করিয়ে দেন এর একটি হলো *ট্রু লাইজ*, যার খল চরিত্রটি চকচকে চোখ আর আমেরিকানদের খুন করার নেশায় চিত্রিত এক ধ্রুপদ আরব সন্ত্রাসীর প্রতিমূর্তি)। এসব ছবির কাজ হলো প্রথমে মুসলমানদেরকে শয়তান ও মানবেতর রূপে চিত্রিত করা, পরে আমেরিকান নায়কের দ্বারা তাদেরকে কেটে সাফ করানো। এ প্রবণতার সূচনা *ডেল্টা ফোর্স* (১৯৮৫) দিয়ে। তা এগিয়ে যায় ইন্ডিয়ানা জোনসের অভিযানসমূহ থেকে অসংখ্য টেলিভিশন সিরিয়ালের মধ্য দিয়ে। এসব সিনেমায় মুসলমানরা সব একই রকম শয়তান, উন্মত্ত এবং সর্বোপরি, অনিবার্যভাবেই, খুন হওয়ার যোগ্য। হলিউড ফিল্মে প্রাচ্য নিয়ে চরম আনন্দদায়ক ছবি বানানোর রীতির মধ্যে একমাত্র সাম্প্রতিক পরিবর্তন হলো ছবিতে এখন আর রোমান্স বা আনন্দকর কিছু নাই। নিন্‌জা ছবিতেও একই অবস্থা। ওগুলোয় দেখা যায় এক শাদা (এমনকি কালো) আমেরিকান নায়ক কালো মুখোশধারী অসংখ্য প্রাচ্যদেশীয়র বিরুদ্ধে একা; অবশ্য শেষে ওদের প্রত্যেকেই তাদের ন্যায্য প্রাপ্য লাভ করে।

এসব কৌশলে ভুলভাবে প্রতিবেদন করার মধ্যে শত্রুতা ও হেয় করার একটা ওতোপ্রোত চেষ্টা আমরা দেখছি। এ ছাড়াও লক্ষণীয় আরেকটি বিষয় হলো, ওরা মুসলিম চরমপন্থী তৎপরতাকে কতটা ফুলিয়ে ফাঁপিয়েই না সমগ্র মুসলিম বিশ্বের ওপর চাপিয়ে দিচ্ছে। আর ক্যারাবেলও কেমন চমৎকার দ্ব্যর্থক ভঙ্গিতে সঙ্কীর্ণ করে বলে ফেললেন, "আধুনিকতা ও অসাম্প্রদায়িকতার পেছনে এক ফোঁটা শক্তিও ব্যয় হয়নি মধ্যপ্রাচ্যে।"

১৯৯৩ সালে প্রকাশিত আমার একটি নিবন্ধ পরে অন্তর্ভুক্ত হয় *দি পলিটিক্স অব ডিসপোজিশন* (প্যান্থিয়ন, ১৯৯৪) গ্রন্থে। আমি ওতে দেখানোর চেষ্টা করেছি যে,

www.pathagar.com

মৌলবাদ নয়, বরং অসাম্প্রদায়িক চেতনাই আরববিশ্বকে ঐকবদ্ধ করে রেখেছে, চমক সৃষ্টির প্রতি সদা আগ্রহী মার্কিন প্রচার মাধ্যমের বেপরোয়া অপপ্রচারণা সত্ত্বেও। আর, প্রচার মাধ্যমের বেশির ভাগ মতামতই আসে ইসলাম-বিরোধী, ক্যারিয়ারিস্ট প্রচারণাকারীদের নিকট থেকে; এরা শয়তানী বিদ্যায় তাদের দক্ষতা প্রমাণের নতুন একটি ক্ষেত্র পেয়ে গেছে। নিদেন পক্ষে কারো এইটুকু স্বীকার করা উচিত যে, ইসলামপন্থী ও বিপুলভাবে সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলমানদের দ্বন্দ্বে সামগ্রিক বিবেচনায় ইসলামপন্থীরা আজ পরাজিত। ফরাসি রাষ্ট্রবিজ্ঞানী অলিভার রয় এই ব্যাপারটাই সনাক্ত করেছেন তার রচনা *দি ফেইলিউর অব পলিটিক্যাল ইসলাম* (হার্ভার্ড, ১৯৯৪)-এর শিরোনামে। অন্যদের, যেমন *দি ইসলামিক থ্রেট: মিথ অর রিয়ালিটি?*-এর গ্রন্থকার জন এসপোসিটোর ব্যাখ্যা ভিন্ন দৃষ্টিকোণে নির্ভরশীল। তিনি গণ-পর্যায়ের কথিত ঐক্য ও পশ্চিম-বিরোধী মনোভাবের ওপর জোর দিয়েছেন মুসলিম সমাজগুলোর বৈচিত্র্য, জটিল অভিব্যক্তি এবং ঐতিহ্যিক ও ঐতিহাসিক অভিজ্ঞতার ভিন্নতার ভিত্তিতে। তবু এমন যৌক্তিক, সুষ্ঠ গবেষণালব্ধ, বিকল্প মতামত কদাচ চোখে পড়ে। আদিম, ক্রুদ্ধ, হুমকিস্বরূপ, ষড়যন্ত্রকারী রূপে ইসলামকে তুলে ধরার বাজারটাই এখন সবচেয়ে বড়। এই বাজার অধিক ব্যবহারযোগ্য এবং প্রচুর উত্তেজনা সৃষ্টি করতে সক্ষম—তা নতুন এক বিদেশী শয়তানের বিরুদ্ধে আবেগ উস্কে দেয়ার জন্যই হোক কিংবা নিছক মনোরঞ্জনের জন্যই হোক। কারণ প্রতিটি ভিন্ন ধরনের গ্রন্থ, যেমন রিচার্ড বুলিয়েটের *ইসলাম: দি ভিউ ফ্রম দি এজ* (কলাম্বিয়া, ১৯৯৪)-এর অনুরূপ মতামত আরো অনেক বই ও প্রবন্ধ-নিবন্ধে পাওয়া যাবে। ডেভিড প্রাইসজোনসের *ইন দি ক্লোজড় সার্কেল* (হার্পার, ১৯৯১), চার্লস ক্রোথামারের নিজের কথায় "*দি গ্লোবাল ইনতিফাদা*"র উচ্চগলার রুক্ষ বর্ণনায় (*ওয়াশিংটন পোস্ট*, ফেব্রুয়ারী ১৬, ১৯৯০), অথবা *নিউইয়র্ক টাইমসে* এ. এম. রোজেনথালের যে কোনো লেখায় (উদাহরণস্বরূপ সেপ্টেম্বর ২৭, ১৯৯৬ সংখ্যায় প্রকাশিত "দি ডিক্লাইন অব দি ওয়েস্ট") প্রায়ই গলার জোরে ইসলাম, সন্ত্রাসবাদ ও ফিলিস্তিনীদেরকে এক সারিতে দাঁড় করিয়ে দেয়া হয়। এগুলোই আবার মার্কিন প্রচার মাধ্যমের মর্যাদাকর অংশে গৃহীত হয় তথ্যভিত্তিক বিশ্লেষণ ও প্রতিবেদন হিসেবে। ইয়োভনি ইয়াজবেক হাদ্‌দাদের "ইসলামিস্ট পারসেপশনস অব ইউএস পলিসি এন্ড দি নিয়ার ইস্ট" শিরোনামের রচনার মত চমৎকার বিশ্লেষণগুলো মূল ধারার প্রচার মাধ্যমের প্রতিদিনের পাঠকদের চোখে পড়ার সম্ভাবনা কম। কি দুর্ভাগ্য! এ ধরনের একটি নিবন্ধ অন্তর্ভুক্ত হলো ডেভিড ডবিউ. লেচ কর্তৃক সম্পাদিত *দি মিড্‌ল ইস্ট এন্ড দি ইউনাইটেড স্টেট্‌স"* (ওয়েস্ট ভিউ, ১৯৯৬) নামের একটি আড়ালে-পড়া একাডেমিক সঙ্কলনে। রোজেনথাল ও ক্রোথামারের বিপরীতে এই ভদ্রমহিলা খুবই সতর্কতার সাথে পাঁচ প্রকৃতির ইসলামিস্ট চিহ্নিত করেন (লক্ষণীয় যে, তিনি উস্কানিদায়ক 'চরমপন্থী', 'মৌলবাদী' প্রভৃতি শব্দের পরিবর্তে ব্যবহার করেছেন ইসলামিস্ট শব্দটি)। এমনকি, মুসলমানদের উস্কানি দেয় এমন এক গুচ্ছ মন্তব্যও তিনি এক সাথে করে তুলে দিয়েছেন, যেগুলো ক্রমেই তিক্ত

www.pathagar.com

করেছে পশ্চিম ও মুসলিম বিশ্বের সম্পর্ক। এগুলোর মধ্যে আছে বেনগুরিন ("আমরা ইসলাম ছাড়া আর কিছুকে ভয় করি না"), আইজাক রবিন ("ইসলাম ধর্মই আমাদের একমাত্র শত্রু") ও শিমন পেরেজের মন্তব্য ("ইসালাম তার তরবারি গুটিয়ে না নেয়া পর্যন্ত আমরা নিরাপদ বোধ করবো না")। এর সাথে তিনি যোগ করেছেন ইসলামী বিশ্বে সরাসরি মার্কিন আঘাতের একটি তালিকা; এইসব মার্কিন পদেক্ষপ শেষে রূপান্তরিত হয়েছে, আগ্রাসী না হলেও দৃঢ়, ইসরাইল-মার্কিন জোটে।

এগুলো নির্ভুল কিনা কিংবা কেউ নিঃশর্তে তা গ্রহণ বা খারিজ করলো কি না সেটি হাদ্‌দাদের বক্তব্যের মূল লক্ষণীয় বিষয় নয়। আসল ব্যাপার হলো এর মধ্যে এমন এক কথকের আভাস পাওয়া যায় যার রয়েছে বিষয় সম্পর্কে যথার্থ যুক্তি ও আগ্রহ। সাম্প্রতিক চিত্রটি নিয়ন্ত্রণ করছে আমেরিকার অনুশোচনাহীন প্রচার মাধ্যমের যে-সব প্রতিবেদন তার বেশিরভাগই বরাবর উপেক্ষা করেছে এই যুক্তি ও আগ্রহকে। সাংবাদিক বা প্রচার মাধ্যমের কারো কাছে কেউ এমন আশা করবে না যিনি বা তারা অনেক সময় দিয়ে পড়াশোনা করে এক একজন পণ্ডিত হয়ে উঠবেন, ভিন্ন মত খুঁজে বেড়াবেন কিংবা এমন জ্ঞানার্জনের চেষ্টা করবেন যাতে মনে হয় ইসলাম আদিম বা আগ্রাসী নয়। কিন্তু ইসলাম সম্পর্কে সংকোচক যুক্তির ওপর জোর দেয় এমন মতামত বিনা সমালোচনায়, অন্ধের মত মেনে নেয়া কেন? ইসলামকে দায়িত্বহীনভাবে চিত্রিত করার উদ্দেশ্যে ছড়িয়ে দেয়া সরকারী ভাষ্যগুলো গ্রহণ করতে এত আগ্রহ কেন? আমি বোঝাতে চাচ্ছি 'ইসলাম' সম্পর্কে যথেচ্ছা 'সন্ত্রাস' শব্দটি ব্যবহারের প্রবণতাকে, ইসলামী 'বিপদ' বিষয়ে ইসরাইলী মতামতকে যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রীয় নীতির স্তরে নিয়ে এসেছে যে মনোভাব, সেই মনোভাবকে।

ইসলাম খ্রিস্টীয় পশ্চিমের বিবেচনাযোগ্য প্রতিদ্বন্দ্বী—এমন ধারণা এখনো কতটা প্রভাবশালী সে সত্যের মধ্যে নিহিত রয়েছে ওপরের প্রশ্নের উত্তর। জাপানকে কোণঠাসা করা চেষ্টা অব্যাহত থাকার আসল কারণ জাপান এখনো ইউরো-আমেরিকান অর্থনৈতিক আধিপত্য আগ্রাসীভাবে ঠেকিয়ে যাচ্ছে। একমাত্র অবশিষ্ট পরাশক্তি আজকের যুক্তরাষ্ট্রের উত্থানের মধ্যে গোটা পৃথিবীকে নিজের করদরাজ্য মনে করার প্রবণতা প্রবল। বড় বড় সাংস্কৃতিক গ্রুপগুলোর প্রায় সবগুলোই যখন যুক্তরাষ্ট্রের ভূমিকা মেনে নিয়েছে বলে মনে হচ্ছে, তখন একমাত্র ইসলামী বিশ্বেই দৃঢ় প্রতিরোধের শক্ত লক্ষণ দেখা যাচ্ছে। এ জন্য যেসব ব্যক্তি বা দল মনে করে আলোকিত আধুনিকতার আদর্শ হলো পশ্চিম, তাদের পক্ষ থেকে উপর্যুপরি আক্রমণ চলছে ইসলামের ওপর। এ সত্ত্বেও, তা পশ্চিমের যথাযথ বিবরণ হয়ে ওঠা তো দূরের কথা, আসলে হয়ে উঠছে অন্ধভাবে পশ্চিমা শক্তির মূর্তি-প্রতিষ্ঠার প্রয়াস।

ইসলামের বিরুদ্ধে সাংস্কৃতিক লড়াইয়ে সবচেয়ে জঘন্য আক্রমণকারীদের একজন হলেন প্রবীন বৃটিশ প্রাচ্যতাত্ত্বিক—বর্তমানে আমেরিকাবাসী— বার্নার্ড লুইস। *দি নিউইয়র্ক রিভিউ অব বুক্‌স, কমেন্টারী, আটলান্টিক মান্থলি* এবং *ফরেন এ্যাফেয়ার্স*-এ নিয়মিত ছাপা হয় এই ভদ্রলোকের লেখা। বহু বছর ধরে তার মতামত

www.pathagar.com

অপরিবর্তিত, বরং দিন দিন আরো কর্কশ ও আরো সংকোচনধর্মী হয়েছে। গত কয়েক দশকে লুইসের মতামত চুঁইয়ে চুঁইয়ে নেমে সয়লাব করে দিয়েছে উচ্চাকাঙ্ক্ষী সাংবাদিক ও কোনো কোনো রাষ্ট্রবিজ্ঞানীর লেখা বই-পত্র-নিবন্ধ। উনিশ শতকের বৃটিশ ও ফরাসি ধারার প্রাচ্যতত্ত্ব ইসলামে দেখেছে খ্রিস্টানত্ব ও উদারনৈতিক মূল্যবোধের বিপদ। কেন লুইসের মতামত উৎসের প্রশ্নে উনিশ শতকের ফরাসি ও বৃটিশ প্রাচ্যতাত্ত্বিক স্কুলের সাথে সঙ্গতিপূর্ণভাবে প্রথানুগ? কেনই বা তা এত প্রতিষ্ঠিত?—এসব প্রশ্নের জবাব সোজা: লুইসের সব লেখাজোখায় সবচেয়ে বেশি জোর দেয়া হয়েছে ইসলামকে মৌলিকভাবে *আমাদের* জানা, পরিচিত ও আবাসিত জগতের বাইরের ষিষয় হিসেবে দেখানোর জন্য। এ ছাড়া আধুনিকতার বিরুদ্ধে অনুমিত যুদ্ধে উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত ইউরোপীয় এন্টি-সেমেটিজম ব্যবহারের সুযোগ পেয়েছে সমকালীন ইসলাম। *অরিয়েন্টালিজম* বইয়ে আমি লুইস সম্পর্কে বলেছিলাম, পদ্ধতি হলো জাল পর্যবেক্ষণ, কোনো জনগোষ্ঠীর ব্যাপারে প্রচুর সাংস্কৃতিক যুক্তি তুলে ধরার জন্য প্রতারণাপূর্ণ শব্দপ্রকরণ। যেহেতু ইসলামী জনগোষ্ঠী পশ্চিমা নয় তাই ওরা ভালোমানুষ হতে পারে না— এমন বক্তব্য প্রতিষ্ঠার জন্য লুইসের পরিকল্পিত চেষ্টার (এমন ধারণায় ঝাঁপিয়ে পড়তে তার অতিরিক্ত আগ্রহ) বাইরে মুসলমানরা যে তাদের নিজস্ব সাংস্কৃতিক, রাজনৈতিক ও ঐতিহাসিক চর্চার অধিকার রাখে এই কথা মেনে নিতে লুইসের ঘোরতর অক্ষমতাও তো কম নিন্দার নয়।

ওয়াতন শব্দটির ওপর লেখা তার একটি নিবন্ধ দৃষ্টান্ত হিসেবে নেয়া যাক। আরবীতে শব্দটির অর্থ বাসভূমি বা জাতি। এ সম্পর্কে লুইসের উদ্দেশ্যপূর্ণ বিবরণের শেষ লক্ষ্য শব্দটিকে তার আঞ্চলিক বা ব্যবহারিক গূঢ়ার্থ থেকে বিচ্ছিন্ন করা। প্রাসঙ্গিক প্রমাণ ছাড়াই তিনি ধরে নেন যে, এই শব্দটি বাসভূমি (Patria, or Patrie, or Patris) বোঝায় না এবং এর সাথে তুলনাও করা যায় না। কারণ ইসলামে 'ওয়াতন' বসবাসের একটি নিরপেক্ষ স্থান। তার এই ব্যাখ্যার ওপর রচিত হয়েছে *ইসলাম এন্ড দি ওয়েস্ট* (অক্সফোর্ড, ১৯৯৩)-এর একটি প্রবন্ধ। এই প্রবন্ধ এবং বইয়ের সমধর্মী অন্যান্য প্রবন্ধের লক্ষ্য প্রথমত- লুইসের পাণ্ডিত্য দেখানো, দ্বিতীয়ত- পশ্চিমাদের শ্রেষ্ঠতর কর্তৃত্বের মাধ্যমে দেখানো যে, মুসলমানরা প্রকৃতপক্ষে যা ভাবে তা ভাষায় প্রকাশ করতে পারে না। প্রবন্ধটিতে আরব মুসলমানদের চলমান বাস্তবতার ব্যাপারে চরম অজ্ঞতা পীড়াদায়ক। তাদের জন্য ওয়াতন শব্দটি আসলেই অস্তিত্বগতভাবে 'বাসভূমি'র সাথে জড়িত। লুইস তার আপাত-চমৎকার যুক্তির সপক্ষে মধ্যযুগের আরবী সাহিত্য থেকে দুইতিনটা উদাহরণ তুলে ধরেন এবং এড়িয়ে যান আঠার শতক থেকে বর্তমান পর্যন্ত বিস্তৃত সাহিত্যিক উৎসগুলো। তেমনি সাধারণ দৈনন্দিন ব্যবহারের প্রসঙ্গটি উপেক্ষা করেন, যেখানে (কেতাবী অর্থের বিপরীতে) প্রকৃত আরবদের প্রাত্যহিক ব্যবহারে শব্দটি আসলেই বোঝায় বাসভূমি, সহায়-সম্পদ, আনুগত্য। আরবী ভাষা তার নিকট বইয়ের ভাষা মাত্র, প্রতিদিনের কথ্যভাষা বা ভাব আদান-প্রদানের মাধ্যম নয়। তাই নির্দিষ্ট অভ্যাস এবং সংশিষ্টতা নির্দেশক শব্দ *বিলাদ* ও *আর্দ*-এর প্রসঙ্গ তার মনেই আসে না।

www.pathagar.com

লুইসের অসাধারণ বিশ্লেষণ-পদ্ধতি আবার সেই মানবতা-বিরোধী আক্ষরিকতার ওপর নির্ভরশীল। এর ওপর ভিত্তি করে তিনি ডিক্রী দেন মুসলমানরা কি অনুভব করে ও কি চায়। তিনি বলেন, ইসলাম "শুধুমাত্র বিশ্বাস ও ইবাদতই নয়, বলতে গেলে, জীবনের একটা খুপরিও... বরং জীবনের সমগ্রতা।" এ ধরনের ভাষ্য পক্ষপাতদুষ্ট তো বটেই, মানুষের জীবন আসলে কিভাবে কাজ করে সে সম্পর্কে একটা হাস্যকর ভুল-উপলব্ধিও। লুইসের বিশ্লেষণ পদ্ধতি ইঙ্গিত করে যে, সকল মুসলমান—অর্থাৎ এক বিলিয়ন মুসলমানের সবাই—লুইসের কথিত 'বিধি-বিধান'গুলি একইভাবে পড়েছে, আত্মীকৃত করেছে এবং মেনে নিয়েছে; এগুলোর দ্বারাই নিয়ন্ত্রিত হয় "সিভিল, ক্রিমিনাল এবং যাকে বলা হয় সাংবিধানিক আইন তাও"। অতপর মুসলমানরা প্রাত্যহিক জীবনের প্রতিটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে দাসের মতো সে আইন মেনে চলে।—আজগুবি কথাটা যদি কোথাও ব্যবহার করতে হয়, তাহলে এইখানেই (লুইসের ব্যাখ্যা সম্পর্কে)। সামগ্রিকভাবে মানব জীবন তো দূরের কথা, লুইস মুসলমানদের জীবনের বৈচিত্র্যও উপলব্ধি করতে পারেননি, কারণ তা তার কাছে ভিন্‌দেশী, মৌলিকভাবে ভিন্নরকম এবং 'আন' (Other)।

এর সবচেয়ে প্রকাশ্য প্রমাণ তার নিবন্ধ "ইসলামের প্রত্যাবর্তন"। এটি প্রথম ছাপা হয় চরম-ডানপন্থী ইহুদি পত্রিকা *কমেন্টারিতে*, পরে অন্তর্ভুক্ত হয় *ইসলাম এন্ড দি ওয়েস্ট* গ্রন্থে। পণ্ডিতিপণার ভাণ দেখিয়েও তার কায়দায় চালিয়ে যান লুইস। সাম্প্রতিক আরব বিশ্বের প্রধান প্রধান রাজনৈতিক ঘটনাবলীর বেশিরভাগই যে সাত শতকের ইসলামে প্রত্যাবর্তনমুখি ব্যাপার এবং তিনি ও তার লোকেরা যে তা গ্রহণ করেন না, এই অভিযোগের পক্ষে যুক্তিস্বরূপ ভূয়া ভাষাতত্ত্ব ব্যবহার করেন তিনি। গভীর উপলব্ধি-ক্ষমতার অধিকারী পণ্ডিত আসাদ আবু খলিল সুন্দর বলেছেন, " এমন বিশ্বাস করার অধিকার লুইসের আছে যে, 'আধুনিক পশ্চিমা মনের' সাথে মুসলিম মনের মৌলিক ও বংশগত পার্থক্য রয়েছে। তার মতে শত শত বছরেও মুসলিম মনের কোনো পরিবর্তন হয়নি (এ কারণেই তিনি বর্তমান কালের পরিস্থিতি ব্যাখ্যার জন্য মধ্যযুগের মুসলিম জুরিদের কথা উদ্ধৃত করতে পারেন)। তবে তার বিশ্লেষণ বড়জোর মূর্খতা মাত্র।" (জেপিএস, শীত, ১৯৯৫)। এইটাই আসল কথা। কারণ আজকের 'মুসলিম মন' কোন লক্ষ্যে ধাবিত তা বোঝানোর জন্য পাঠকের সামনে দিয়ে প্যারেড করে এগিয়ে যায় লুইসের প্রাচ্যতাত্ত্বিক পদ্ধতি। তা স্বাভাবিকভাবেই অগ্রাহ্য করে ঐতিহাসিক পরিবর্তন বা মানবীয় সক্রিয়তা কিংবা এমন সম্ভাবনা যে, সাত শতক থেকে আজতক সকল মুসলমান হয়তো একইভাবে চিন্তা করেনি। আবার এর ফলে তিনি বর্তমান সম্পর্কে যথাযথ আলোচনা করার দায়িত্ব থেকেও অব্যাহতি পেয়ে যান। লুইসের উদ্দেশ্য পাঠককে বিশ্বাস করানো যে, মুসলমানরা অপরিবর্তনীয়ভাবে কেবল ইসলাম নিয়েই ছিলো এবং আছে।

লুইস সবচেয়ে জঘন্য চেহারায় হাজির হন তার "দি রুটস অব মুসলিম রেইজ"-এ। নামটাই ইঙ্গিতপূর্ণ। *দি আটলান্টিক* পত্রিকার সেপ্টেম্বর, ১৯৯০ সংখ্যায় লেখাটি ছাপা

www.pathagar.com

হয়। ঐ সংখ্যাটির প্রচ্ছদ তৈরি করেছেন যিনি তিনি লুইসের বক্তব্য খুব ভালোভাবেই বুঝতে পেরেছিলেন মনে হয়। প্রচ্ছদে দেখা যায়, পাগড়িমাথায়, অবশ্যই ইসলামী একটা মুখ, তীব্র ভ্রূকুটি সহকারে পাঠকের দিকে তাকিয়ে। তার চোখের তারায় আমেরিকার পতাকা, ভঙ্গিতে তীব্র ঘৃণা ও ক্রোধ। "দি রুটস অব ইসলামী রেইজ"-এ গ্রহণযোগ্য যুক্তি নেই। এটি মানবীয় জ্ঞান-বিচ্যুত তর্কের মত; ঐতিহাসিক সত্য নেই এতে। নিবন্ধটি মুসলমানদের চিত্রিত করে এমন এক যৌথ-মানুষ হিসেবে যে বাইরের পৃথিবীর প্রতি ভীষণ ক্রুদ্ধ; কারণ সে পৃথিবী তার আদিম শান্তি নষ্ট করেছে এবং তার অব্যাহত শাসনের প্রতি চ্যালেঞ্জ জানিয়েছে। একটু নমুনা দিই:

> শেষ আঘাতটা আসে নিজের ঘরে, তার (সাধারণ মুসলমান পুরুষের) মাতব্বরির ওপর। বন্ধন-মুক্ত নারী ও বিদ্রোহী ছেলে-মেয়েদের তরফ থেকে। তা সহ্য করার মত নয়। এইসব অজানা, অবিশ্বাসী অবোধ্য শক্তি তার আধিপত্য ভেঙ্গে ফেলেছে, তার সমাজ বিপর্যস্ত করেছে, শেষে তার ঘরের শেষ আশ্রয়টুকু নষ্ট করেছে। কাজেই এর বিরুদ্ধে ক্রোধ বিস্ফারিত হওয়া অনিবার্য ব্যাপার ছিলো। আর এও স্বাভাবিক যে ক্রোধ ধাবিত হবে বহুযুগের পুরোনো শত্রুর প্রতি, আর তা শক্তি সংগ্রহ করবে প্রাচীন বিশ্বাস ও আনুগত্য থেকে।

পরে লুইস নিজের বক্তব্যের সাথেই সংঘাতপূর্ণ কথা হাজির করেন। বলেন, মুসলমানরা একবার 'আন্তরিকতা ও শেখার ' ইচ্ছা নিয়ে পশ্চিমকে স্বাগত জানিয়েছিলো। কিন্তু, তার মতে, ঐ সব ঘটনার জন্য (পশ্চিমকে) দায়ী করার একান্ত অনুভব থেকে "গভীরতার আবেগ জেগে ওঠায়" ঐ সাদর আমন্ত্রণ বিলীন হয়ে যায় নিখাদ রাগ ও ঘৃণায়। নিবন্ধের শেষে আঁতকে ওঠার মত এক অভিযোগ করে বসেন লুইস। তিনি মন্তব্য করেন, 'আমরা' মূলত আধুনিকতার প্রতি (ইসলামের) অকারণ ও নিখাদ ক্রোধ নিয়ে আলোচনা করছি :

> এর মধ্যে পরিষ্কার হয়েছে যে, আমরা এমন এক মনোভঙ্গি ও আলোড়নের মুখোমুখি আজ, যা ইস্যু, নীতিমালা ও এসবের তত্ত্বাবধায়ক সরকারকেও ছাড়িয়ে বহুদূর এগিয়ে গেছে। এটি সভ্যতার সংঘাতের চেয়ে কম কিছু নয়; আমাদের "ইহুদি-খ্রিস্টীয়" উত্তরাধিকার, আমাদের অ-সাম্প্রদায়িক বর্তমান এবং বিশ্বের সর্বত্র এই দুয়ের বিস্তারের প্রতি এক পুরোনো শত্রুর নিশ্চিত ঐতিহাসিক প্রতিক্রিয়া, হয়তো বা যুক্তিহীন। তবে গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার হলো, আমরাও যেন তাদের প্রতি একইরকম ঐতিহাসিক ও অযৌক্তিক প্রতিক্রিয়া না দেখাই।

অন্য কথায় বলা যায়, মুসলমানরা এখন প্রতিক্রিয়া করছে কারণ ঐতিহাসিক, এমনকি বংশগতি অনুসারে, পূর্ব-নির্ধারিত যে এরা প্রতিক্রিয়াই করবে। অর্থাৎ এরা যা করছে তা নীতি বা তৎপরতা বা এমন জাগতিক কিছু নয়। এরা যুদ্ধ করছে অসাম্প্রদায়িক বর্তমানের বিরুদ্ধে, যে-অসাম্প্রদায়িকতা লুইসের 'আমাদের' এবং কেবল আমাদের জিনিষ।

www.pathagar.com

এ রকম দাবীর মধ্যে চাড়িয়ে থাকা ঔদ্ধত্য বিস্ময়কর। কেবল এ জন্য নয় যে, মুসলিম এবং 'আমরা' বলে পরস্পরকে মুখোমুখি করে দেয়া হয়েছে; অথচ বহু শতাব্দী ধরে দুই পক্ষের আদান-প্রদান এবং একে ওপরের ওপর বিস্তারের ব্যাপারটা লুইস স্রেফ অস্বীকার করেন। এ ছাড়াও লক্ষণীয় বিষয় হলো 'ওরা' রাগ ও যুক্তিহীনতায় তালাবদ্ধ; আর 'আমরা' উপভোগ করছি আমাদের যৌক্তিকতা ও সাংস্কৃতিক শ্রেষ্ঠত্ব। আমরা প্রতিনিধিত্ব করি আসল অর্থাৎ অসাম্প্রদায়িক পৃথিবীর; ওরা গালমন্দ, গলাবাজি আর বকবকানি নিয়ে আছে এমন এক পৃথিবীতে যা শিশুসুলভ বিশ্ব ছাড়া আর কিছু নয়। সবশেষে 'আমাদের' পৃথিবী হলো ইসরাইল ও পশ্চিমের পৃথিবী; ওদেরটা ইসলামী বিশ্বসহ বাকী পৃথিবী। কেবল ইস্যু নিয়ে আলোচনা করলে বা তর্ক করলে চলবে না, ওদের বিরুদ্ধে শর্তহীন শত্রুতার মাধ্যমেই আত্মরক্ষার ব্যবস্থা নিতে হবে। আশ্চর্যের কিছু নেই যে, স্যামুয়েল পি. হান্টিংটন 'ক্ল্যাশ অব সিভিলাইজেশন' বিষয়ে তার লেখার শিরোনাম ও মূল বক্তব্য নিয়েছেন লুইসের লেখা থেকেই।

এ জাতীয় ধারণাকে শত্রুতামূলক ও যুক্তিরহিত বলা অতিরঞ্জন নয়। কারণ বিভিন্ন সাংবাদিকের লেখায় এগুলোকেই 'চমৎকার' আখ্যায়িত করা হয়। যেমন দেখি *নিউ ইয়র্ক টাইমসের* সাংবাদিক জুডিথ মিলারের লেখায়; তার বই *গড হ্যাজ নাইনটি নাইন নেমস: এ রিপোর্টার'স জার্নি থ্রো এ মিলিট্যান্ট মিড্‌ল ইস্ট* (সিমন এন্ড স্কাস্টার, ১৯৯৬) ইসলাম বিষয়ে প্রতিবেদন করার ক্ষেত্রে বিকৃতি ও অসম্পূর্ণতার টেক্সট বইয়ের মতো দৃষ্টান্ত। আকাঙ্ক্ষিতভাবে, ১৯৯৩ সালে *ফরেন এ্যাফেয়ার্স*-এর সিমপোজিয়াম "দি ইসলামিক থ্রেট"-এ জুডিথ অংশ গ্রহণ করেন। পরবর্তী সময়ে মধ্যপ্রাচ্য বিষয়ক সেমিনার ও টক শোতে দেখা যায় ঐ পুরানো কাসুন্দিই ঘাঁটা হচ্ছে। মিলারের বিশেষ উদ্দেশ্য হচ্ছে স্বর্ণযুগ আগমনের ইঙ্গিতবাহী অভিসন্দর্ভের এই বক্তব্য প্রমাণ করা যে, ইসলাম পশ্চিমের সামনে এক মহাবিপদ। এই ধারণাই স্যামুয়েল হান্টিংটনের 'ক্ল্যাশ অব সিভিলাইজেশন' শীর্ষক গীবতের আত্মা। কাজেই সোভিয়েত ইউনিয়ন ভাঙ্গার পর আপাত বুদ্ধিবৃত্তিক শূন্যতার মধ্যে নতুন শয়তানের খোঁজ শুরু হয়। একইরকম খোঁজ শুরু হয়েছিলো আট শতকের খ্রিস্টান সমাজেও। তখন ইসলাম এমন এক ধর্ম পশ্চিমের কাছে, যার নিকটবর্তী ও অশান্ত উপস্থিতিকে মনে হয়েছিলো নারকীয় ও হিংস্র; ঠিক এখন যেমন মনে হয়। (লক্ষণীয়,হান্টিংটন ও লুইস এমনভাবে পশ্চিম কথাটি ব্যবহার করেন যা 'ওদের' বিপরীতে 'আমাদের' সভ্যতা জাতীয় পার্থক্য তৈরি করে)। মিলার উল্লেখ করেননি বেশিরভাগ মুসলিম দেশ এখন দারিদ্র্যে বিপর্যস্ত, স্বৈরশাসনাধীন এবং নিজের নাগরিকদের ছাড়া আর কারো জন্য হুমকি হওয়ার পক্ষে সামরিক ও বৈজ্ঞানিকভাবে একেবারেই অক্ষম। আর সব থেকে শক্তিশালী মুসলিম দেশ পাকিস্তান, সৌদী আরব, মিশর ও জর্দান যে সম্পূর্ণরূপে যুক্তরাষ্ট্রের আওতাধীন সে বাস্তবতাও বুঝি মিলারের নাগালের বাইরে। আসলে মিলার, হান্টিংটন, মার্টিন ক্রেইমার, ডেনিয়েল পাইপস, ব্যারি রুবিনের মত 'বিশেষজ্ঞ' এবং গোটা একদল ইসরাইলী একাডেমিশিয়ানের আসল লক্ষ্য হলো আমাদের চোখের সামনে সবসময় ইসলামী 'হুমকি'র ঝুলে থাকা নিশ্চিত করা।

www.pathagar.com

সন্ত্রাস, স্বৈরতন্ত্র ও হিংস্রতার অভিযোগে ইসলামের ছাল তুলে ফেলা, আর এই ফাঁকে নিজেদের লাভজনক কনসালট্যান্সি, টেলিভিশন বক্তৃতা আর বইয়ের চুক্তি অব্যাহত রাখা। প্রকৃত সত্য সম্পর্কে অন্ধকারে থাকা মার্কিন ভোক্তাদের নিকট ইসলামী হুমকি অসামঞ্জস্যপূর্ণভাবে ভয়াবহ করে তোলা হয়। ফলে তা সমর্থন যোগায় এই হাইপোথিসিসে যে, প্রতিটি বিস্ফোরণের পেছনেই বিশ্বব্যাপী ষড়যন্ত্র আছে। (এও আসলে এন্টি-সেমিটিজম ধরনের মনস্তাত্ত্বিক সমস্যারই সমধর্মী ও সমান্তরাল।)

যে সব দেশে ইসলামী পার্টি গঠনের মধ্য দিয়ে রাষ্ট্রক্ষমতা গ্রহণের চেষ্টা হয়েছে তার কোথাও রাজনৈতিক ইসলাম ভালো কিছু করতে পারেনি। ইরান হয়তো ব্যতিক্রম। সুদান ইসলামী দেশ। আলজিরিয়া ইসলামী গ্রুপ ও সেনাবাহিনীর লড়াইয়ে দ্বিখণ্ডিত। আফগানিস্তান বিচিত্রমুখি প্রতিক্রিয়াশীল শক্তির প্রচণ্ড দাঙ্গাহাঙ্গামার মধ্যে উতলাচ্ছে। এসব দেশের কোনোটিই আরো দরিদ্র ও আন্তর্জাতিক অঙ্গনে আরো নিঃসঙ্গ হওয়া ছাড়া আর কিছুই অর্জন করতে পারেনি। পশ্চিমে ইসলামী বিপদের জ্ঞানভাষ্যের তলে তলে কেবল এই সত্য আছে যে, মুসলমানদের প্রতি ইসলামের আবেদনে মধ্যপ্রাচ্যের এখানে সেখানে *প্যাক্স-আমেরিকানা-ইসরাইলিকা* প্রতিরোধের আগুনে তেল পড়ছে (এরিখ হবসবম এই প্রতিরোধকে বলেছেন আদিম, প্রাক-শিল্পযুগের বিদ্রোহ)। কিন্তু হিজবুল্লাহ বা হামাসের তৎপরতা ইসরাইলের কাজকর্মে (যা 'শান্তি-প্রক্রিয়া' ছাড়া আর যে কোনো কিছু হতে পারে, তাতে) কোনো গুরুত্বপূর্ণ বাধা হয়েও দাঁড়াতে পারেনি। আমি মনে করি অধিকাংশ আরব আজ পশ্চিমের বিরুদ্ধে কোনো বড়োসড়ো আন্দোলনে সমর্থন দিতে অক্ষম। কারণ এরা এখন খুব বেশি হতাশ ও অপমানিত। রুক্ষ একনায়ক শাসন, নিজেদের অযোগ্যতা ও সামগ্রিক অনিশ্চয়তার কারণে সাড়া নাই ওদের চেতনায়। এ ছাড়া, অভিজাতরা বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই শাসক পক্ষের সহযোগী, সামরিক শাসনের সমর্থক—যেমন মিশরে ১৯৪৬ সাল থেকে চলছে; আরো নানা ধরনের 'বাড়তি আইনী' ব্যবস্থা নেয়া হচ্ছে 'চরমপন্থীদের' বিরুদ্ধে। তাহলে, ইসলাম সম্পর্কিত অধিকাংশ আলোচনায় কেন সতর্কতা ও ভয়ের প্রসঙ্গ আসে? অবশ্য আত্মঘাতী বোমা-বিস্ফোরণ অব্যাহত আছে, সন্ত্রাসী কার্যক্রমও চলছে। কিন্তু এসব তৎপরতা কি এখন পর্যন্ত ইসরাইল, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং ঐসব মুসলিম দেশে মার্কিন-মদদপুষ্ট প্রশাসকদের শক্তিশালী করা ছাড়া আর কিছু করতে পেরেছে?

কোনো ইসলামী দেশকে আঘাত করা, গ্রাস করা, বাধ্য করা, পদানত করা এবং মার্কিন-ইসরাইল আধিপত্যের বিরুদ্ধে যে কোনো মুসলিম প্রতিরোধ গুঁড়িয়ে দেয়ার জন্য একটা বাড়তি অস্ত্রে সজ্জিত মিলারদের বইগুলো— এ অর্থে এগুলো পূর্বলক্ষণের মত। উপরন্তু, ইসলাম-বিরোধী তৎপরতার পশ্চিম অথবা ইসরাইলের সাথে ইসলাম ও আরবের সমানে সমানে আলোচনার পথ বন্ধ হয়ে গেছে। কারণ, কৌশলগতভাবে গুরুত্বপূর্ণ ও তেলসমৃদ্ধ একটি অঞ্চলের সাথে জড়িয়ে ইসলামিজমের ব্যাপারে আগেই গোপনে গ্রহণ করে নেয়া হয়েছে একটি অদম্য, একরোখা নীতি। ইসলাম আধুনিকতার ওপর ক্রুদ্ধ—এই অভিযোগে গোটা একটা সংস্কৃতিকে অমানবীয় ও দৈত্যসুলভ করে

www.pathagar.com

দেখানোর অর্থ হলো মুসলমানদেরকে চিকিৎসা ও শাস্তির বিষয়ে পরিণত করা। এখানে ভুল বুঝাবুঝির সুযোগ রাখতে চাই না: আমি বলছি ইসলাম কিংবা খ্রিস্টানিটি বা ইহুদি ধর্মকে অধঃগতির রাজনীতির স্বার্থে ব্যবহার বিপর্যয়কর খারাপ এবং তা রুখতে হবে : সৌদী আরব, পশ্চিম তীর, গাজা, পাকিস্তান, সুদান, আলজিরিয়া বা তিউনিসিয়ায় নয় কেবল, ইসরাইলে ও লেবাননের ডানপন্থী খ্রিস্টানদের মধ্যেও— যেখানে ধর্মতাত্ত্বিক রাজনৈতিক প্রবণতা দেখা দেয় সেখানেই (অবশ্য মিলার লেবাননের ডানপন্থী খ্রিস্টানদের ব্যাপারে অনাকাঙ্ক্ষিতরকম সহানুভূতিশীল)। এবং আমি এও বিশ্বাস করি না যে, আরবদের যা কিছু বদ তৎপরতা তার কারণ কেবল ইহুদিবাদ ও সাম্রাজ্যবাদ। তবে এর অর্থ এই নয় যে, ইসরাইল ও আমেরিকা এবং তাদের বুদ্ধিবৃত্তিক অস্ত্রগুলো 'ইসলাম' নামের বিমূর্ত ধারণাটির ওপর কলঙ্কজনক ও বিদ্বেষ-উৎপাদক কালিমা পুরু করে লেপে দেয়নি। এর উদ্দেশ্য ইউরোপীয় ও আমেরিকানদের মধ্যে ইসলামের বিরুদ্ধে ক্রোধ ও ভীতি জাগিয়ে তোলা। অথচ ঐ ইউরোপীয় ও আমেরিকানরাও ইসরাইলে অসম্প্রদায়িক ও উদারনৈতিক গণতন্ত্র দেখতে আগ্রহী। বইয়ের শেষে মিলার মন্তব্য করেন ইসরাইলে ডানপন্থী ইহুদিবাদের আলোচনা আরেকটি স্বতন্ত্র বইয়ের কাজ। আসলে তিনি যে বইটি লিখেছেন ইহুদিবাদ সেখানেই আলোচিত হওয়া উচিত। কিন্তু ইসলামের পেছনে ভালোভাবে লাগার জন্যই তিনি ইহুদিবাদকে আলাদা আলোচনার বিষয় বলে মত প্রকাশ করেন।

অন্য কোনো ধর্ম বা পৃথিবীর কোনো অঞ্চল সম্পর্কে লেখার ক্ষেত্রে মিলারের যোগ্যতা অত্যন্ত হতাশাব্যঞ্জক প্রমাণিত হবে। বিভিন্ন উপলক্ষে মিলার আমাদের জানিয়েছেন যে, তিনি গত পঁচিশ বছর ধরে পেশাগতভাবে মধ্যপ্রাচ্যের সাথে জড়িত। অথচ আরবী বা ফারসি কোনোটার ব্যাপারেই তার জ্ঞান নাই। তিনি নিজেই স্বীকার করেছেন সবখানে একজন দোভাষী নিয়ে যেতে হয় তাকে, দোভাষীর দক্ষতা ও বিশ্বস্ততা যাচাইয়েরও উপায় নেই। প্রয়োজনীয় ভাষাজ্ঞান ছাড়া রাশিয়া, ফ্রান্স, জার্মানি, লাতিন আমেরিকা, এমনকি চায়না ও জাপান বিষয়ে কোনো রিপোর্টার বা বিশেষজ্ঞকে গুরুত্বপূর্ণ মনে করা সম্ভব নয়। অথচ 'ইসলাম'-এর ক্ষেত্রে কোনো ভাষাজ্ঞানের প্রয়োজন নেই যেন। কারণ এক্ষেত্রে (রিপোর্টার বা বিশেষজ্ঞকে) কাজ করতে হয় একটি 'মনস্তাত্ত্বিক বিকৃতি' সম্পর্কে, প্রকৃত সংস্কৃতি বা ধর্ম নিয়ে নয়।

ফুটনোটে মিলার যে সব উৎস উল্লেখ করেছেন তার বেশিরভাগই নিজের অজ্ঞতার দোষে রঞ্জিত। এর কারণ সম্ভবত তিনি কেবল সেই সব উৎসই ব্যবহার করতে পেরেছেন যেগুলো ইংরেজীতে পড়ার সুযোগ পেয়েছেন, অথবা, কেবল সেই সব উৎস যেগুলো তার মতের সমর্থক। মুসলিম, আরব, অ-প্রাচ্যতাত্ত্বিক পণ্ডিতদের লেখাজোখার গোটা একটা লাইব্রেরী তার হাতের মুঠোয়। অথচ যখনই তিনি দুইএকটা আরব প্রবাদ ব্যবহার করে আমাদেরকে তার গুরুত্ব বুঝাতে চেয়েছেন তখনই অব্যর্থভাবে ভুল করেছেন। ওগুলো সবই সাধারণ বাকধারা/বাকবিধি, দুর্বোধ্য কিছু না। তার ভুলও কোনোমতেই ভাষান্তরের ভুল নয়; সে ব্যাপারে আগেভাগে গ্রন্থের

www.pathagar.com

শুরুতেই মাপ চেয়ে নিয়েছেন তিনি। ওগুলো কাঁচা, মোটাদাগের ভুল; যে বিদেশী লেখক নিজের লেখার বিষয় সম্পর্কে কোনো শ্রদ্ধাবোধ পোষণ করে না ও যত্ন নেয় না এমন বিদেশীর পক্ষেই এ ধরনের ভুল করা সম্ভব। অথচ মিলারের বিষয় (মধ্যপ্রাচ্য) গত পঁচিশ বছর ধরে তার রুটি-রুজি সরবরাহ করেছে বিধায় তার উচিত ছিলো এ সম্পর্কে প্রয়োজনীয় যোগ্যতা অর্জনের কষ্টটুকু স্বীকার করা। ২১১ নম্বর পৃষ্ঠায় তিনি গাদ্দাফী সম্পর্কে সাদাতের উক্তি *আল ওয়ালিদ মাজনুন*-এর অর্থ করেছেন 'ঐ পাগলা ছেলেটা" (দ্যাট ক্রেজী বয়)। আসলে উক্তিটি হলো 'ছেলেটা পাগলা'-এ জাতীয় কথার প্রতি উপহাস (আল ওয়ালাদ আল মজনুন)। আর তিনি এটাকেই আসল বলে ধরে নিয়েছেন। জনপ্রিয় মিশরীয় অভিনেত্রী 'শাদিয়া'কে লিখেছেন 'শা'আদিয়া', যা ইঙ্গিত করে আরবী বর্ণমালার পার্থক্য সম্পর্কেও জ্ঞান নাই তার। আরবী শব্দ ইংজেীতে বহুবচন হিসেবে লেখার প্রবল অভ্যাস তার (যেমন- 'থোব'কে থোবস, হানিফকে হানিফস)। অথচ এই মিলারই ৩১৫ নম্বর পৃষ্ঠায় বিস্ময়কর ধৃষ্টতার সাথে লিখেছেন "চমৎকার একটি আরবী কবিতা... যেমন অধিকাংশ আরবী কবিতাই... অনুবাদের সময় খুব মার খেয়ে যায়।"

আরব ইসলামী জীবনের খুঁটিনাটি বিষয়গুলো সম্পর্কে মিলারের জানার চেষ্টা যদি এমন ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়, তাহলে তার দ্বারা পরিবেশিত রাজনৈতিক ও ঐতিহাসিক তথ্যগুলোর অবস্থা কি হতে পারে? তার বইয়ে (মিশর, সৌদি আরব, সুদান প্রভৃতি) দশটা দেশের প্রতিটি নিয়ে লিখিত এক একটি অধ্যায় শুরু হয়েছে একটি ক্ষুদ্র কাহিনী উল্লেখের মধ্য দিয়ে। এরপরই আছে দেশটির ওপর আন্ডার-গ্র্যাজুয়েট স্তরের টবে-ফলানো ইতিহাস। প্রায়শ নির্ভর-অযোগ্য, বিভিন্ন লেখক থেকে নিয়ে জোড়াতালি দেয়া সে ইতিহাসের উদ্দেশ্য বিষয়টির ওপর তার কর্তৃত্ব প্রদর্শন; যদিও আসলে তাতে ফুটে উঠেছে দুঃখজনক হামবড়া ভাব এবং বোঝার ও বিশ্লেষণের ব্যর্থতা। যেমন তিনি উল্লেখ করেন সৌদী আরব অধ্যায়ে মোহাম্মদ সম্পর্কে তথ্যের প্রিয় উৎস হচ্ছে প্রাচ্যতাত্ত্বিক ম্যাক্সিম রডিনসন। রডিনসন দুর্ধর্ষ মার্কিস্ট পণ্ডিত। তার লেখা মোহাম্মদের জীবনী যাজক-বিরোধী বিদ্রুপবাণ আর সমৃদ্ধ পাণ্ডিত্যের সংমিশ্রণ। মোহাম্মদ ও তার ভাবধারা সম্পর্কিত চার-পাঁচ পৃষ্ঠার সংক্ষিপ্ত আলোচনায় রডিনসন থেকে যা নিয়েছেন মিলার তা হচ্ছে মোহাম্মদ অবজ্ঞা করার মতো ব্যক্তি যদি নাও হন, সহজাতভাবেই হাস্যকর, শার্লেম্যান ও যিশুখ্রিস্টের মিশ্রণ। রডিনসন জানেন তার কথার অর্থ কি। কিন্তু মিলার আমাদেরকে (অপ্রাসঙ্গিকভাবে) বলেন, (এ বক্তব্যে) তিনি সন্তুষ্ট নন। তার কাছে মোহাম্মদ ইহুদি-বিরোধী একটি ধর্মের স্রষ্টা, যে ধর্মের সাথে বাঁধা সন্ত্রাস ও মনোবিকৃতি। কোনো মুসলিম লেখকের লেখা থেকে কিছু গ্রহণ করেননি মিলার, নির্ভর করেছেন বদহজমের শিকার প্রাচ্যতাত্ত্বিকদের বাগাড়ম্বরে। কিন্তু এমন কথা কি কল্পনা করা যায় যে, ইউরোপে বা আমেরিকায় যিশু বা মুসা সম্পর্কিত লেখা গ্রন্থে ইহুদি বিশেষজ্ঞ বা খ্রিস্টান পণ্ডিতের কারো গ্রন্থ থেকে কোনো তথ্য ব্যবহার করা হয়নি! "জানা যায় মক্কা বিজয়ের পর মোহাম্মদ কেবল দশজন

www.pathagar.com

লোককে হত্যা করেছিলেন, ইসলাম ও তার সম্পর্কে অপমানজনক কথা বলায়", ব্যঙ্গ করার জন্য কৃত্রিম আফসোসের সাথে লিখেন তিনি। মোহাম্মদের ওপর তার যথাযথ মনোযোগের প্রমাণ দেয়ার জন্য তিনি উল্লেখ করেন যে, মোহাম্মদ একটি রাষ্ট্র ও একটি ধর্মের প্রতিষ্ঠাতা (এই পর্যবেক্ষণ কোনোভাবেই আসল হতে পারে না)। এরপরই তিনি সাত শতক থেকে লাফ দিয়ে চলে আসেন. মোটামুটি হিসেবে, বর্তমানকালে; যেন দূর অতীতে একটি রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠাতা বর্তমানের ইতিহাস রচনায় সবচেয়ে ভালো উৎস। সেই লুইসের কৌশলই।

এ অবস্থায় কারো পক্ষে ভুলে থাকা সম্ভব নয় যে, মিলার নির্দিষ্ট প্রবণতা ও রাজনৈতিক উদ্দেশ্য-তাড়িত একজন রিপোর্টার মাত্র, পণ্ডিত বা বিশেষজ্ঞ কিংবা কোনো লেখকও নন; তার অধিকাংশ বই-ই বিশ্বাস-যোগ্যতাহীন, আত্মগত মুসলিম ব্যক্তিত্বের সাথে বিরক্তিকর দীর্ঘ সাক্ষাতকার ও কিছু সমালোচনার সংগ্রহ। ওগুলোয় যৌক্তিক বিশ্লেষণ বা নিজস্ব ধারণা অনুপস্থিত। তার ইতিহাস বর্ণনা শেষ হওয়ার পরপরই আমরা টান খেয়ে চলে যাই বিরক্তিব্যঞ্জক, অসংগঠিত গোলকধাঁধা বর্ণনায়, যা স্থানটি সম্পর্কে তার প্রকৃত জ্ঞানের অভাবই প্রকটিত করে। অর্থহীন সাধারণীকরণেরই প্রতিধ্বনি করে এমন একটি বাক্য : "এবং নিজেদের বিশৃঙ্খল ইতিহাস মনে রেখে সিরীয়রা (*পৃথিবীতে কোন দেশটির ইতিহাসই বা তা নয়?- সাঈদ*) নৈরাজ্য বা আরেকটা দীর্ঘ রক্তক্ষয়ী ক্ষমতা-সংঘাতে ফিরে যাওয়ার মধ্যে সম্ভাবনা দেখে (*এটি কেবল দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর, উপনিবেশ-উত্তর সিরিয়ার ক্ষেত্রেই সত্যি, নাকি এশিয়া, আফ্রিকা ও লাতিন আমেরিকার আরো শ'খানেক দেশের প্রসঙ্গেও?*)—এমনকি সবচেয়ে অসাম্প্রদায়িক রাষ্ট্রটিতে, জঙ্গী ইসলামেও— যা সতর্কবাণীর মতো।"

বমি-উদ্রেককর ভাষারীতি ও দাঁতভাঙ্গা টেকনিক্যাল পরিভাষার কথা না হয় বাদ থাকলো। এখানে বিশেষ কোনো ধারণা পাওয়া যাচ্ছে না। আছে কতগুলো জীর্ণ উক্তি ও যাচাই করার অযোগ্য ঘোষণার মিশ্রণ। তা যতটা মিলারের চিন্তার পরিচয় দেয়, তারচেয়ে বেশি 'সিরীয়দের' 'চিন্তা'র।

মিলার তার কাগজের মত পাতলা বর্ণনায় মাঝে মধ্যে 'আমার বন্ধু' কথাটি ব্যবহার করে অনাবশ্যক অলঙ্কার জুড়ে দেন; যাতে পাঠকরা মনে করে তার লেখার বিষয় অর্থাৎ ঐ অঞ্চলের মানুষ ও সংশিষ্ট ঘটনাবলী সম্পর্কে তার ভালো জানা আছে। যেন তিনি বিশ্বাস করেন যে, কেবল তিনিই তার বন্ধুর নিকট থেকে গোপন কিছু জেনে নিতে সক্ষম হয়েছেন। কিন্তু এ কৌশল অবান্তর বিষয়ে দীর্ঘ আলাপচারিতা সৃষ্টি করে মূল বিষয়টিতে গুরুতর বিকৃতির জন্ম দেয়, যা সাক্ষ্য দেয় ইসলামী মনের নিদিষ্ট একটা বিন্যাস আছে। যদিও এর ফলে আড়ালে পড়ে যায় অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ ইস্যু, যেমন- স্থানীয় রাজনীতি, অসাম্প্রদায়িক প্রতিষ্ঠানগুলোর তৎপরতা এবং ইসলামপন্থী ও জাতীয়তাবাদী রাজনীতিবিদদের মধ্যে চলমান সংঘাত। মোহাম্মদ আরকন, মোহাম্মদ আল-জাব্‌রি, জর্জ তারাবিশি, এডোনিস, হাসান হানাফি বা হিশাম দজায়েত— ইসলামী বিশ্বে প্রবল বিতর্ক সৃষ্টিকারী এইসব নাম যেন কখনো শুনেননি মিলার।

www.pathagar.com

জ্ঞান ও বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে চোখে পড়ার মত ব্যর্থতা ইসরাইল সম্পর্কিত অধ্যায়ে সবচেয়ে বেশি (ভুল শিরোনামের অধ্যায় এটি, কারণ, নামে ইসরাইল থাকলেও মূলত আলোচিত হয়েছে ফিলিস্তিন)। ওখানে তিনি ইনতিফাদার প্রভাবে বা দীর্ঘ তিনযুগের ইসরাইলী দখলদারিত্বের কারণে ঘটে যাওয়া অনুপুঙ্খ পরিবর্তনকে উপেক্ষা করেন। তেমনি অসলো চুক্তি বা ইয়াসির আরাফাতের এক-ব্যক্তির শাসনের মাধ্যমে সাধারণ ফিলিস্তিনীদের জীবনে ফলিয়ে তোলা ঘৃণার কথাও তার লেখায় নেই। এও কোনো ঘটনাক্রম নয় যে, মার্কিন নীতির সমর্থক হিসেবে মিলার হামাস সম্পর্কে বেশি সংবেদনশীল; ইসরাইলের দখলাধীন এলাকায় পরিস্থিতির এমন ভয়াবহ অবনতির সাথে হামাসের সম্পর্ক বুঝতেও তিনি পরিষ্কারভাবেই ব্যর্থ হয়েছেন। মিলার অবহেলাক্রমে এও উল্লেখ করতে ভুলে গেছেন যে, গাজার ইসলামী (হামাস) বিশ্ববিদ্যালয়ই একমাত্র ফিলিস্তিনী বিশ্ববিদ্যালয় যা ফিলিস্তিনী টাকায় প্রতিষ্ঠিত হয়নি, প্রতিষ্ঠিত হয়েছে ইসরাইলের দ্বারা— ইন্তিফাদার সময় পিএলও'র আন্দোলন দুর্বল করার জন্য। মোহাম্মদের বিরুদ্ধে তিনি অভিযোগ আনেন যে, মোহাম্মদ ইহুদিদের মধ্যে বিধ্বংসী আক্রমণ চালিয়েছিলেন। কিন্তু অ-ইহুদিদের জন্য ইসরাইলী বিশ্বাস, ভাষ্য ও আইন সম্পর্কে নীরব মিলার। ইহুদি ধর্মশাস্ত্রের অনুমোদনক্রমে খুন করা, বাস্তুচ্যুত করা, ঘরবাড়ি ভাঙ্গা, ভূমি দখল, এলাকা অন্তর্ভুক্তকরণ এবং—সর্বাধিক বিশ্বস্ত গাজা-বিশেষজ্ঞ সারা রয়-এর ভাষায়—অর্থনৈতিক বি-উন্নয়নের ব্যাপারে তার কোনো কথা নেই। এইসব ঘটনার কিছু এদিক সেদিক ছড়িয়ে ছিটিয়ে উল্লেখ করেন তিনি, কিন্তু এগুলোকে এক সুতোয় বেঁধে বিশ্লেষণ করে দেখান না যে, এরই পরিণতি হিসেবে মানুষের মনে ইসলামী আবেগ জেগে উঠছে। তার আরেকটা বদঅভ্যাস হলো সবার ধর্মীয় পরিচয় দেয়া: অমুক খ্রিস্টান, অমুক শিয়া মুসলমান বা ইহুদি ইত্যাদি। জীবনের এই বিশেষ দিকটি সম্পর্কে আগ্রহী মানুষ মিলার এ ক্ষেত্রেও সবসময় সঠিক তথ্য দিতে পারেনি, এমন কি মাঝে মধ্যে মজার মজার মজার ভুল কথাও বলেছেন। যেমন হিশাম শারাবির পরিচয় দিয়েছেন তার বন্ধু হিসেবে, অথচ বলেছেন শারাবি খ্রিষ্টান। শারাবি আসলে সুন্নী মুসলমান। বদর আল হাজকে বলা হয়েছে মুসলমান, যদিও তিনি মেরোনাইট খ্রিস্টান। এইসব ভুল এত বড় মনে হতো না যদি না তিনি আমাদের বিশ্বাস করানোর চেষ্টা করতেন যে, তিনি অনেক জানেন এবং ওখানে তার অনেক লোকের সাথে ঘনিষ্ঠতা। তবে এসবের মধ্যে সব থেকে খেয়াল করার মতো ব্যাপার হচ্ছে তার নিজের ধর্মীয় পটভূমি ও রাজনৈতিক প্রবণতা সম্পর্কে কিছুই উল্লেখ না করার মানসিকতা। তার নিজের বিশ্বাস আলোচ্য বিষয়টি ধর্মীয় ও মতবাদগত আবেগে ভেজা; অথচ এমন একটা বিষয় আলোচনায় তিনি যে তার নিজের ধর্মীয় পরিচয়কে অপ্রাসঙ্গিক মনে করেন, তা আমার কাছে কেমন অস্বাভাবিক লাগে (ধারণা করি তিনি মুসলিম বা হিন্দু নন)। কেউ কেউ এখন এমনও ভাবতে পারেন যে, মিলার যাদের নিকট থেকে তথ্য বের করে এনেছেন তাদের ক'জনই বা জানতো তিনি কে, এবং ক'জনই বা জানে মিলার তাদের সম্পর্কে এখন কি বলছেন!

www.pathagar.com

ক্ষমতাসীন ব্যক্তি ও নির্দিষ্ট কিছু ঘটনার ব্যাপারে প্রতিক্রিয়া জানাতে সদাপ্রস্তুত মিলার। যেমন জর্ডানের বাদশা হাসানের দেহে ক্যান্সার ধরা পড়ার খবর শুনে তিনি ব্যথাহত; তার যেন মনে ছিলো না হাসান একটি নিরাপত্তা রাষ্ট্র পরিচালনা করেন, যেখানে বহু লোক নির্যাতন, অন্যায় জেল-জুলুমের শিকার। লেবাননে একটি খ্রিস্টান চার্চ অপবিত্র করার সাক্ষ্য দেখে 'ক্রোধের আবেগের অশ্রুতে' তার দুইচোখ ভরে ওঠে। কিন্তু অপবিত্র করার অন্যান্য ঘটনা, যেমন ইসরাইলে মুসলমানদের গোরস্থান কিংবা সিরিয়া, লেবানন ও ফিলিস্তিনে শত শত গ্রাম ধ্বংসের কথা উল্লেখ করা দরকারী মনে হয়নি তার কাছে। মিলারের অন্তর্গত ঘৃণা ও তাচ্ছিল্য প্রকাশ পেয়েছে নিচের প্যারাটির মত অনেক প্যারায়; এখানে তিনি একটি মধ্যবিত্ত সিরীয় পরিবারের ওপর (নিজের) চিন্তা ও আকাঙ্ক্ষা চাপিয়ে দিয়েছেন, যে পরিবারের একটি মেয়ে কিছুদিন আগেই ইসলামপন্থী হয়ে গেছে; ঐ পরিবারের মহিলাটি না বুঝে মিলারকে তার বাড়িতে আমন্ত্রণ জানান :

> একটি সিরীয় মধ্যবিত্ত পরিবারের মা যা আকাঙ্ক্ষা করেন, তিনি আর কখনো তা চাইবেন না: বিয়ের বিরাট পার্টি এবং বিয়ের জন্য ডায়মন্ড টায়রা বসানো ঐতিহ্যবাহী শাদা পোষাক, সিলভার ফ্রেমে বাঁধাই ছবিতে টাকসিডো পরিহিত নববিবাহিত সুখী দম্পতি এবং কফি টেবিলে বিয়ের গাউন ও ফায়ার প্লেস মেন্টেল, রাতভর বেলি ড্যান্সারের দেহের মোচড় ও ভোরতক শ্যাম্পেনের উপচানো স্রোত—কিচ্ছু না। হয়তো নাদিনের বন্ধুদেরও মেয়ে বা ছেলে আছে যারা তাদের প্রত্যাখ্যান করেছে, গোপনে তাদের ঘৃণা করছে আসাদের নির্দয় প্রশাসনের আনুকূল্য লাভের উদ্দেশ্যে মেনে নেয়া আপোষরফার কারণে। দামেস্কের বুর্জোয়া সমাজের এইসব খুঁটিগুলো যদি ইসলামের শক্তির পদানত হয়, তা হলে, নিরাপদ আর কে?

মিলারের বইটি সম্পর্কে সবচেয়ে আগ্রহব্যঞ্জক প্রশ্ন হলো কেন তিনি এটি লিখলেন? মমতায় উদ্রিক্ত হয়ে নয় নিশ্চয়ই? দৃষ্টান্তস্বরূপ এই ক'টি বিষয় বিবেচনা করা যাক যে, মিলার নিজের স্বীকারোক্তি মতেই লেবাননকে ভয় করেন ও অপছন্দ করেন, সিরিয়াকে ঘৃণা ও লিবিয়াকে উপহাস করেন, সুদানকে বাতিল করে দেন, মিশরের জন্য কিছুটা আফসোস ও খানিকটা সতর্কতা বোধ করেন এবং সৌদী আরবের ব্যাপারে অনুভব করেন প্রবল বিকর্ষণ। ভাষাটা শেখার মতো কষ্টটুকুও তিনি স্বীকার করেন নাই, কেবল সংগঠিত জঙ্গী ইসলামীদের ব্যাপারেই অবিরাম লেগে আছেন; আমার অনুমান আশি কোটি মানুষের ইসলামী বিশ্বে ইসলামপন্থীদের সংখ্যা ৫%-এর নিচে। ইসলামপন্থীদেরকে হিংস্রভাবে দমন করায় সমর্থন আছে তার (আবার নির্যাতন ও অন্যান্য 'বেআইনী' কৌশলে সায় নেই; এখানে নিজের সংঘাতপূর্ণ অবস্থান তার বোধ এড়িয়ে গেছে); মিশর, জর্ডান, সিরিয়া, ও সৌদী আরবের মতো মার্কিন মদদপুষ্ট দেশসমূহে গণতন্ত্রের চর্চা ও আইনী প্রক্রিয়ার অনুপস্থিতি দংশন করে না তার বিবেককে, যদি এসবের লক্ষ্য হয় ইসলামপন্থীরা। এক জায়গায় দেখা যায় ইসরাইলী

www.pathagar.com

পুলিশ কর্তৃক একজন মুসলিম সন্ত্রাসীকে কারাগারে জিজ্ঞাসাবাদ করার সময় তিনি অংশগ্রহণ করেন। কারাগারে হাতকড়া পরা একটি লোককে নিজের কয়েকটি প্রশ্ন করতে গিয়ে তিনি সতর্ক থাকেন যাতে ইসরাইলী পুলিশ কর্তৃক সুপরিকল্পিত নির্যাতন ও অন্যান্য প্রশ্নযোগ্য পদ্ধতির (গোপন হত্যাকাণ্ড, মাঝরাতে গ্রেফতার করা, বাড়িঘর ধ্বংস করা) প্রসঙ্গ আলোচনায় এসে না পড়ে।

সাংবাদিক হিসেবে তার সবচেয়ে বড় ব্যর্থতা এখানে যে, তিনি কেবল ইসলামী বিশ্বের ঘৃণ্য জঙ্গী তৎপরতা সম্পর্কিত নিজস্ব মতবাদের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ বিষয়গুলোকে যুক্ত করার ও আলোচনায় আনার চেষ্টা করেছেন। আরব বিশ্ব যে বিশেষ এক ভয়াবহ অবস্থায় উপনীত, গত তিনযুগ ধরে এ সম্পর্কে প্রচুর বলা হয়েছে মুদ্রণ-প্রচার মাধ্যমে। কিন্তু এ পরিস্থিতির পেছনে ইসরাইল ও যুক্তরাষ্ট্রের ভূমিকার সঠিক চিত্রের সামান্যতমও আমাদেরকে দেখান না মিলার, তেমনি যুক্তরাষ্ট্রের দৃঢ় আরব-বিরোধী ও ইসলামী-বিরোধী নীতির কথাও কদাচ মনে করেন (যদিও মার্কিন নীতিতে আটকা-পড়া আফগানিস্তান অধ্যায়ের কথা সামান্য উল্লেখ করেন মাত্র)।

লেবাননের কথা ধরা যাক। ১৯৮২ সালে আততায়ীর হাতে নিহত বশির জামায়েল সম্পর্কে এমনভাবে কথা বলেন মিলার যাতে মনে হয় এই ভদ্রলোক জনপ্রিয় বিপুল ভোটে জয়ী হয়েছিলেন। তিনি পরোক্ষেও উল্লেখ করেন না যে, শাব্রা ও শাতিলা ক্যাম্পে গণহত্যার ঠিক আগে, ইসরাইলী আর্মি পশ্চিম বৈরুতে থাকাকালে বশির জামায়েলকে ক্ষমতায় আনা হয়। এবং উরি লুব্রানির মত ইসরাইলী উৎসের মতে তিনি লেবাননে মোসাডের লোক ছিলেন, বহু বছর ধরে। জামায়েল যে খুনী, স্বঘোষিত ডাকাত সে কথাও চেপে যান; তিনি বলেন না লেবাননের বর্তমান ক্ষমতা-কাঠামো এলি হোবেইকার মত লোকদের দ্বারা পূর্ণ, যে সরাসরি ক্যাম্প গণহত্যায় যুক্ত ছিলো। আরব এন্টি-সেমিটিজমের কথা উল্লেখ করার সময় ইসরাইলে আরব ও মুসলমানদের বিরুদ্ধে সক্রিয় জ্ঞানভাষ্যের (ডিসকোর্স) কথাও মনে পড়া উচিত ছিলো মিলারের। সাধারণ মানুষদের বিরুদ্ধে দীর্ঘ, অনড়, চৌকস প্রক্রিয়ার ইসরাইলী যুদ্ধ— যুদ্ধবন্দী রিফিউজী ক্যাম্পের বাসিন্দাদের ওপর হামলা, গ্রাম ধ্বংস করা, হাসপাতাল ও স্কুলে বোমা বর্ষণ, বেপরোয়াভাবে শত শত হাজার হাজার শরণার্থী সৃষ্টির কাহিনী চাপা পড়ে যায় তার বোকার মত দ্রুত বকবকানির নিচে। মিলারের গোড়ায় গলদ হলো সবচেয়ে বায়বীয় ডিকন্সট্রাকশানিষ্টের নিকটও যে-সব ঘটনা আলোচনার জন্য জরুরী বলে বোধ হয়, তাও তার কাছে তাচ্ছিল্যের বিষয়। তবে যুক্তরাষ্ট্রের সমর্থনপুষ্ট ইসরাইলের সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড যে মুসলমানদের উপযুক্ত পাওনা তার প্রমাণ সৃষ্টির জন্য সীমাহীন প্যাঁচাল উদ্ধৃত করার মধ্যেও অনেক কিছু বলা হয়ে যায়; এভাবেই বরং মূলধারার প্রচার মাধ্যমে মধ্যপ্রাচ্য সম্পর্কিত প্রতিবেদন রচনার সাম্প্রতিক প্রবণতার আদর্শ দৃষ্টান্ত হয়ে ওঠেন মিলার।

মিলারের বই পড়ে কারো পক্ষে বোঝা সম্ভব নয় মধ্যপ্রাচ্য ও ইসলামের তাফসির (ইন্টারপ্রিটেশন) ও প্রতিনিধিত্ব নিয়ে ইসলামের অভ্যন্তরেই কেমন টগবগে সংঘাত

www.pathagar.com

চলছে; আন্দাজ করা যায় না তিনি নিজে কতটা পক্ষপাতদুষ্ট, আরব জাতীয়তাবাদের শত্রু, যুক্তরাষ্ট্রের নীতির সমর্থক; যুক্তরাষ্ট্রের সমর্থক হওয়ার ব্যাপারটাতেই সুপ্ত রয়েছে অনেক কথার জবাব। তার বইয়ের বহু জায়গায় তিনি আরব জাতীয়তাবাদকে মৃত ঘোষণা করেন। এ বইয়ের পাঠক বুঝতে পারবেন না যে, অসলো চুক্তির মধ্যে কল্পিত—বলা যায় সুপরিকল্পিত—এবং পরিশোধিত, নিরীহ জাতীয়তাবাদের সাথে ফিলিস্তিনের যে-জাতীয়তাবাদ হুবহু মিলবে না তারই দৃঢ় শত্রু হয়ে ওঠেন মিলার। সংক্ষেপে মিলার হলেন অগভীর, চলতি মতান্ধ এক সাংবাদিক যার পাঁচ শতাধিক পৃষ্ঠার বিরাট গ্রন্থটি তার সমাপনী বক্তব্যের তুলনায় বেশ বড়ই মনে হয়। তবে প্রচার মাধ্যমে গৃহীত, অপরীক্ষিত ও অবিশেষিত বহু আন্দাজের মধ্যে থেকে যাওয়া গলদগুলোর সারসংক্ষেপও এ বইটি।

এগুলো কিভাবে দৈনন্দিন রিপোর্টিংকে প্রভাবিত করতে পারে তার নাট্যিক দৃষ্টান্ত সের্গেই শিমেমান ও রবার্ট ফিস্কের রেডিও সংলাপ। রবার্ট ফিস্ক লন্ডনের *ইন্ডিপেন্ডেন্টের* জন্য লিখেন, শিমেমান *নিউইয়র্ক টাইমসের* জেরুজালেমের ব্যুরো চীফ। এরা ১৯৯৬ সালের এপ্রিলে লেবাননে ইসরাইলী আগ্রাসনের ঘটনাটির রিপোর্ট করেন পরস্পর বিপরীত সীমান্তে থেকে। এ সত্ত্বেও তাদের রেডিও বিতর্কে ("ডেমোক্র্যাসী নাও", মে ৫, ১৯৯৬, প্যাসিফিক রেডিও) ফুটে ওঠে মৌলিকভাবে বৈপরীত্যময় দুই ধারার সাংবাদিকতার প্রবণতা। মার্কিন সাংবাদিক কথা বলেন (হয়তো অসচেতনভাবে) যে ধারায় তাতে মিলারের বক্তব্যই সঠিক প্রমাণিত হয়। প্রথম কথা হলো, ১৯৮২ সাল থেকে ইসরাইল দক্ষিণ লেবাননের এক ফালি জায়গা তথাকথিত সিকিউরিটি জোনের নামে দখল করে রেখেছে এবং ওখানে ভাড়াটে লেবানীজ আর্মির আস্তানা তৈরি করেছে। দখলদার সেনাবাহিনী এবং সাউথ লেবানীজ সৈন্যদের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ আসে হিজবুল্লা বা তথাকথিত আল্লাহর দলের তরফ থেকে, যাদের ক্ষোভের কারণ ইসরাইলী দখলদারিত্ব। এরা দক্ষিণ লেবাননে অবস্থান করেই যুদ্ধ করে। কাজেই প্রায় সকল মানদণ্ডে এদেরকে বড়জোর গেরিলা যোদ্ধা বলা যায়, যারা তাদের দেশে অনুপ্রবেশকারী অবৈধ দখলদারদের বিরুদ্ধে লড়ছে। দ্বিতীয় কথা হলো, যুক্তরাষ্ট্রের প্রচার মাধ্যমে হিজবুল্লাহর ধর্মীয় পরিচয়কে খুব তুলে ধরা হয়; ইসরাইলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করছে বলে ধরে নেয়া হয় হিজবুল্লাহ সন্ত্রাসী দল।

১৯৯৬ সালের এপ্রিলে *টাইম* রিপোর্ট করে যে, সাউথ লেবাননে ইসরাইল শেলিং করেছে এবং এর ফলে দুইজন সাধারণ মানুষ নিহত হয়েছেন। "জঙ্গী দলটি (অর্থাৎ হিজবুল্লাহ) জবাব দেয়ার ঘোষণা দিয়েছে"—এমন মন্তব্য করেন অজ্ঞাত রিপোর্টার এবং চালিয়ে যান, "গত মাসে দক্ষিণ লেবাননে ইসরাইলের দখলাধীন সীমান্ত এলাকায় গেরিলারা ছয় ইসরাইলী সৈন্য হত্যা করায় সীমান্তের দুই পাশেই চরম উত্তেজনা এখন"। স্বাভাবিকভাবে, দখলদার বাহিনীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার অধিকার আছে গেরিলাদের। অথচ এখানে প্রথমেই 'ইসলামী দল' পরিচয় দিয়ে সেই অধিকারের নীতি কলুষিত করার চেষ্টা করা হয়েছে। কারণ ইসলামী দল কথাটি শুনে

www.pathagar.com

পাঠকের মনে আসবে মৌলবাদের সাথে এর সংযোগ, ইসলামের হুমকি, ইত্যাদি। ১০ই এপ্রিল সাংবাদিকদের রিপোর্টে (*টাইমসের* ইসরাইলী প্রতিনিধি জুয়েল গ্রীনবার্গের সংবাদে) জায়গা করে নেয় "শিয়াদের কর্তৃত্বাধীন ইরান সরকারের মদদপুষ্ট" কথাটি। এবং দু সপ্তাহ পরে দখলাভিযান শেষ হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত এ কথাটি আর কোনো টাইম-রিপোর্ট থেকে বাদ পড়ে না। বুঝি, *টাইমস* চায় যেখানেই ইসরাইল জড়িত সেখানেই যেন জানা যায় যে, জঙ্গী (এবং অচিরেই হয়ে ওঠা 'সন্ত্রাসী') মুসলমানরাই দেশটির শত্রু, জবরদখলের বিরুদ্ধে যুদ্ধরত কোনো গেরিলা দল নয়।

এপ্রিলের ১২ তারিখে শিমেমান হিজবুল্লাহকে বলেন, "ইরানের মদদপুষ্ট, জঙ্গী শিয়া মুসলিম সংগঠন"। যেন তিনি বলতে চাচ্ছেন—দেখ! পাগল মুসলমানগুলো আবার শুরু করেছে, খুন করছে ইহুদিদেরকে। একই কাহিনীতে উল্লেখিত হয় কিরিয়াত শেমোনার ভীত-সন্ত্রস্ত ইহুদি বাসিন্দাদের কথাও। তখন বৈরুতে সারা শহর ভর্তি ভীত-সন্ত্রস্ত মানুষের ওপর ইসরাইলী বিমান বাহিনী বোমা বর্ষণ করছে; রিপোর্টে সে প্রসঙ্গ নেই। বাস্তব ঘটনাবলীর ওপর মতবাদের পরিষ্কার বিজয়ের মধ্য দিয়ে সে দিনের *টাইমসের* সম্পাদকীয়তে মন্তব্য করা হয় এ ঘটনা হচ্ছে 'সন্ত্রাসের প্রতি ইসরাইলের জবাব'; এবং বলা হয় "সন্ত্রাসী লক্ষ্যগুলোর ওপর ইসরাইলী বিমান আক্রমণ যথাযথ, বৈধ ও সীমিত... লেবাননের গতকালের আক্রমণসহ গত কয়েকদিনে সীমান্তের উভয় পারে হতাহতের দায়-দায়িত্ব সমানভাবে হিজবুল্লাহ সন্ত্রাসীদল এবং বৈরুত ও দামেস্কের সরকারের ওপর বর্তায়। এ ক্ষেত্রে পেরেজ কেবল ইসরাইলের আত্মরক্ষার অধিকার প্রয়োগ করেছেন।" এই মন্তব্য করা হয় এমন এক সময় যখন ইসরাইলী আর্মি দক্ষিণ লেবাননের দুই লক্ষ পরিবারকে ঘরছাড়া করছে। তার আগে স্থল, জল ও বিমান আক্রমণের মাধ্যমে গোটা এলাকা বিধ্বস্ত করা হয়েছে, এবং অঞ্চলটি তখনো ইসরাইলী আর্মির দখলে, যার অর্থ হলো যুদ্ধের আইন অনুযায়ী এ এলাকার বাসিন্দাদের অধিকার আছে দখলদারদের বিরুদ্ধে লড়বার। ছক উল্টে দেয়ার প্রথম কারণ ইসরাইল তার কৃতকর্মের জন্য প্রশ্নের সম্মুখীন, দ্বিতীয় কারণ-এখানে 'ইসলামের হুমকি' জড়িত। ১৮ই এপ্রিল ইসরাইল কানার একটি জাতিসংঘ স্পটের যুদ্ধ-শরণার্থীদের আশ্রয় ক্যাম্পে বোমা হামলা চালিয়ে শতাধিক নিরীহ মানুষকে হত্যা করে। *টাইমস* রিপোর্টে উল্লেখ করা হয় শিমন পেরেজ ও মার্কিন প্রেসিডেন্ট উভয়েই এই প্রাণহানিতে দুঃখিত। এ সত্ত্বেও তারা মনে করেন এসবের জন্য হিজবুল্লাহই দায়ী, কারণ ওরাই কোনো রকম উস্কানি ছাড়া ১৯৯৩ সালের চুক্তি ভঙ্গ করেছে (এপ্রিল ২১)। শুধু তাই নয়, ইসরাইলের লেবানন অভিযান চলাকালে *টাইমস* এমন একটাও উপ-সম্পাদকীয় বা সম্পাদকীয় ছাপেনি যা যুক্তরাষ্ট্র বা ইসরাইল সরকার থেকে ভিন্ন মতের পরিপোষক। সবচেয়ে বড় কথা, তাদের কাছে দুর্ভাগা লেবানন বা হিজবুল্লাহর চেয়ে বেশি গুরুত্ব ইরান ও সিরিয়ার। যেন দক্ষিণ লেবাননে যা ঘটছে তা দখলাভিযান ও প্রতিরোধের যুদ্ধ নয়, মহৎ ও মনোমুগ্ধকর কোনো ব্যাপার। আসলে এ হচ্ছে আবার সেই 'ইসলামের বিরুদ্ধে পশ্চিম'!

www.pathagar.com

প্রতিবেদন রচনা ও দৈনন্দিন রিপোর্টিং-এ তথ্য-বিকৃতির কথা উল্লেখ করেছেন রবার্ট ফিস্ক। লেবাননে কি হচ্ছে সে সম্পর্কে ইসরাইলী ও যুক্তরাষ্ট্রের কর্মকর্তারা পৃথিবীর মানুষদেরকে কি বোঝাতে চেয়েছেন তা আলোচনা করেননি ফিস্ক; তার লক্ষ্য ছিলো প্রকৃত ঘটনাবলীর বিবরণ তুলে ধরা। তিনি নীতি উল্টে দেখানোর চেষ্টা করেননি যে দখলাভিযানের বিরুদ্ধে যুদ্ধের অধিকার আছে গেরিলাদের; আবার এ ঘটনাকে পশ্চিম ও ইরান-সমর্থিত সন্ত্রাসী মুসলমানদের সংঘাত হিসেবে বর্ণনার কৌশলেও ধরা পড়েননি। ফলে তার পক্ষে সম্ভব হয় কানার ঘটনাটিকে ঠিকভাবে ব্যাখ্যা করার: ১৯৯৩ সালের যুদ্ধ-বিরতি চুক্তির পর থেকেই ইসরাইল পরিকল্পিত ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে বিশটি ঘটনা উস্কে দেয়, যার ফলে হিজবুল্লাহকে প্রকাশ্যে নিয়ে আসা সম্ভব হয়। উদ্দেশ্য ছিলো প্রচণ্ড শক্তি নিয়ে হিজবুল্লাহকে তীব্র আক্রমণ করে সিরিয়া ও লেবাননের ওপর চাপ সৃষ্টি। এ কথাই বলেন ফিস্ক শিমেমানকে। মনে রাখা দরকার *টাইমসের* সম্পাদকীয় পাতার নীতির প্রতি শিমেমানের ক্রীতদাসসুলভ বিশ্বাসযোগ্যতা ও রবার্ট ফিস্কের বিচক্ষণ *ইনডিপেন্ডেন্ট* নীতি প্রবল বৈপরীত্যময়। রেডিওর অনুষ্ঠানে সাক্ষাৎকার গ্রহণকারী লোকটি শিমেমানকে জিজ্ঞেস করেন, "আপনি লিখেছেন লেবাননে নির্বাচিত লক্ষ্যসমূহে সীমিত শক্তি প্রয়োগ করেছে ইসরাইল। আপনি কোনো সমালোচনা ছাড়াই উল্লেখ করেছেন যে, ইসরাইলী কর্মকর্তারা বলছেন তাদের গোলন্দাজরা জানতো না কানা ক্যাম্পে শরণার্থীরা বাস করে। আপনি যেন এ কথা বোঝাতে উদগ্রীব যে ইসরাইলীরা সাধারণ মানুষদের লক্ষ্যবস্তু করেনি; রবার্ট ফিস্কের বর্ণনা কিন্তু সম্পূর্ণ ভিন্ন কথা বলে।"

এ পর্যায়ে ফিস্ক তিনটি প্রমাণ তুলে ধরেন যাতে মনে হয় অনিচ্ছাকৃতভাবে সাধারণ লেবানীজদের মেরেছে বলে যে দাবী করছে ইসরাইলীরা তা আসলে মিথ্যা। এগুলো *ইন্ডিপেন্ডেন্টে* প্রকাশিত তার ১৯ ও ২২ তারিখের রিপোর্টের ভিত্তি হয়ে দাঁড়ায়। এর আগে ১৫ তারিখে তিনি দক্ষিণ লেবানন থেকে পাঠান "এটি কেবল সামরিক অপারেশন নয়; এ হলো একটা দেশকে গুঁড়িয়ে ফেলার প্রচেষ্টা" শিরোনামে বিশাল এক রিপোর্ট। যে তিনটি প্রমাণ ফিস্ক তুলে ধরেন সেগুলো হচ্ছে: ১) কানা আক্রমণের উনিশ ঘন্টা আগে জাতিসংঘের পক্ষ থেকে ইসরাইলী সেনাবাহিনীকে জানানো হয় সকল জাতিসংঘ কেন্দ্রে শরণার্থীরা আশ্রয় নিয়েছে; ২) বোমা বর্ষণের সময় পাইলটবিহীন একটি ইসরাইলী উড়োজাহাজ ওপরে স্থির হয়ে ছিলো; ৩) দক্ষিণ লেবাননের নাকুরা জাতিসংঘ কার্যালয় থেকে "হামলা বন্ধের আবেদন জানানোর" পরও কেন আক্রমণ এতো দীর্ঘস্থায়ী হলো? অথচ ইসরাইলী বাহিনীর রয়েছে অত্যন্ত উন্নত প্রকৌশলগত নিখুঁত জ্ঞান ও বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি। শিমেমান প্রতিক্রিয়া জানিয়ে বলেন, "তিনি বুঝতে পারেন না কেন ইসরাইলী বাহিনী ইচ্ছাকৃতভাবে সাধারণ মানুষদের আঘাত করে"। তার এ অভিমত হয়তো আন্তরিক, তবু এর মধ্যে মার্কিন প্রচার মাধ্যমের এমন একটা মনোভঙ্গি প্রকাশ পাচ্ছে যে, মুসলমান সন্ত্রাসীরা ইচ্ছাকৃতভাবে নিরপরাধ মানুষের ওপর সন্ত্রাস চালাতে পারে, কিন্তু ইসরাইল

www.pathagar.com

জেনেশুনে এমন কাজ করতে পারে না। ফিস্ক শিমেমানের এ বক্তব্যের সাথে একমত হয়েছেন যে, তিনি (শিমেমান) দক্ষিণ লেবাননের পরিবর্তে ইসরাইলে থেকে রিপোর্ট করছিলেন ওখানে কি ঘটছে সে সম্পর্কে, তেমনি নিজের মতামতও সযত্নে সরিয়ে রাখছিলেন তার রিপোর্ট থেকে : "একজন কলামিস্টের কাজ আর রিপোর্টারের কাজ এক নয়"। যথেষ্ট নিরপেক্ষ কথা বটে। এরপরও প্রশ্ন থাকে : রিপোর্টারের পরিকাঠামো কি? কোন ভাষ্যের সাথে তিনি কোন ঘটনাকে মেলাবেন? ফিস্কের কাজের পটভূমি ছিলো পররাষ্ট্রমন্ত্রী এহুদ বারাকের এই মন্তব্য (জানুয়ারী ৩, ১৯৯৬) যে, আবার যদি হিজবুল্লাহর আক্রমণ হয়, আর প্রতিক্রিয়া হিসেবে "যদি ইসরাইল আক্রমণ করে তা হলে আঘাত হানা হবে লেবাননের ওপর, শিকার হবে লেবাননের মানুষ"।

অল্প কথায়, হিজবুল্লাহ যে ইরানের মদদপুষ্ট জঙ্গী শিয়া সন্ত্রাসী দল এ ধারণা প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর ইসলাম সম্পর্কে স্পষ্ট অভিব্যক্ত অন্যান্য ধারণা সক্রিয় হয়ে ওঠে। যেমন- ইসলাম আধুনিকতার ওপর ক্রুদ্ধ, অকারণ হিংস্রতায় আসক্ত, ইত্যাদি। এগুলো প্রমাণ করে লেবানন দখলাভিযানের সময় ইসরাইলের সুচিন্তিত মনোভাব ছিলো এই যে, যা ঘটেছে তা মোটামুটি প্রাপ্য ছিলো লেবানীজ গেরিলাদের। (সিএনএন-এর অনুষ্ঠান এবং *নিউইয়র্ক টাইমসের* সম্পাদকীয়তে জুডিথ মিলার পুনরায় উল্লেখ করেন তার মতে হিজবুলাহ একটি সন্ত্রাসী সংগঠন)। মিলার একবার বলেই ফেলেন গেরিলারা দক্ষিণ লেবাননের নয়; এসেছে বাক্কা থেকে ("আমি জানি, ওখানে ছিলাম আমি"), তাই ঠাণ্ডা মাথায় মহিলা ও শিশুদেরকেও এক লাইনে দাঁড় করিয়ে গুলি করতে পেরেছে, যাতে মনে করা হয় ইসরাইলীরা খুনী। *দি ন্যাশন*-এর মে ২০, ১৯৯৬ সংখ্যায় আলেকজান্ডার ককবার্ন লেবানীজ অভিযান সম্পর্কে প্রচার মাধ্যমের পরিবেশনের ওপর "ইসরাইলী ঝটিকা অভিযান" শিরোনামে উপস্থিত করেন আরেক দফা বিশ্লেষণ।

বাস্তব ও ঐতিহাসিক পটভূমি বর্জিত এসব মতামত পাঠককে বলে ইসলাম হিংস্র ও যুক্তিবিরহিত এমন এক ধর্ম যা মানুষকে ইসরাইলের বিরুদ্ধে আগ্রাসন চালাতে বাধ্য করে। এগুলো কার্যত দূষিত করে ঐ সব রিপোর্ট যা সরেজমিনে লেখা হয়; এ সম্পর্কে যে আরো মানবিক ও বোধগম্য পটভূমি থাকতে পারে সে সম্ভাবনাও অস্বীকার করে। গেরিলাদেরকে "ইরানের সমর্থনপুষ্ট শিয়া জঙ্গী" বলার মধ্য দিয়ে প্রতিরোধ আন্দোলনকে অবৈধ ও মানবিকতা-বিচ্ছিন্ন করা হয়। এপ্রিলের ২৮ তারিখে প্রকাশিত কলামে শিমেমান ইসরাইলী অভিযানের শেষ পর্যায়টির লক্ষ্য বুঝতে ব্যর্থ, যা তার কাছে শুধুই "মধ্যপ্রাচ্যে হতবুদ্ধিকর শেষ খেলা"। তবু তার মনে হয় একটু ব্যতিক্রম আছে : "কারণ এ হচ্ছে মধ্যপ্রাচ্য—এ রকম প্রবাদ আছে, সাধারণ যুক্তির অতীত ঘটনা ব্যখ্যার জন্য সৃষ্ট একগুচ্ছ ক্ষুদ্র কাহিনীর ঐতিহ্যে। আকারে-বিন্যাসে যদি মেধার ছাপ চিহ্নিত করতেই হয়, তাহলে তার সবটাই আছে শেষের সপ্তাহে।"

ইসলামকে তুলে ধরার ক্ষেত্রে ভুল প্রতিনিধিত্ব ও বিকৃতি এখন উদাসীন; তা জানতে বা শুনতে চায় না যে, এ সম্পর্কে (ইসলাম বিষয়ে) প্রকৃত পক্ষে কি শোনার বা জানার

www.pathagar.com

আছে। এগুলো ইসলাম সম্পর্কে সোজাসাপ্টা বা বিবেচনাপূর্ণ মতামত নয়। পশ্চিমা সংবাদ ভোক্তাদের কাছে পরিবেশিত এই চিত্র ও তার পরিবেশন-প্রক্রিয়া শত্রুতা ও অজ্ঞতাকে আরো স্থায়ী করে। এর কারণগুলো চমৎকারভাবে ব্যখ্যা করেছেন নোয়াম চমস্কি তার একগুচ্ছ গ্রন্থে (বিশেষত, এডওয়ার্ড এস. হারম্যানের সাথে *ম্যানুফেকচারিং কনসেন্ট* ও *দি কালচার অব টেরোরিজম* এবং *ডেটারিং ডেমোক্র্যাসি*-তে)। তবু এ পরিস্থিতির সাথে যে উদ্দেশ্য জড়িয়ে আছে, তা ১৯৮০ সালে *কাভারিং ইসলাম* প্রকাশিত হওয়ার পর থেকে এ যাবত আরো খারাপ হয়েছে, যা আমি উল্লেখ করেছি শুরুতে। বাস্তব এই যে, এ সম্পর্কে পারস্পরিক আলাপ-আলোচনা ও আদান-প্রদান যতটুকু হয়েছে তার সবই ঘটেছে পণ্ডিতি বিতর্কে, শিল্পিত কাজকর্মে, ব্যবসা ইত্যাদি কাজকর্মে জড়িত সাধারণ মানুষের মধ্যে, যারা পরস্পর তর্ক-বিতর্ক করে, প্রত্যাখ্যান/গ্রহণ করে। তার অতি সামান্যই বৃহত্তর জনপর্যায়ে প্রভাব ফেলতে পেরেছে, যে জগৎ আবার গণমাধ্যম কর্তৃক খুবই প্রভাবিত। সংবেদনশীলতাবাদ, কাঁচা অজানা-ভীতি, অসংবেদনশীল মারমুখি ভাব—এগুলোই আজকের রীতি। যার পরিণতি উভয় দিকেই 'আমরা' ও 'ওরা' কল্পিত বিভাজন। অথচ এ অবস্থা নৈতিকতার জন্য মারাত্মক ক্ষতিকর। আমি আশা করছি এ বইটির মত সংযত-বিনম্র প্রচেষ্টার সমাহার বর্ণিত পরিস্থিতিতে প্রতিষেধক হিসেবে কাজ করবে, আঙ্গুল তুলে চেনাবে কোনটা ভুল, তেমনি, দেখিয়ে দেবে সচেতনতা সৃষ্টি ও অবিরাম বিভিন্ন উপায় খোঁজার মধ্য দিয়ে কিভাবে খাটো করে আনা যাবে এ বিশাল ও পুঞ্জিভূত নেতিবাচক প্রভাব।

ই. ডব্লিউ. এস.
অক্টোবর ৩১, ১৯৯৬
নিউইয়র্ক।

www.pathagar.com

ভূমিকা

পশ্চিম—ফ্রান্স, বৃটেন ও বিশেষ করে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সাথে ইসলাম, আরব ও প্রাচ্যের আধুনিক সম্পর্কটা কি রকম আমি তা দেখানোর চেষ্টা করেছি তিনটি ধারাবাহিক বইয়ে; *কাভারিং ইসলাম* তার শেষ কিস্তি। এগুলোর মধ্যে *অরিয়েন্টালিজম* সবচেয়ে সামগ্রিক আলোচনা; ঐ সম্পর্কের বিভিন্ন পর্যায়গুলো সনাক্ত করা হয়েছে ওতে। মিশরে নেপোলিয়ানের অভিযান থেকে শুরু করে মূল উপনিবেশী কাল এবং উনিশ শতকের ইউরোপে প্রাচ্যতত্ত্বের রমরমা বিস্তার থেকে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ পর্যন্ত প্রাচ্যে ফরাসি-বৃটিশ আধিপত্যের যুগ, এরপর মার্কিন মাতবরির সূচনা। *অরিয়েন্টালিজমের* অন্তর জুড়ে আছে ক্ষমতার সাথে জ্ঞানের একাত্ম হওয়ার প্রসঙ্গ।[১] পরের বই *দি কোশ্চেন অব প্যালেস্টাইন* একটা লড়াইয়ের কেস হিস্ট্রী। লড়াইটা স্থানীয় আরবদের সাথে ইহুদিবাদী আন্দোলনের (পরে ইসরাইল); আরবদের বেশিরভাগই মুসলমান। এ আন্দোলনের উদ্ভব এবং ফিলিস্তিনের প্রাচ্যদেশীয় বাস্তবতা আঁকড়ে ধরার কায়দাটা পশ্চিমা। *অরিয়েন্টালিজম*-এর তুলনায় (পরের বইয়ে) ফিলিস্তিন নিয়ে আমার অধ্যয়ন অনেক খোলাখুলিভাবে দেখানোর চেষ্টা করেছে প্রাচ্য সম্পর্কে পশ্চিমের মতামত অর্থাৎ স্বায়ত্তশাসন লাভের উদ্দেশ্য নিবেদিত ফিলিস্তিনী জাতীয় সংগ্রামের প্রতি পশ্চিমের মনোভাবের পেছনে কোন কারণ ঘাপটি মেরে আছে[২]।

কাভারিং ইসলামে আমার বিষয় একেবারেই সাম্প্রতিক: পশ্চিমের চৈতন্যে ইসলামের যে ভাবমূর্তি অঙ্কিত হয়েছে তার প্রতি পশ্চিমের বিশেষ করে আমেরিকার প্রতিক্রিয়া। সত্তর দশকের শুরু থেকে তা একইসাথে খুবই প্রাসঙ্গিক, আবার বিরূপভাবে সমস্যাগ্রস্ত ও সঙ্কটসৃজক। পশ্চিমের এমন উপলব্ধির পেছনের বিভিন্ন কারণের মধ্যে সবচেয়ে শক্ত কারণটি হলো জ্বালানি তেলের স্বল্পতা; আর তার কেন্দ্রে আছে আরব ও পারস্য উপসাগরীয় তেল, ওপেক এবং পশ্চিমে জ্বালানি খরচের উর্ধ্বগতি ও মুদ্রাস্ফীতি। তা ছাড়া, তথাকথিত 'ইসলামের প্রত্যাবর্তন'-এর ধারণায় জ্বলজ্বলা সতর্কতামূলক প্রমাণ হিসেবে ঘটে যায় ইরানের বিপ্লব ও জিম্মি সংকট। সবশেষে, মুসলিম বিশ্বে চরমপন্থী জাতীয়তাবাদের উত্থান এবং দুর্ভাগ্যজনকভাবে, যেন পরিস্থিতির সাথে তাল মিলিয়ে, ঐ অঞ্চলে পরাশক্তির রেষারেষি। যেমন ইরান-ইরাক যুদ্ধ, আফগানিস্তানে সোভিয়েত ইউনিয়নের হস্তক্ষেপ, উপসাগরীয় অঞ্চলে দ্রুত সৈন্য সমাবেশের জন্য মার্কিন প্রস্তুতি।

কাভারিং ইসলাম-এর পাঠকরা সহজেই বুঝতে পারবেন এর ভেতরের কথাটা কি। তবু শুরুতে একটু ব্যাখ্যা দেয়া দরকার। *অরিয়েন্টালিজম* ও এখানে যে ব্যাপারগুলো

www.pathagar.com

বোঝানোর চেষ্টা করেছি তার একটা হচ্ছে যে, 'ইসলাম' পরিভাষাটির সাম্প্রতিক ব্যবহার একটি মাত্র অর্থ নির্দেশ করে, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এটি অংশত কাল্পনিক, অংশত ভাবাদর্শিক মার্কা, অংশত ধর্ম অর্থে ইসলাম-নির্দেশক। পশ্চিমে সাধারই ব্যবহারিক পরিভাষা "ইসলাম" এবং আশি কোটি মানুষের বিচিত্র জীবন নিয়ে বিস্তৃত বিশাল ইসলামী জগতের মধ্যে কোনো সরাসরি সম্পর্ক নেই। সে বিরাট জগতে আছে আফ্রিকা ও এশিয়ায় লক্ষ লক্ষ বর্গমাইল এলাকা, কয়েক কুড়ি সমাজ, রাষ্ট্র, ইতিহাস, ভূগোল ও সংস্কৃতি। অন্যদিকে, আজকের পশ্চিমা বিশ্বে "ইসলাম" উদ্ভটভাবে এক তীব্র বেদনাদায়ক "খবর" ; এর কারইগুলো আমি এ বইয়ে আলোচনা করেছি। বিগত বছরগুলোতে, বিশেষত ইরানের ঘটনাবলী ইউরোপ ও আমেরিকার গভীর মনোযোগ আকর্ষণ করার পর, প্রচার মাধ্যম ইসলাম সম্পর্কে প্রতিবেদন করে: তারা একে চিত্রিত করে, বিশ্লেষণ ও বৈশিষ্ট্য নিরূপণ করে, এর ওপর ঘনীভূত পাঠ করায় শিক্ষার্থীদেরকে; এবং এভাবে ইসলামকে পরিণত করে 'জানা' ব্যাপারে।

কিন্তু, আমি যা বোঝাতে চেয়েছি, এই (ইসলামের) প্রচারণা এবং সেইসাথে ইসলামের ওপর বিদ্যায়তনিক পণ্ডিতদের কাজ— ভূ-রাজনৈতিক কৌশলবিদ যেমন বলেন 'চাঁদের সঙ্কট চলছে', সংস্কৃতির ভাবুকরা যেমন আবিষ্কার করেন 'পশ্চিমের পতন হচ্ছে'— তার সবই বিভ্রান্তিকরভাবে পূর্ণ। এগুলো পশ্চিমা সংবাদ-ভোক্তাদের মধ্যে এমন ধারণা সৃষ্টি করে যে, তারা ইসলামকে বুঝে ফেলেছে, কিন্তু তাদের কাছে কখনো প্রকাশ করে না যে, বিপুল শক্তি খরচ করে সৃষ্ট এই প্রচারণার ভিত্তি লক্ষ্যমুখি বিষয়বস্তুর ওপর দাড়িয়ে নেই। অনেক দৃষ্টান্ত দিয়ে দেখানো যাবে "ইসলাম" যেন মার্কামারা ভুল করার লাইসেন্স দিয়েছে; কেবল ভুলই নয়, লাগামহীন নৃ-কেন্দ্রিকতা, সাংস্কৃতিক ও বর্ণবাদী ঘৃণা, সুগভীর অথচ উন্মুক্ত শত্রুতার লাইসেন্সও। সব কিছু ঘটেছে ইসলাম সম্পর্কে সেই প্রচারণার মধ্যে যাকে বলা হচ্ছে নিরপেক্ষ, ভারসাম্যপূর্ণ, দায়িত্বপূর্ণ। অথচ খ্রিস্টান ও ইহুদি ধর্মের মধ্যেও পুনরুজ্জীবন (বা প্রত্যাবর্তন) চলছে, সেই ব্যাপারে এমন আবেগময় আলোচনা চোখে পড়ে না। আসলে এমন একটা ধারণা তৈরি হয়েছে যে, কিছু দায়-দায়িত্বহীন ও বহুব্যবহৃত ছাল-ওঠা উক্তির সাহায্যে সীমাহীনভাবে ইসলামের বৈশিষ্ট্য নির্ধারণ করা সম্ভব। এবং সবসময় ধরে নেয়া হয় আলোচ্য 'ইসলাম' ওখানে স্থির ও প্রকৃত কোনো বস্তু, যেখানে ঘটনাক্রমে পাওয়া গেছে আমাদের তেল সরবরাহকারীদের।

এমন কায়দার প্রচারের সাথে সাথে আড়াল করার কাজটাও চলেছে অনেকদূর। ইরাকী অনুপ্রবেশে ইরানের প্রবল প্রতিরোধের ব্যাখ্যায় *নিউ ইয়র্ক টাইমস* অবলম্বন করে "শহীদ হওয়ার জন্য শিয়াদের অতি আগ্রহ"-এর সূত্র। বাক চাতুর্যের কারণে এমন কথা সীমিত অর্থে সঠিক মনে হতেও পারে; কিন্তু আমার মনে হয় প্রকৃতপক্ষে এই জাতীয় মন্তব্য ব্যবহার করা হয় সংশ্লিষ্ট বিষয়ে রিপোর্টারের পূর্ণ অজ্ঞতা আড়াল করার উদ্দেশ্যে। সংশ্লিষ্ট ভাষা না জানার ব্যাপারটা আসলে বড় মাপের অজ্ঞতার

www.pathagar.com

একটা অংশ মাত্র। অজ্ঞতার কারণ হলো, রিপোর্টারদেরকে সচরাচর কোনোরূপ পূর্ব-প্রস্তুতি ছাড়াই একটি অপরিচিত দেশে পাঠানো, শুধু এই বিশ্বাসের ওপর নির্ভর করে যে তিনি খুব দ্রুত সবকিছু জেনে নেয়ার মত চালাকচতুর, কিংবা ঘটনাটি যেখানে ঘটছে তিনি ঠিক সেখানে গিয়েই হাজির হচ্ছেন। এ অবস্থায় সংশিষ্ট রিপোর্টার দেশটি সম্পর্কে আরো বেশি জানার চেষ্টা করেন না, বরং নির্ভর করেন হাতের কাছে যা পাওয়া যায়—যেমন বহু পুরোনো জীর্ণ উক্তিতে, অথবা সাংবাদিকসুলভ এমন জ্ঞানের ওপর নির্ভর করেন যার সঠিকতার প্রশ্ন তুলতে পারবে না স্বদেশী পাঠকেরা। জিম্মি সংকটকালীন তেহরানে প্রায় শ'তিনেক সাংবাদিক জড়ো হয়েছিলেন, যদিও কারো সাথে ফারসি জানা দোভাষী ছিলো না। ফলে আশ্চর্য হওয়ার কিছু নেই যে, ইরান থেকে পাঠানো সব রিপোর্টে থাকে ঘটনার একই জীর্ণ ভাষ্য। এরমধ্যে ইরানে অন্যান্য ঘটনা ও রাজনৈতিক প্রক্রিয়া ঘটে যেতে থাকে রিপোর্টারদের দৃষ্টির আড়ালে; যদিও ঐসব ঘটনাকে 'মার্কিন-বিরোধী' বা 'ইসলামী মনোভঙ্গির' বলে চালানো যাবে না।

ইসলাম সম্পর্কে 'প্রতিবেদন রচনা' এবং 'ইসলামকে আড়াল করে রাখা'র এই যে তৎপরতা তা আসলে একটা দুর্ভাগ্যজনক অবস্থার লক্ষণ; যদিও দুর্ভাগ্যজনক অবস্থাটি সম্পর্কে সামান্য সচেতনতার বোধও নষ্ট হয়ে গেছে ঐ দুই ধরনের তৎপরতার কারণে। সেই অবস্থাটি হলো : এমন এক বিশ্বে জানা ও বসবাসের সমস্যা যে-বিশ্ব সহজ ও তাৎক্ষণিক সাধারণীকরণের যোগ্য নয়, বরং খুব বেশি জটিল ও বৈচিত্র্যময়। এ ক্ষেত্রে ইসলাম একটি চলতি উদাহরণ আবার বিশেষ দৃষ্টান্তও, যেহেতু পশ্চিমে এর রয়েছে এত পুরোনো ও সু-কথিত ইতিহাস। এ কথায় আমি বোঝাতে চাই যে, বহু উত্তর-উপনিবেশী দেশের মত ইসলাম ইউরোপের অংশ নয়, আবার জাপানের মত, অগ্রসর শিল্পায়িত জাতিগুলোর অন্তর্ভুক্তও নয়। একে বিবেচনা করা হয় "উন্নয়ন দৃশ্যপট"-এর বৃহত্তর আওতার মধ্যে; ভিন্নভাবে বলা যায়, গত তিন দশক ধরে মনে করা হচ্ছে ইসলামী সমাজের 'আধুনিকায়ন' প্রয়োজন। আধুনিকায়নের ভাবাদর্শে ইরানের শাহকে ইসলামের উন্নতির পরম চূড়া বলে মনে করার রীতি গড়ে উঠেছে। সবচেয়ে স্থিতিশীল ও শক্তিশালী অবস্থানের শাহ হলেন আধুনিক শাসক। আর তার পতনকে ধরে নেয়া হয় মধ্যযুগীয় গোঁড়া ধর্মান্ধতার কাজ হিসেবে।

অন্যদিকে, ইসলাম পশ্চিমের নিকট নির্দিষ্ট এক ভীতির প্রতিনিধিত্ব করে; তার কারণগুলো আমি আলোচনা করেছি *অরিয়েন্টালিজম*-এ, আরেকবার উল্লেখ করেছি বর্তমান বইয়েও। আজকের দুনিয়ায় যেরকম জোর দিয়ে ইসলামকে পশ্চিমের প্রতি হুমকি হিসেবে বর্ণনা করা হয়, অন্য কোনো ধর্ম বা সাংস্কৃতিক জনগোষ্ঠী সম্পর্কে এভাবে বলা অসম্ভব। কাজেই মুসলিম বিশ্বে চলমান বিক্ষোভ ও প্রবল আলোড়ন আকস্মিক দুর্ঘটনা নয় (ইসলামের ব্যাপারে এই আলোড়নকে যা করতে হবে, তার চেয়ে বেশি কিছু করতে হবে আর্থ-সামাজিক ও ঐতিহাসিক নিয়ামক গুলোতে)। এ উত্থান গোবেচারা প্রাচ্যতাত্ত্বিকদের 'অদৃষ্টবাদী মুসলমান!' জাতীয় জীর্ণোক্তির

www.pathagar.com

সীমাবদ্ধতা উন্মোচন করে দিয়েছে। কিন্তু তার স্থান অন্য কিছু দিয়ে পূরণ করেনি, কেবল ঠেলে দিয়েছে পুরোনো দিনের স্মৃতিচারণের দিকে যখন ইউরোপীয় সেনাবাহিনী গোটা মুসলিম বিশ্ব শাসন করেছে—ভারত উপমহাদেশ থেকে একেবারে উত্তর আফ্রিকা পর্যন্ত। বিশাল একগুচ্ছ সাম্প্রতিক বইপত্র, সাময়িকী, জনব্যক্তিত্ব যে উপসাগরীয় এলাকা পুনর্দখল করার সফল আহবান জানাচ্ছে এবং যুক্তি হিসেবে ইসলামের 'বর্বরতার' কথা বলছে তার মূলে আছে (ওপরে বর্ণিত) ঐ ব্যাপার। আরেকটি বিশেষ লক্ষণীয় ব্যাপার হলো মার্কিন বিশেষজ্ঞের খ্যাতির জগতে নিউজিল্যান্ডের জে. বি. কেলির মত 'বিশেষজ্ঞদের' উত্থান কাল দেখেছে। আবুধাবীর শেখ জায়েদের[৩] এককালের উপদেষ্টা কেলি উইসকনসন বিশ্ববিদ্যালয়ে ইম্পেরিয়াল হিস্ট্রী'র অধ্যাপক ছিলেন। তিনি এখন মুসলমান ও নরম পশ্চিমাপন্থীদের সমালোচনায় মুখর, যারা তার মত না করে, আরবদের তেলের নিকট বিক্রি হয়ে গেছে। মাঝে মধ্যে তার বইয়ের সমালোচনা চোখে পড়ে। কিন্তু এসব সমালোচনার কোথাও বলা হয় না যে, তার বইয়ে শেষের অনুচ্ছেদে সচরাচর খোলাখুলিই পূর্ব-পুরুষের চরিত্র অনুযায়ী (মানুষের) দোষ/গুণ নির্ধারণ করার প্রবণতা আছে। সাম্রাজ্যবাদী জয়ের জন্য প্রবল আকুতি ও খোলামেলা বর্ণবাদী মনোভাবের সেসব অনুচ্ছেদের অংশ বিশেষ এখানে উল্লিখিত হওয়ার দাবী রাখে :

> সুয়েজের পুবে তার কৌশলগত উত্তরাধিকার সংরক্ষণ/পুনরুদ্ধারের জন্য পশ্চিম ইউরোপের হাতে কতটা সময় আছে সে ভবিষ্যৎবাণী করা অসম্ভব। যখন বৃটেনে প্যাক্স-বৃটানিকা গৃহীত হয়, অর্থাৎ উনিশ শতকের চার বা পাঁচের দশক থেকে বর্তমান (বিশ) শতকের মাঝামাঝি পর্যন্ত ভারত মহাসাগরের পশ্চিম দিকের তীরভূমি ও পুব অঞ্চলে ছিলো সমাহিত শান্তির বিস্তার। পুরোনো সাম্রাজ্যিক বিন্যাসের পদচিহ্ন হিসেবে এখনো সেখানে একরকম ক্ষণস্থায়ী শান্তির ছাপ আছে। গত চার বা পাঁচ শ' বছরের ইতিহাস যদি আমাদের কিছু শিখিয়ে থাকে তবে তা এই যে, এ শান্তি বেশিদিন টিকে থাকতে পারে না। এশিয়ার অধিকাংশ অঞ্চল ফিরে যাচ্ছে স্বৈরতন্ত্রে, আফ্রিকার বেশিরভাগ এলাকা বর্বরতায়—এমন এক অবস্থায় যা বিরাজ করছিলো ভাস্কো দ্য গামার সময়, যখন তিনি পুবে পর্তুগীজ আধিপত্যের ভিত্ পাতার জন্য অন্তরীপটি ভ্রমণ করেন। উপসাগর ও বাইরের দিকে বেরোবার পথের ওপর নিয়ন্ত্রণের জন্য ওমান চাবির মতো, তেমনি রেড সীতে ঢোকার বেলায় এডেন। পশ্চিমা শক্তিপুঞ্জ এরই মধ্যে একটা চাবি দূরে ছুঁড়ে দিয়েছে, আরেকটা এখনো তাদের নাগালের মধ্যে। এখন দেখার বিষয় হাতের নাগালের চাবিটা ধরার জন্য বহুযুগ আগের পর্তুগীজ ক্যাপ্টেনস-জেনারেলের প্রবল ও দৃঢ় মনোভাব তাদের মধ্যে আছে কি না।[৪]

পনর-ষোল শতকের পর্তুগীজ উপনিবেশবাদকে সঠিক দিক-নির্দেশনা হিসেবে গ্রহণের জন্য এ কালের পশ্চিমা রাজনীতিবিদদেরকে যে-পরামর্শ দেন কেলি তা

www.pathagar.com

খেয়ালী কথা বলে মনে করতে পারেন কেউ কেউ। কিন্তু এ বক্তব্যের মধ্য দিয়ে কেলি ইতিহাসের যে-সরল ভাষ্য উপস্থিত করেন তাই এখনকার প্রচলিত মনোভঙ্গি। তিনি বলেন উপনিবেশবাদ নিয়ে এসেছিলো সমাহিত প্রশান্তি; যেন মিলিয়ন মিলিয়ন মানুষকে পদানত করার বিষয়টি তার কাছে সরল, মিলনাত্মক কিস্‌সার মতো ব্যাপার। আর ঐসব মানুষদের জন্য ঐ যুগটাই ছিলো যেন শ্রেষ্ঠ সময়। তাদের আহত অনুভূতি, বিকৃত ইতিহাস, অসুখী গন্তব্য বুঝি কোনো ব্যাপারই নয়; বিশেষত যতদিন আমাদের স্বার্থ উদ্ধার অব্যাহত থাকে, যেমন- মূল্যবান সম্পদ, ভৌগোলিক ও কৌশলগত দিক থেকে গুরুত্বপূর্ণ একটি অঞ্চলের কর্তৃত্ব, সস্তা স্থানীয় শ্রমের বিরাট এক উৎস। বুঝি শত শত বছরের পরাধীনতার পর আফ্রিকা ও এশিয়ায় বিভিন্ন দেশের স্বাধীনতা অর্জনের ব্যাপারটি স্বৈরতন্ত্র ও বর্বরতায় ফিরে যাওয়া ছাড়া আর কিছু নয়। কেলির মতে এখন একমাত্র করণীয় হলো একটি নতুন দখলাভিযান চালানো; এ কর্তব্য প্রসঙ্গে তিনি মনে করেন বহু আগে রাজকীয় ব্যবস্থা সমর্পণ করে দেয়া হয়েছিলো। যা ন্যায়সঙ্গতভাবে 'আমাদের' তা আবার দখল করার জন্য পশ্চিমের প্রতি কেলির আহবানের পেছনে আছে এশিয়ার ইসলামী সংস্কৃতির প্রতি পরিপূর্ণ অবজ্ঞা। 'আমাদেরকে' সে সংস্কৃতি শাসন করতে বলেন কেলি।

এ জাতীয় উল্টা যুক্তিই কেলিকে ডানপন্থী মার্কিন বুদ্ধিবৃত্তিক জগতে প্রভূত সম্মান এনে দিয়েছে—উইলিয়াম এফ. বাকলে থেকে *নিউ রিপাবলিক*-এর কাছেও। আমরা না হয় উদারতাগুণে উল্টোযুক্তির ব্যাপারটা এড়িয়ে গেলাম। তার দৃষ্টিভঙ্গির যে দিকটি আরো মজার বলে মনে হয় তা হচ্ছে গোলমেলে ও খুঁটিনাটি একটি সমস্যার সামগ্রিক সমাধানের বিষয়টি কি করে সহজেই অন্য কিছু হিসেবে দাঁড় করিয়ে দেয়া হয়, বিশেষত যখন ইসলামের বিরুদ্ধে আসে শক্তি-নির্ভর পদক্ষেপ গ্রহণের সুপারিশ। কেউ জানে না হয়তো কি ঘটছে ইয়েমেন বা তুরস্কে, কিংবা লোহিত সাগর পেরিয়ে সুদান, মৌরিতানিয়া, মরক্কো এমনকি মিশরে। প্রচার মাধ্যমে নীরবতা, কারণ ওরা ব্যস্ত জিম্মি সংকটের প্রতিবেদন করা নিয়ে। প্রতিষ্ঠানগুলোয় নীরবতা, কারণ ওরা ব্যস্ত তেল-কোম্পানীগুলোকে উপদেশ প্রদান এবং গালফের মতিগতি সম্পর্কে কি ভাবে ধারণা করতে হবে সরকারকে সে পরামর্শ দেয়ার কাজে। সরকারে নীরবতা, তা কেবল সেখানেই তথ্য খুঁজে দেখতে যায় যেখানে 'আমাদের বন্ধুরা' (যেমন শাহ বা আনোয়ার সাদাত) তথ্য খুঁজে দেখতে বলে। 'ইসলাম' কেবল এইটুকুই যে তা আমাদের তেলের মজুদ; আর কোনো কিছুই গুরুত্বপূর্ণ নয়, আর কিছু আমাদের মনোযোগ দাবীর করার মতো নয়।

ইসলাম সম্পর্কে বিদ্যায়তনিক অধ্যয়নের কথাই ধরা যাক। ওখানে পরিশোধনমূলক তেমন কোনো কাজ চোখে পড়ে না। যেভাবেই হোক, সাধারণ সংস্কৃতির তুলনায় তা প্রান্তিক বিষয়ে পরিণত হয়েছে। অন্যান্য ক্ষেত্রে এটিই আবার গৃহীত হচ্ছে সরকার ও করপোরেশনগুলোর দ্বারা। এই পরিস্থিতির কারণে ইসলামকে প্রচার করা হয় এমন

www.pathagar.com

ভাবে যা ইসলামী সমাজের বাইরের চেহারাটার তলে তলে অস্তিত্বশীল বিভিন্ন বিষয়গুলো সম্পর্কে আমাদের উপলব্ধিতে বাধা দিয়ে অন্য অনেক কিছুই বলে যাচ্ছে। এরপর আছে পদ্ধতিগত ও বৃত্তিবৃত্তিক সমস্যারাজি, যার সমাধান হওয়া দরকার। যেমন: ইসলামী আচার-আচরণ বলে কি কিছু আছে? বিভিন্ন ইসলামী সমাজে কোন জিনিষটি দৈনন্দিন জীবনের ইসলামকে যুক্ত করে মতবাদের স্তরের ইসলামের সাথে? মরক্কো ও সৌদী আরব অথবা সিরিয়া ও ইন্দোনেশিয়াকে বোঝার জন্য 'ইসলাম' নামক ধারণাটি কতটা কার্যকর? আজকাল অনেক পণ্ডিতই যেমন সচেতন হয়ে উঠছেন, এই ব্যাপারগুলো যদি আমরা হৃদয়ঙ্গম করতে পারি তাহলে বোঝা যাবে যে, ইসলামী মতবাদ আসলে পুঁজিবাদ এবং এমনকি সমাজতন্ত্রকেও বৈধ করছে, বৈধতা দিচ্ছে জঙ্গীবাদ ও নিয়তিবাদকে, তেমনি বিশ্বজনীন খ্রিস্ট্রিয় ঐক্য ও স্বাতন্ত্রিক রক্ষণশীলতাকেও। এবং কেবল তখনই আমরা দেখতে পাবো ইসলাম সম্পর্কে বিদ্যায়তনিক বিবরণ (প্রচার মাধ্যমে যা অনিবার্যভাবে হয়ে ওঠে ক্যারিকেচার) এবং ইসলামী সমাজের নির্দিষ্ট বাস্তবতার মধ্যে আসমান-জমিন তফাত।

এ সত্ত্বেও ইসলাম যেন বলির পাঁঠা। পৃথিবীর নতুন নতুন রাজনৈতিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক যে-সব বিন্যাস আমাদের পছন্দ হয় না তাই ইসলামের ঘাড়ে চাপিয়ে দেয়ার যৌথ মনোভঙ্গি লক্ষ্য করা যায়। ডানপন্থীদের কাছে ইসলাম বর্বরতা, বামপন্থীদের মতে মধ্যযুগীয় ধর্মতন্ত্র; আর মাঝপন্থীরা মনে করেন এটি রুচিবিনষ্টকারক, আকর্ষণীয় রহস্যময় ব্যাপার। সকল দলের মধ্যে একটা সাধারণ ঐক্য এই যে, ইসলামী বিশ্ব সম্পর্কে আমাদের জানার পরিধি যত ক্ষুদ্রই হোক না কেন, অনুমোদন করার মত বিশেষ কিছু নেই ইসলামে। ইসলামে যা মূল্যবোধের ব্যাপার তা মূলত এন্টি-কমিউনিজম; এবং মজার ব্যাপার হলো ইসলামের এন্টি-কমিউনিজম দমন-মূলক মার্কিনপন্থী শাসনব্যবস্থারই একটা রূপ। এর চমৎকার দৃষ্টান্ত হলো পাকিস্তানের জিয়াউল হক।

আমার এই বই কোনো অবস্থাতেই ইসলামকে সমর্থন করার জন্য নয়; তা করলে মাটি হয়ে যেতো আমার পুরো পরিকল্পনাই। এটি মূলত বর্ণনা করে পশ্চিমে কিভাবে ব্যবহার করা হচ্ছে 'ইসলাম' ধারণাটিকে। মুসলিম বিশ্বে এর ব্যবহারও আমার আলোচনায় এসেছে, তবে এ দিকে বেশি সময় দিতে পারিনি আমি। পশ্চিমে ইসলামের অপব্যবহারের সমালোচনার করার অর্থ এ নয় যে, ইসলামী বিশ্বে এই বৈশিষ্ট্যগুলোর প্রকাশ মার্জনার চোখে দেখা হচ্ছে। ব্যক্তি-স্বাধীনতা হরণ, অপ্রতিনিধিত্বমূলক এমনকি অধিকাংশ ক্ষেত্রে সংখ্যাল্প সদস্যের শ্রেণীর হাতে শাসনব্যবস্থা প্রভৃতি হয় প্রতারণাপূর্ণ উপায়ে ইসলামের নামে বৈধ করা হয়, অথবা ইসলামের ওপর নির্ভরশীল ব্যাখ্যা বিশ্লেষণের মাধ্যমে যুক্তিসঙ্গত বলে দেখানো হয়। এ অপকর্মটি অন্যান্য বিশ্বজনীন ধর্মে যেমন, তেমন ইসলামেও দোষহীন। অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় রাষ্ট্রের অবাধ ক্ষমতা ও কর্তৃত্বকেও ঘটনাক্রমে ইসলামের ব্যাপার বলে মনে হয়।

যাই হোক, পশ্চিমে ইসলাম সম্পর্কে যা কিছু অস্বাস্থ্যকর তার সকল কিছুকেই না হয় দোষারোপ করলাম না। এ সত্ত্বেও, আমাদেরকে অবশ্যই দেখতে হবে ইসলাম

www.pathagar.com

সম্পর্কে পশ্চিম কি বলছে, আর তার প্রতিক্রিয়া হিসেবে বিভিন্ন মুসলিম সমাজ কি করছে; এ দুয়ের পারস্পরিক প্রভাব অবশ্যই ভেবে দেখতে হবে। এই দুয়ের দ্বন্দ্বের ফলস্বরূপ বেশিরভাগ মুসলিম দেশে উদ্ভূত হয়েছে একটি বিশেষ পরিস্থিতি—টমাস ফ্র্যাঙ্ক ও এডওয়ার্ড ওয়েজব্যান্ডের কথায় 'বিশ্বরাজনীতি'[৫]। মনে রাখতে হবে যে, ঐ সব দেশে প্রাক্তন উপনিবেশী শক্তিরূপে অথবা বর্তমান বাণিজ্যিক প্রতিপক্ষ হিসেবে পশ্চিম গুরুত্বপূর্ণ কথক। এই 'বিশ্বরাজনীতির' ব্যাপারটা ব্যাখ্যা করা এই বইয়ে আমার লক্ষ্য। পশ্চিম ও ইসলামের মধ্যে এই পালাক্রমে ধাক্কাধাক্কি, চ্যালেঞ্জ ও তার জবাব, এক ধরনের কথার জায়গা তৈরি করা ও অন্যধরনের কথার জায়গা বন্ধ করে দেয়া—এসব নিয়েই 'বিশ্বরাজনীতি'। এ দিয়েই উভয়পক্ষ তাদের পরিস্থিতি তৈরি করে, গৃহীত পদক্ষেপের বৈধতা দেয়, আগাম জায়গা দখল করে, নির্দিষ্ট কোনো বিকল্প গ্রহণে বাধ্য করে প্রতিপক্ষকে। এ ভাবে, ইরানীরা যখন তেহরানের মার্কিন দূতাবাস দখল করে তখন তারা কেবল যুক্তরাষ্ট্রে শাহর অবস্থানের বিরুদ্ধেই প্রতিক্রিয়া করে না, বরং তারা যাকে মনে করে শক্তিশালী আমেরিকা কর্তৃক তাদের ওপর চাপিয়ে দিয়ে বিভিন্ন অপমানমূলক পদক্ষেপের দীর্ঘ ইতিহাস, তার একটা জবাবও দেয়। যুক্তরাষ্ট্রের অতীত কর্মকাণ্ড বলে তাদের (ইরানীদের) জীবনের ওপর যুক্তরাষ্ট্রের অবিরাম হস্তক্ষেপের কথা। মুসলমান হিসেবে তাদের মনে হয় যুক্তরাষ্ট্র তাদেরকে নিজদেশে বন্দী করে রেখেছিলো। ওরা তাই আমেরিকার এলাকায়, অর্থাৎ তেহরানের মার্কিন দূতাবাসে বন্দী করে খোদ আমেরিকানদের। তাদের কাজই তা প্রমাণ করে; এ সত্ত্বেও মূলত তাদের কথা এবং কথার মধ্য দিয়ে প্রকাশিত ক্ষমতাপ্রবাহের ইঙ্গিত তৈরি করে প্রয়োজনীয় পথ, এমনকি অনেকাংশে সম্ভব করে তোলে মূল ক্রিয়াটি।

এই বিন্যাসকে গুরুত্বের সাথে দেখা উচিত। কারণ এতে রাজনীতি ও বাস্তবতার ঘনিষ্ঠ সম্পর্ককে উপেক্ষা করা হয়; অন্তত ইসলাম সম্পর্কিত আলোচনায়। ইসলাম বিষয়ক পণ্ডিতদের অনেকেই হয়তো এমন কথা স্বীকার করবেন না যে, পণ্ডিত হিসেবে তারা যা বলেন/লিখেন তা খুব চমৎকারভাবে—কখনো কখনো বিদ্বেষমূলকভাবে—রাজনৈতিক পটভূমির ওপর দাড়ানো। সমকালীন পশ্চিমে ইসলাম সম্পর্কিত সকল অধ্যয়নই রাজনৈতিক গুরুত্ব দ্বারা সিক্ত, বিশেষজ্ঞ বা সাধারণ আলোচকেরা স্বীকার করুন আর নাই করুন। পশ্চিম বা ইসলামী সকল সমাজেই ভিনদেশী বা আগন্তুক ও 'অন্যরকম' সম্পর্কে চিন্তাভাবনায় রাজনৈতিক, নৈতিক ও ধর্মীয় প্রভাবের দীর্ঘ ইতিহাস আছে। এ সত্ত্বেও এমন ধরে নেয়া হয় যে, আন সমাজ (Other Society) সম্পর্কিত পণ্ডিতি জ্ঞানভাষ্য হবে দৃঢ়ভাবে বিষয়মুখি। ইউরোপে প্রাচ্যতাত্ত্বিকরা ঐতিহ্যগতভাবেই সরাসরি উপনিবেশিক কেন্দ্রের সাথে যুক্ত থাকতেন; উপনিবেশী সামরিক বিজয়াভিযান এবং পাণ্ডিত্যের মধ্যে সহযোগিতার সম্পর্ক কতদূর বিস্তৃত ছিলো সে সম্পর্কে আমরা মাত্র এই সাম্প্রতিককাল থেকে কিছু কিছু জানতে শুরু করেছি, যা একই সাথে খুবই

www.pathagar.com

দুঃখজনক আবার নৈতিক উন্নতিকারকও (যেমন মহতী বলে শ্রদ্ধেয় ডাচ প্রাচ্যতাত্ত্বিক সি. স্নোক হারগ্রোনেই সুমাত্রার এজেনিজ মুসলমানদের বিশ্বাস অর্জনে সমর্থ হন; এরপর সেই বিশ্বাস কাজে লাগিয়ে এজেনিজদের বিরুদ্ধে বর্বর ডাচ যুদ্ধ পরিচালিত হয়[৬])। অথচ পশ্চিমা পাণ্ডিত্যের অ-রাজনৈতিক চরিত্র, প্রাচ্যতাত্ত্বিক জ্ঞানের সুফল এবং 'বিষয়মুখি' বিশেষজ্ঞতার প্রংশসা করে নিয়মিত লেখা হচ্ছে বিভিন্ন প্রবন্ধ-নিবন্ধ, বইপত্র। আবার ইসলাম বিষয়ে বিশেষজ্ঞদের প্রায়-প্রত্যেকেই হয় প্রচার মাধ্যম অথবা কোনো করপোরেশন কিংবা সরকারে উপদেষ্টা, এমনকি চাকুরে। আমার কথা হচ্ছে এই যে সহযোগিতার সম্পর্ক তা স্বীকার করে নিতে হবে, কেবল নৈতিক কারণে নয়, বুদ্ধিবৃত্তিক প্রয়োজনেও।

ধরা যাক, আমরা মেনে নিলাম ইসলাম সম্পর্কিত জ্ঞানভাষ্য এর পরিপার্শ্বের রাজনৈতিক, আর্থ ও বুদ্ধিবৃত্তিক পরিস্থিতির দ্বারা সম্পূর্ণ কলঙ্কিত হয়নি; তাহলেও এটকু স্বীকার করতে হবে যা তা এসব পরিস্থিতির রঙে রঞ্জিত হয়েছে অন্তত। পুব পশ্চিম সবখানেই তা সত্যি। প্রকাশ্য অনেক প্রমাণের কারণে এমন বলা অতিরঞ্জন হয় না যে, ইসলাম বিষয়ে যে কোনো জ্ঞানভাষ্যের স্বার্থ রয়েছে কোনো না কোনো কর্তৃত্ব অথব ক্ষমতায়। আবার, ইসলাম সম্পর্কিত সব লেখাজোখা ও পাণ্ডিত্যকে আমি অর্থহীন বলছি না। বরং বলছি এই পাণ্ডিত্য ও রচনা অনেক কাজের জিনিষ, কোন স্বার্থ রক্ষা হচ্ছে তা বোঝার ক্ষেত্রে একটা সূচীর মত উপকারী। মানব সমাজ সম্পর্কিত বিষয়ে পরম সত্য কিংবা পরম জ্ঞান বলে কিছু আছে কি না আমার জানা নেই। হয়তো তা আছে কেবল বিমূর্ত ধারণা হিসেবে এবং সেক্ষেত্রে তা আপাতভাবে গ্রহণ করতে আমার আপত্তি নেই। কিন্তু 'ইসলাম' জাতীয় বিষয়ে সত্য তার সাথে সম্পর্কিত যিনি তা সৃষ্টি করেন। এখানে বলে রাখা দরকার, এ অবস্থান গ্রহণ করলেও জ্ঞানের বিভাজন (যেমন ভালো, মন্দ, নিরপেক্ষ) বাতিল হয়ে যায় না, কিংবা নষ্ট হয় না কোনো কিছু সঠিকভাবে বলার সম্ভাবনাও। বরং এর অর্থ হচ্ছে যে-ই 'ইসলাম' সম্পর্কে কথা বলুন না কেন, তার মনে চলে আসে সেই সব প্রসঙ্গও যা সাহিত্যে নবাগত কোনো ছাত্রর মনেও কাজ করে: তা এই যে, মানবীয় বাস্তবতা সম্পর্কে লেখার বা কোনো রচনা পাঠ করার কাজে এমন বহু উপাদান সক্রিয় হয়ে ওঠে যে-গুলো 'বিষয়মুখিনতা'র লেবেলে বিবেচনা করা অসম্ভব।

এ কারণেই আমি মন্তব্য বা ভাষ্য-উৎপাদক পরিস্থিতি সনাক্ত করার সময় বেদনা বোধ করি। এ কারণেই সমাজে 'ইসলাম' সম্পর্কে আগ্রহী দলগুলো সনাক্তকরণ এত জরুরী। সাধারণভাবে পশ্চিমে—বিশেষ করে যুক্তরাষ্ট্রে 'ইসলাম'-এর ওপর ক্ষমতার প্রভাবে সৃষ্ট প্রবাহরূপ বিশেষভাবে লক্ষণীয়; এর উপাদান-দলগুলোর জন্য যেমন (প্রচার মাধ্যম, করপোরেশন, শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান, সরকার), তেমনি এর উৎপাদিত রক্ষণশীল বলয় থেকে ভিন্নমতের নির্বাসনের কারণেও। তার ফলাফল হলো ইসলামের মারাত্মক সরলীকরণ। এর উদ্দেশ্য হচ্ছে অনেকগুলো পরিকল্পিত লক্ষ্য অর্জন: একটি নয়া ঠাণ্ডা যুদ্ধ উস্কে দেয়া থেকে শুরু করে জাতিগত বিদ্বেষ প্ররোচিত করা, সম্ভাব্য

www.pathagar.com

দখলাভিযানের অজুহাত তৈরি, মুসলিম ও আরবদেরকে অব্যাহতভাবে কলঙ্কিত করা[৭]। আমার বিশ্বাস এসব কিছুই সত্য উদঘাটনের জন্য ঘটছে না; এই পরিকল্পিত উদ্দেশ্য অর্জনের মধ্যে যে-সত্য নিহিত তা তো বরাবরেই আড়ালে। এর বদলে আমরা পাণ্ডিত্যের—এমনকি বৈজ্ঞানিক বিশেষজ্ঞতার চাদরে ঢেকে বিবৃতি দিই, উদ্দেশ্য সফল করি। এর একটা ফলাফল হচ্ছে যখন মুসলিম দেশগুলো থেকে মার্কিন বিশ্ববিদ্যালয়ে আরব বা ইসলাম বিষয়ক অধ্যয়নের জন্য অনুদান প্রদান করা হয় তখন বিদেশী হস্তক্ষেপের বিরুদ্ধে বিরাট অ-সাম্প্রদায়িক হাউকাউ শুরু হয়ে যায়। কিন্তু জাপান বা জার্মানী থেকে প্রাপ্ত অনুদান এলে কোনো কথাবার্তা নাই। তেমনি বিশ্ববিদ্যালয়ের ওপর করপোরেট চাপের ফলাফলকেও মনে করা হয় ভালো ব্যাপার।[৮]

ওস্কার ওয়াইল্ড যেমন সন্দেহবাতিকগ্রস্ত (সিনিক) সম্পর্কে বলেছেন যে—তিনি সব কিছুর দাম জানেন কিন্তু কোনোটার মূল্য বোঝেন না—আমাকে আবার অমন মনে করা না হয়, তাই সবশেষে বলে রাখি তথ্যনির্ভর বিশেষজ্ঞ জ্ঞানের প্রয়োজনীয়তাও স্বীকার করি। আরো স্বীকার করি যেঃ বৃহৎ শক্তি হিসেবে বাইরের পৃথিবীর প্রতি বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গি ও নীতিমালা থাকারই কথা যুক্তরাষ্ট্রের, ক্ষুদ্র শক্তিগুলোর যা নেই; এবং বর্তমান হতাশাব্যঞ্জক পরিস্থিতিতে উন্নয়ন ঘটবে এমন আশা করা যায়। এ সত্ত্বেও বহু বিশেষজ্ঞ, নীতি-নির্ধারক ও সাধারণ বুদ্ধিজীবী যেমন 'ইসলাম' ধারণাটিতে দৃঢ় ও প্রবলভাবে বিশ্বাস করেন, আমি ততটা করি না। আমি মনে করি মানুষ ও তার সমাজকে কোন জিনিষটি ধাক্কা দেয় তা বোঝার ক্ষেত্রে এই বিশ্বাস সহায়ক না হয়ে বরং বাধা হয়ে দাঁড়ায়। তবে আমি সত্যিই বিশ্বাস করি সমালোচনামুখি চৈতন্য এবং ইচ্ছুক মানুষও রয়েছে, যারা ধারণাটিকে ব্যবহার করে বিশেষজ্ঞদের স্বার্থ ও তাদের *আইডিজ রিসিজ*-এর সীমানা ডিঙ্গিয়ে যেতে সক্ষম। ভালো ও সমালোচনামুখি পাঠ-দক্ষতায় কাণ্ডজ্ঞানহীনতা থেকে কাণ্ডজ্ঞানকে মুক্ত করার মাধ্যমে, সঠিক প্রশ্ন করা ও যথাযথ উত্তর আশা করার মধ্য দিয়ে যে কেউ জ্ঞান লাভ করতে পারেন ইসলাম ও ইসলামী জগত সম্পর্কে, সে জগতের বাসিন্দা নারী-পুরুষ ও তাদের সংস্কৃতি সম্পর্কে; যারা ঐ জগতের বাতাসে নিঃশ্বাস নেয়, এর ভাষায় কথা বলে, সৃষ্টি করে এর সমাজ ও ইতিহাস। এই জায়গা থেকেই মানবতাবাদী জ্ঞানের শুরু, জ্ঞানের সম্প্রদায়গত দায়ভার কাঁধে নেয়ারও সূচনা। এ উদ্দেশ্যকে পূরণের পথে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য আমার এ বই।

বইটির এক ও দুই নম্বর অধ্যায়ের কিছুটা করে ছাপা হয়েছে *দি ন্যাশন* ও *কলাম্বিয়া জার্নালিজম রিভিউ* পত্রিকায়। খুবই সংক্ষিপ্ত সময়ের জন্য *কলাম্বিয়া জার্নালিজম রিভিউ*-এর সম্পাদকের দায়িত্ব পালনকালে রবার্ট ম্যানফ একে একটি চমৎকার প্রকাশনায় পরিণত করেছিলেন। তাকে আমার কৃতজ্ঞতা। বইটির কোনো কোনো অংশের মালমশলা যোগার করার কাজে ডগলাস বান্ডউইন ও ফিলিপ শেহাদের সক্ষম সহযোগিতা লাভ করেছি। সব লেখাজোখা একসাথে করে সাহিত্যিক জ্ঞান ও দক্ষতা দিয়ে চূড়ান্ত পাণ্ডুলিপি প্রস্তুত করেছেন পল লিপারি। অ্যালবার্ট সাঈদের উদার

www.pathagar.com

সহযোগিতার জন্যও কৃতজ্ঞতা জানাই। সুপ্রিয় কমরেড একবাল আহমেদের কাছে বিশেষ ঋণ স্বীকার করি। সন্দেহময়, কঠিন প্রয়াসের কালে তার বিশ্বকোষ-সদৃশ জ্ঞান ও সীমাহীন সনির্বন্ধ অনুরোধ শেষ পর্যন্ত টিকিয়ে রেখেছে আমাদের অনেককে। পাণ্ডুলিপিটি প্রথম অবস্থায় পাঠ করে পুনর্বিবেচনার জন্য অনেক খুঁটিনাটি পরামর্শ দিয়েছেন জেমস পেক; অবশ্য, এখনো যদি কোনো ভুল থেকে থাকে তবে এর দায়-দায়িত্ব কিছুতেই তার নয়। তার অতি-প্রয়োজনীয় সহায়তার কথা সানন্দে স্বীকার করি। প্যান্থিয়ন বুকস-এর জাঁ মর্টন যথেষ্ট দক্ষতা ও সতর্কতার সাথে পাণ্ডুলিপির কপি-সম্পাদনা করেছেন, তার নিকট আমি সবিশেষ কৃতজ্ঞ। আঁদ্রে জিফ্রিনকেও ধন্যবাদ। এই বই যাকে উৎসর্গ করেছি, সেই মরিয়ম সাঈদ বইটি লেখার সময় লেখককে প্রাণবন্ত রেখেছেন। তার ভালোবাসা, সঙ্গ ও উজ্জীবক উপস্থিতির জন্য সহৃদয় ধন্যবাদ।

ই. ডব্লিউ. এস
অক্টোবর, ১৯৮০
নিউ ইয়র্ক

পুনশ্চ :

তেহরানস্থ মার্কিন দূতাবাসের অভ্যন্তরে ৪৪৪ দিন অবরুদ্ধ থাকার পর ১৯৮১ সালের জানুয়ারির কুড়ি তারিখে ইরান ত্যাগ করেন ৫২ জন আমেরিকান জিম্মি; আমেরিকায় ফিরে আসেন আরো কয়েকদিন পর। তাদের ফিরে আসার আনন্দে উদ্বেল সারা দেশ তাদেরকে অভ্যর্থনা জানায়। ঘটনাটিকে অভিহিত করা হয় 'জিম্মি প্রত্যাবর্তন' নামে। 'জিম্মি প্রত্যাবর্তন' গোটা সপ্তাহ ধরে দখল করে রাখে মার্কিন প্রচার মাধ্যমকে। 'ফেরতীরা' প্রথমে আলজিরিয়া, অতপর জার্মানী, এরপর পশ্চিমে ওয়াশিংটনে এবং সবশেষে নিজ নিজ এলাকায় ফিরে যায়। গোটা ঘটনাটি সরাসরি সম্প্রচার করা হয় বহু ঘন্টার টেলিভিশন অনুষ্ঠানে, যা প্রায়ই হয়ে ওঠে 'অনধিকার প্রবেশমূলক' ও ভাবোন্মাদ প্রতিবেদনের মত। অধিকাংশ দৈনিক ও সাপ্তাহিক প্রকাশ করে বিশেষ ক্রোড়পত্র। ইরান ও যুক্তরাষ্ট্রের চূড়ান্ত চুক্তিতে উপনীত হওয়ার কাহিনী এবং এতে জড়িত বিভিন্ন বিষয়ের জ্ঞানগর্ভ বিশ্লেষণ থেকে শুরু করে মার্কিন বীরত্ব ও ইরানী বর্বরতাও এতে অন্তর্ভুক্ত থাকে; আর জিম্মিদের অগ্নিপরীক্ষার গল্প ছড়ানো ছিটানো, যেগুলো প্রায়ই অতি-উদ্যমী সাংবাদিকদের নিজস্ব কারুকাজমণ্ডিত। যে জিনিষটা সতর্কতাজনক তা হচ্ছে বেশ কিছুসংখ্যক মনস্তত্ত্ববিদের উপস্থিতি: জিম্মিরা কোন অবস্থায় সময় কাটিয়েছে তা ব্যাখ্যা করতে যেন উন্মুখ এইসব মনস্তত্ত্ববিদ। যখন একদিকে অতীত নিয়ে আলোচনা, অন্যদিকে, ইরানী বন্দীত্বের প্রতীকস্বরূপ হলুদ ফিতার সীমানা মাড়িয়ে গেছে যে ভবিষ্যৎ তা নিয়েও আলোচনা চলমান, তখন নতুন প্রশাসন নির্ধারণ করে দেয় এসব আলোচনার স্বর ও সীমানা। যে প্রশ্নটি সামনে আসে তা হচ্ছে এমন একটি চুক্তি করা উচিত হয়েছে কি না অথবা এখন

www.pathagar.com

সেই চুক্তি মানা দরকার কি না। ১৯৮১ সালের জানুয়ারীর ৩১ তারিখে *নিউ রিপাবলিক* আক্রমণ করে মুক্তিপণের বিষয়টিকে, সঙ্গে সঙ্গে কার্টার প্রশাসনকেও—সন্ত্রাসের কাছে আত্মসমর্পণের অভিযোগে। অতপর ইরানীদের দাবী নিয়ে ভাবনা চিন্তা করার গোটা প্রস্তাবটি সম্পর্কে বলা হয় "আইনের দিক থেকে বিতর্কসৃজক প্রস্তাব"। মাধ্যম হিসেবে ব্যবহৃত আলজিরিয়ারও সমালোচনা করা হয়; আলজিরিয়ার বিরুদ্ধে তাদের অভিযোগ এই দেশ সন্ত্রাসীদেরকে নিয়মিত আশ্রয় দেয়, মুক্তিপণের টাকা হস্তান্তরে সহায়তা করে। সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে রিগান প্রশাসনের যুদ্ধ ঘোষণা ভবিষ্যৎ সম্পর্কিত আলোচনায় বাধা তৈরি করে। মানবাধিকার নয়, সন্ত্রাস-বিরোধিতা জায়গা করে নেয় যুক্তরাষ্ট্রের নীতিমালায়, এমনকি এও বলা হয় যে সন্ত্রাস-বিরোধী যুদ্ধে প্রয়োজনে 'সহনশীল' মাত্রার নিপীড়ক শাসকদেরকেও সহায়তা করা হবে, যদি তারা মিত্র হয়ে থাকেন।

যথারীতি *খ্রিস্টিয়ান সায়েন্স মনিটর*-এর জানুয়ারী ২৯, ১৯৮১ সংখ্যায় পিটার সি. স্টুয়ার্ট জানান "জিম্মি মুক্তির চুক্তির শর্তাবলী... জিম্মিদের চিকিৎসা... দূতাবাসের নিরাপত্তা ব্যবস্থা (এবং পরের চিন্তা হিসেবে) ভবিষ্যত ইরান-মার্কিন সম্পর্ক " বিষয়ে আলোচনার জন্য কংগ্রেসে শুনানীর তারিখ ঠিক করা হচ্ছে। দেখা যাচ্ছে সঙ্কট চলাকালীন মূল সমস্যার যে সঙ্কীর্ণ চিত্রটি চিহ্নিত হয়েছে (কিছু ব্যতিক্রম বাদে) প্রচার মাধ্যমের দ্বারা, তার সাথে তাল মিলিয়েই যেন এ নিয়ে আর কোনো মনোযোগী চিন্তা ভাবনা হয় না। ইরানী ট্রমা আসলে কি, ভবিষ্যত বিষয়ে তার ইঙ্গিত কি, এর শিক্ষনীয় দিক কোনটি—এসব বিষয় নিয়ে কোনো বিশ্লেষণাত্মক ভাবনার ছাপ নাই। *লন্ডন সানডে টাইমস রিপোর্ট* করে যে, অফিস ছাড়ার আগে প্রেসিডেন্ট কার্টার স্টেট ডিপার্টমেন্টকে পরামর্শ দিয়ে গেছেন যেন "সাধারণ মানুষের সকল মনোযোগ এক করে ঘৃণা ও ক্রোধের ঢেউ জাগিয়ে তোলা হয় ইরানীদের বিরুদ্ধে।" এ কথা সত্য হোক বা না হোক, এমন বলা সম্ভব। কারণ দুয়েকজন সাংবাদিক-কলামিষ্ট ছাড়া, কোনো সরকারী কর্মকর্তা বা লেখক-সাংবাদিক ইরান ও মুসলিম বিশ্বের অন্যান্য দেশে মার্কিন হস্তক্ষেপের দীর্ঘ ইতিহাস পুনর্মূল্যায়িত করতে চাননি। মধ্যপ্রাচ্যে স্থায়ীভাবে সেনাবাহিনী রাখার ব্যাপারে অনেক কথা হয়; অন্যদিকে, জানুয়ারীর শেষ সপ্তাহে তায়েফে ইসলামী শীর্ষ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হলেও ঘটনাটিকে সোজাসুজি উপেক্ষা করে মার্কিন প্রচার মাধ্যম।

প্রতিশোধের পরিকল্পনা এবং মার্কিন শক্তিমত্তা নিয়ে নানা কথা হয় উচ্চস্বরে, সাথে থাকে জিম্মিদের দুর্ভোগ ও ফিরে আসার বীরত্বগাঁথার বহুগুণ বর্ধিত জারিগান। ঘটনার শিকার জিম্মিদেরকে সরাসরি বীর এবং স্বাধীনতার প্রতীক-এ রূপান্তরিত করা হয় (বোঝাই যায়, ব্যাপারটা ভালো লাগার কথা নয় যুদ্ধফেরত প্রাক্তন বীর সৈনিক ও পি.ও.ডব্লিউ গ্রুপের সদস্যদের), আর তাদের আটককারীদের চিত্রিত করা হয় মানবেতর প্রাণী হিসেবে। এ পর্যায়ে ২২শে জানুয়ারী *নিউ ইয়র্ক টাইমস*-এর সম্পাদকীয়তে বলা হয় "মুক্তির এই প্রথম প্রহরে ক্রোধ ও প্রতিশোধস্পৃহা জেগে

www.pathagar.com

উঠুক।" আবার ২৮শে জানুয়ারীতে লেখা হয়, "কি করা উচিত ছিলো? বন্দরে মাইন পেতে রাখা, বা মেরিন নামিয়ে দেয়া, অথবা কয়েকটা বোমা ফেললে হয়তো এই জাতীয় শত্রু ভয় পেতো। কিন্তু ইরান কি যুক্তি বুঝতো কিংবা, (এখন) বুঝে?" অবশ্য ইরানকে সমালোচনার করার মতও অনেক কিছু আছে, জানুয়ারীর ২৫ তারিখের লস *এঞ্জেলেস টাইমসে* লিখেছেন ফ্রেড হেলিডে : একটি আধুনিক রাষ্ট্র বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর কল্যাণের লক্ষ্যে যেভাবে প্রতিদিনের কাজ কর্মের মধ্য দিয়ে এগিয়ে যায়, ইরানের ধর্ম ও অ-দমিত বিপ্লবোত্তর উত্তাপ তা করতে সক্ষম নয়। আন্তর্জাতিকভাবে ইরান একঘরে এবং নিরাপত্তাহীন। এবং এও পরিষ্কার যে, দূতাবাসের অভ্যন্তরে ছাত্ররা জিম্মিদের সাথে সবসময় হয়তো ভদ্র থাকেনি। কিন্তু, এমনকি ৫২ জন জিম্মির কেউ-ই বলেননি যে তাদেরকে নির্যাতন করা হয়েছে বা তাদের সাথে অমানবিক আচরণ করা হয়েছে; ওয়েস্ট পয়েন্টে ওদের সংবাদ সম্মেলন থেকে এ কথা প্রমাণিত হয় (দ্রঃ *নিউ ইয়র্ক টাইমস*, জানুয়ারী ২৮)। ওখানে এলিজাবেথ সুইফট পরিষ্কার করেই বলেছেন যে, তিনি যা বলেছেন *নিউজ উইক* তার ওপর মিথ্যাচার করেছে, নির্যাতনের কাহিনী বানিয়েছে (প্রচার মাধ্যমে যা আরো ফুলিয়ে-ফাঁপিয়ে নেয়া হয়), বাস্তবের সাথে এর সম্পর্ক নাই। জিম্মিদের প্রত্যাবর্তন প্রচার মাধ্যম ও অন্যান্য সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডকে এমন এক লাইসেন্স দেয় যার বলে জিম্মিদের অস্বস্তিকর, উদ্বেগজনক, দুঃখজনকভাবে দীর্ঘ নির্দিষ্ট একরকম অভিজ্ঞতা আকস্মিক এক লাফে ইরান ও ইসলাম বিষয়ক সাধারণীকরণে রূপান্তরিত হয়। অন্যকথায়, একটি জটিল ঐতিহাসিক অভিজ্ঞতাকে সহসা রূপান্তরিত করে নিয়োগ করা হয় স্মৃতি বিলোপের কাজে। এভাবে আবার আমরা পূর্বের মৌলভিত্তিতে ফিরে আসছি। জানুয়ারীর ২৩ তারিখের *আটলান্টা কনস্টিটিউশন*-এ বব ইনজেলের লেখায় ইরানীদেরকে সংকোচিত করে পরিণত করা হয় "মৌলবাদী উন্মাদ"-এ; সেদিনের *ওয়াশিংটন পোস্টে* ক্লেয়ার স্টার্লিং লিখেন ইরানের ঘটনা হলো "ভীত যুগ-১"— সভ্যতার বিরুদ্ধে সন্ত্রাসের যুদ্ধ। অথচ *ওয়াশিংটন পোস্টের* একই সংখ্যায়, বিল গ্রীনের মনে হয় "ইরানীদের নোংরা কাজটি" সম্পর্কে সংবাদ প্রচারক প্রচার মাধ্যমগুলো "প্রেসের স্বাধীনতাকে" বিকৃত করে শেষে মার্কিন জাতীয়তাবাদ ও আত্মশ্রদ্ধাবোধের প্রতি তাক করা একটা অস্ত্রে পরিণত হওয়ার আশঙ্কা দেখা দিয়েছে। আত্মবিশ্বাস ও নিরাপত্তাহীনতার সমন্বিত এই বোধ খানিকপরই বাতিল হয়ে যায় যখন গ্রীন প্রশ্ন করেন, প্রচার মাধ্যম কি "ইরানী বিপ্লব" বুঝতে "আমাদেরকে" সহায়তা করেছে। এ প্রশ্নের উত্তর দেন মার্টিন কনড্রাক, *ওয়াল স্ট্রীট জার্নাল*-এর জানুয়ারীর ২৩ তারিখের সংখ্যায়। তিনি লিখেন, "(দুএকটা মাত্র ব্যতিক্রম ছাড়া) মার্কিন টেলিভিশন ইরানের ঘটনাটিকে এমনভাবে প্রচার করেছে যেন তা সোপ অপেরা, বা ফ্রিক শো' : মুষ্টির খেলা আর আত্ম-পীড়ন দেখানোর ব্যাপার।

কিছু সাংবাদিক আছেন যাদের লেখা সত্যিই কিছু বলে। যেমন এইচ. ডি. এস. গ্রীনওয়ে জানুয়ারীর ২১ তারিখের *বোস্টন গ্লোব*-এ স্বীকার করেন "জিম্মি সংকট

www.pathagar.com

নিয়ে আমেরিকার ভাবোন্মোত্ততা অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ ইস্যু চাপা দিয়ে মার্কিন স্বার্থ ক্ষতিগ্রস্ত করেছে"। তবে তিনি পরিষ্কার এই সিদ্ধান্তে পৌঁছতে পারেন যে, "বহুপাক্ষিক পৃথিবীর বাস্তবতা পরিবর্তিত হবে না। বিশ শতকে ক্ষমতার বাস্তব সীমাবদ্ধতার কারণে নতুন প্রশাসন তা মানতে বাধ্য হবে।" সেদিনের *গ্লোব* পত্রিকাতেই স্টিভেন এরল্যাঙ্গার সঙ্কট উত্তরণ এবং এর মধ্য দিয়ে এ বিষয়ক বিতর্ক "কম আবেগ ও অধিকতর যুক্তির" দিকে নিয়ে যেতে সক্ষম হওয়ায় প্রশংসা করেন কার্টার প্রশাসনের। অন্যদিকে, এর জবাবে *নিউ রিপাবলিক* 'বরাবর তাল-দিয়ে চলা গ্লোব'-এর সমালোচনা করে, যার অর্থ দাঁড়ায় ওদের মতে মার্কিন শক্তির পুনর্বিন্যাস ও কমিউনিজম-বিরোধী যুদ্ধে ইরানকে অস্বাভাবিক ব্যাপার হিসেবেই বিবেচনা করা উচিত। প্রকৃতপক্ষে এই জঙ্গী মনোভাবই এক পর্যায়ে উন্নীত হয় যুক্তরাষ্ট্রের সেমি-অফিসিয়াল মতবাদে। *ফরেইন এ্যাফেয়ার্স* শীত ১৯৮০-৮১ সংখ্যায় রবার্ট ডব্লিউ থুকার "দি পারপাস অব আমেরিকান পাওয়ার" শিরোনামে দাবী করেন তিনি "পুনর্জাগ্রত আমেরিকা" ও "বিচ্ছিন্নতা নীতির" মাঝ বরাবর একটা নতুন পথ খুঁজে পেয়েছেন। কিন্তু তিনি উপসাগরীয় অঞ্চলে সরাসরি হস্তক্ষেপের নীতিকেই সমর্থন করেন। কারণ যুক্তরাষ্ট্র ওখানকার আভ্যন্তরীণ বিন্যাসে পরিবর্তন কিংবা সোভিয়েত প্রভাব বিস্তার কোনোটাকেই 'অনুমোদন' করতে পারে না। উভয় ক্ষেত্রে যুক্তরাষ্ট্রকেই নির্ধারণ করতে হবে অনুমোদনযোগ্য ও অনুমোদন-অযোগ্য পরিবর্তনের লক্ষণ কি। থুকারের সমমনা সহকর্মী হার্ভার্ডের রিচার্ড পাইপস পরামর্শ দেন নতুন প্রশাসনের উচিত গোটা পৃথিবীকে সরল দুই ভাগে ভাগ করে নেয়াঃ কমিউনিস্টপন্থী ও কমিউনিস্ট-বিরোধী।

ঠাণ্ডা যুদ্ধে ফেরার মধ্যে যদি এক রকম প্রবল দৃঢ়তা থাকে বলে মনে হয়, তা হলে তা অন্য দিকে ডেকে আনে আত্ম-বিভ্রমের পুনর্জাগরণও। সেক্ষেত্রে যিনিই—অপরাধীর মন নিয়ে না হোক, অন্তত আত্মসচতেনতার প্রয়োজনে— যুক্তরাষ্ট্রকে তার অতীত পুনর্বিবেচনা করতে বলবেন তিনিই গণ্য হবেন শত্রুরূপে। স্রেফ উপেক্ষা করা হবে এ ধরনের লোকদেরকে। ওয়েস্ট পয়েন্টের সংবাদ সম্মেলনে তার প্রমাণ পাওয়া যায়। এতে অংশগ্রহণকারীদের একজন ঘোষণা করেন যে, যেহেতু রেজা শাহ পাহলভীর শাসনামলে ভিন্ন মতাবলম্বী ইরানীদের ওপর নির্যাতনে যুক্তরাষ্ট্র উৎসাহ দিয়েছে, তাই এখন যুক্তরাষ্ট্রে পক্ষ থেকে নির্যাতনের অভিযোগ তোলা ভণ্ডামি মাত্র। এ প্রশ্নের মুখে তেহরানে প্রবীণ মার্কিন কূটনৈতিক ও চার্জ দ্য এ্যাফেয়ার্স দুই দুই বার বলেন তিনি প্রশ্নটি বুঝতে পারেননিঃ অতপর তিনি তড়িঘড়ি করে তুলে আনেন ইরানীদের বর্বরতা ও মার্কিন বীরত্বের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ অন্য একটি প্রসঙ্গ।

বিশেষজ্ঞ, প্রচার মাধ্যমের লোকজন, কিংবা সরকারী কর্মকর্তারা একবারও ভেবে দেখেননি যে, অন্যায়ভাবে দূতাবাস দখল ও জিম্মি প্রত্যাবর্তনের বিষয়টিকে বিচ্ছিন্ন, নাটকীয় ও অমানবিক রূপে প্রচার করার জন্য যতটা সময় ব্যয় করা হয়েছে তার ক্ষুদ্র এক অংশেও যদি শাহ-আমলের পাশবিক দমন-নির্যাতন বর্ণনা করা হতো তা হলে কি

www.pathagar.com

ঘটতো। যথার্থই উদ্বিগ্ন আমেরিকানদের ইরানের প্রকৃত ঘটনা অবহিত করার জন্য তথ্য-সংগ্রাহক যন্ত্রগুলো ব্যবহারের ধারণাটির কি কোনো সীমা চিহ্নিত করা হয় নাই? কেবল দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ করা কিংবা উন্মাদ ইরানের প্রতি মানুষের ক্রোধ জাগিয়ে তোলা ছাড়া আর কোনো বিকল্পও কি ছিলো না?

এগুলো বেকার প্রশ্ন নয়। দুঃখজনকভাবে ফুলানো-ফাঁপানো সেই অধ্যায়ের অবসান হয়েছে। পরিবর্তনশীল নতুন বিশ্ব-বিন্যাসের জটিলতাগুলোর সমাধান অর্জন পশ্চিমাদের জন্য, বিশেষ করে আমেরিকানদের জন্য উপকারী ও বাস্তব কাজ। "ইসলাম" কি কেবলই সন্ত্রাসী তেল-সরবরাহকারীদের মধ্যে সীমাবদ্ধ হতে যাচ্ছে? "কে ইরানকে হারিয়ে ফেললো" কেবল এই বিষয়েই জার্নালগুলোর দৃষ্টি নিবদ্ধ থাকবে, নাকি বিশ্ব সম্প্রদায় ও শান্তিদায়ী উন্নয়নের সাথে অধিকতর সম্পর্কিত বিষয়গুলো নিয়ে বিতর্ক ও আলোচনা-সমালোচনার সূচনা করবে?

দায়িত্ববোধের সাথে জনগণকে তথ্য সরবরাহে প্রচার মাধ্যম কতটা সক্ষম তার প্রমাণ ১৯৮১ সালের জানুয়ারী ২২ ও ২৮ তারিখে প্রচারিত এবিসির তিনঘন্টার বিশেষ অনুষ্ঠান "গোপন আলোচনা"। জিম্মি উদ্ধারে ব্যবহৃত কিছু প্রক্রিয়া প্রকাশ করা হয় অনুষ্ঠানটিতে। এ ছাড়াও এতে এমন কিছু অজানা তথ্য পরিবেশন করা হয় যার ক্ষুদ্র একটা অংশও ঐসব মুহূর্তের চেয়ে অনেক বেশি কিছু বলে, যে-সব মুহূর্তে আচমকা উন্মোচিত হয়ে পড়ে বিভিন্ন অসচেতন ও বদ্ধমূল ধারণা। এমনই একটা মুহূর্ত হলো যখন খ্রিস্টিয়ান বোরগুয়েত বর্ননা করেন ১৯৮০ সালের শেষ মার্চে হোয়াইট হাউসে কার্টারের সাথে অনুষ্ঠিত তার বৈঠকের কথা। ফরাসি উকিল বোরগুয়েত ইরান ও যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে মধ্যস্থতাকারীর ভূমিকা পালন করছিলেন। তিনি ওয়াশিংটনে যান। কারণ প্রাক্তন শাহকে গ্রেফতার করার ব্যাপারে পানামিয়ানদের সাথে কথাবার্তা চূড়ান্ত হওয়ার পর হঠাৎ মিশরে পাড়ি জমান ক্ষমতাচ্যুত রেজা শাহ। ফলে আলোচকরা আবার সেই শুরুর জায়গায় এসে দাঁড়ান:

> বোরগুয়েত: একটা বিশেষ মুহূর্তে জিম্মিদের কথা উল্লেখ করেন (কার্টার), বলেন- আপনি বুঝতে পারছেন যে, এরা আমেরিকান। এরা নিরপরাধ। আমি তাকে বললাম, হ্যাঁ মি. প্রেসিডেন্ট! আমি বুঝতে পারছি যে, আপনি বলছেন ওরা নিরপরাধ। তবে আমার বিশ্বাস আপনিও বুঝবেন ইরানীদের কাছে ওরা নিরপরাধ নয়। এমনকি ব্যক্তিগতভাবে ওরা কিছুই করেনি, কিন্তু রাজনৈতিকভাবে এমন এক দেশের প্রতিনিধিত্ব করে, যে দেশটি বেশ কিছু কাণ্ড ঘটিয়েছে ইরানে।
>
> আপনি বুঝবেন যে, তাদের ব্যক্তি-অস্তিত্বের বিরুদ্ধে কোনো তৎপরতা সংঘটিত হয়নি। আপনি নিজেই তা দেখতে পারেন। ওদের কোনো ক্ষতি করা হয়নি, ওদেরকে আঘাত করা হয়নি, হত্যা করার চেষ্টা হয়নি। আপনি নিশ্চয় বুঝতে পারবেন এ হচ্ছে প্রতীক, প্রতীকের সমান্তরালে দাঁড়িয়ে ঘটনাটি নিয়ে ভাবতে হবে আপনাকে। উদ্ধৃত অংশটি এবিসি, নিউইয়র্কের ভেরোনিকা পোলার্ডের সৌজন্যে প্রাপ্ত।

www.pathagar.com

কার্টার নিজেও হয়তো দূতাবাস দখলের ব্যাপারটিকে প্রতীক হিসেবেই দেখেছেন। কিন্তু তার ছিলো নিজস্ব তথ্য-সংযোগ-কাঠামো, ফরাসি ভদ্রলোকের থেকে আরেক রকম। তার কাছে আমেরিকানরা নিরপরাধী এবং এক অর্থে ইতিহাসের বাইরে : অন্য এক জায়গায় তিনি বলেন, যুক্তরাষ্ট্রের দুর্দশার কারণস্বরূপ ইরানী তৎপরতা এক প্রাচীন ইতিহাস। আর এখন গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার হচ্ছে ইরান সন্ত্রাসী, হয়তো চিরকালই ছিলো সন্ত্রাসী রাষ্ট্র। যে-ই আমেরিকাকে অপছন্দ করে এবং আমেরিকানদের জিম্মি করে সে-ই বিপদজনক, অসুস্থ, অযৌক্তিক, মানবতার বাইরে, সাধারণ ভব্যতারও বাইরের মানুষ।

কিছু বিদেশী ব্যক্তিত্ব বুঝতে পেরেছিলেন যে, স্থানীয় স্বৈর-শাসকদের প্রতি যুক্তরাষ্ট্রের দীর্ঘকালীন সমর্থনের সাথে সম্পর্ক আছে জিম্মি সঙ্কটের। কিন্তু কার্টার যে তা বুঝতে অক্ষম তা পূর্বাভাসের মত। কেউ হয়তো জিম্মি-ঘটনার বিরোধিতা করতে পারেন, জিম্মিদের প্রত্যাবর্তনের ব্যাপারে ইতিবাচক অনুভূতি পোষণ করতে পারেন; কিন্তু এই ঘটনা থেকে—বিশেষ করে নির্দিষ্ট কিছু বাস্তব ব্যাপার চাপা দেয়ার জাতীয় সরকারী প্রবণতা থেকে তারও কিছু শেখার আছে। মানুষ ও জাতিসমূহের সম্পর্কের দুটো দিক রয়েছে। "ওদেরকে" পছন্দ বা গ্রহণ করার ব্যাপারে আমাদেরকে কোনোকিছু নির্দেশ দেয় না, নিষেধও করে না। কিন্তু আমাদের মনে রাখতে হবে : (ক) ওরা ওখানে আছে এবং (খ) ওদের জড়িত থাকার সাপেক্ষে, আমরা তা-ই আমরা আসলে যা, এবং আমরা তা-ও ওরা যেভাবে আমাদেরকে দেখে ও আমাদের সম্পর্কে অভিজ্ঞতা অর্জন করে। এটা নিষ্পাপ হওয়া বা অপরাধী হওয়া না হওয়ার ব্যাপার নয়। অথবা দেশপ্রেম ও বিশ্বাসঘাতকতার ব্যাপারও নয়। বাস্তবের ওপর কোনো একটা দিকেরও এমন পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ নেই যে অন্য দিকটাকে বাদ দেয়া যাবে। অবশ্য আমরা আমেরিকানরা বিশ্বাস করি অন্য দিকটা যেহেতু তত্ত্বগতভাবে দোষী, তাই আমরা নিষ্পাপ।

প্রচার মাধ্যমের পরিবেশিত আরেকটা দৃষ্টান্ত বিবেচনা করা যাক : ১৯৭৯ সালের ১৩ই আগষ্ট তেহরান থেকে ক্রস লেইনজেন কর্তৃক সেক্রেটারী ভ্যান্সকে পাঠানো তারবার্তা। বোরগুয়েতের সাথে আলোচনায় কার্টার যে মনোভাব দেখান তার সাথে খুবই সঙ্গতিপূর্ণ এই তারবার্তাটি প্রকাশিত হয় ১৯৮১ সালের জানুয়ারীর ২৭ তারিখের *নিউইয়র্ক টাইমসে*। হয়তো এর উদ্দেশ্য ছিলো ইরান কি জিনিষ তা বোঝার ব্যাপারে জাতিকে সহায়তা করা, অথবা হয়তো সদ্য-শেষ সঙ্কট সম্পর্কে একটা তেছরা কথা সামনে নিয়ে আসা। প্রশান্ত বিষয়মুখিতা ও সংস্কৃতি সম্পর্কে বিশেষজ্ঞ জ্ঞান ধারণের ভাণ করা হয়েছে তারবার্তাটিতে। তবু, ইরানী মনস্তত্ত্ব সম্পর্কে কোনো বৈজ্ঞানিক বিবরণ নয় এটি। এটি মূলত একটি ভাবাদর্শিক বিবৃতি। আমার ধারণা এ পরিকল্পনার উদ্দেশ্য "পারস্য"কে সময়াতীত, খুবই বিরক্তিকর এক সত্তারূপে দাঁড় করানো, যাতে দ্বিপাক্ষিক আলোচনার মার্কিন অর্ধেক অর্থাৎ মার্কিন অংশটির জাতীয় সুস্থতা ও নৈতিক শ্রেষ্ঠত্ব আরো বাড়ে। এভাবে "পারসি"দের সম্পর্কে প্রতিটি ঘোষণা ক্ষতিকর প্রমাণরূপে যুক্ত হয় পারস্যের ভাবমূর্তিতে; অন্যদিকে পরীক্ষণ ও বিশ্লেষণ থেকে আড়াল করে রাখে আমেরিকাকে।

www.pathagar.com

এই যে স্বেচ্ছা-অন্ধত্ব, তা সাজানো ভাষায় অর্জিত হয় দুইভাবে; এগুলোকে পরীক্ষা করা দরকার। প্রথমে, ইতিহাসকে নিজে নিজেই দূর করে দেয়া। "ইরানী বিপ্লবের প্রভাব" সরিয়ে রাখা হয় "পারসিয়ান আত্মার" তলে তলে "তুলনামূলকভাবে স্থির... সাংস্কৃতিক ও মনস্তাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্যগুলোর স্বার্থে"। ফলে আধুনিক ইরান হয়ে ওঠে কালোত্তীর্ণ পারস্য। এধরনের অবৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়ায় ইতালীয়রা হয় দাগোজ, ইহুদিরা ইয়াইদ, কালো মানুষেরা নিগার, ইত্যাদি। (ভদ্র কূটনৈতিকদের তুলনায় রাস্তার দাঙ্গাবাজরা কেমন উজ্জীবক!) দ্বিতীয়ত, ইরানীদের কল্পনা-নির্ভর বাস্তববোধের (প্যারানয়েডের) সাথে মিলিয়ে অঙ্কিত হয়"পারসিয়ান" জাতীয় চরিত্র। বিশ্বাসঘাতকতা ও দুর্ভোগের অভিজ্ঞতার জন্য ইরানীদের কোনো কৃতিত্ব দেন না লেইনজেন, তেমনি ইরানে যুক্তরাষ্ট্র যা করেছে তার বিচারে যুক্তরাষ্ট্রকে বোঝার অধিকারও ইরানীদেরকে মঞ্জুর করেন না। এর অর্থ এই নয় যে যুক্তরাষ্ট্র ইরানে কিছুই করে নাই; এর অর্থ হলো যা ইচ্ছা তা-ই করার অধিকার আছে যুক্তরাষ্ট্রের; এ ব্যাপারে অপ্রাসঙ্গিক অভিযোগ ও প্রতিক্রিয়া করতে পারবে না ইরানের মানুষ। লেইনজেনের নিকট একমাত্র গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার হলো পারসিয়ান আত্মা, যা মাড়িয়ে যায় সব ধরনের বাস্তবতাকে।

লেইনজেনের মতই তার বার্তাটির পাঠকরাও হয়তো একটা বিষয় উপেক্ষা করে যাবেন যে, অন্য মানুষ বা সমাজকে এভাবে একটি মূল ছাঁচে ছোটো করে আনা অনুচিত। গণ-জ্ঞানভাষ্যে কালো ও ইহুদিদেরকে এভাবে ছোটো করার ব্যাপারটি আমরা আজকাল মেনে নিই না; তেমনি ইরান কর্তৃক আমেরিকাকে মহা-শয়তান রূপে চিত্রিত করার চেষ্টাকেও হেসে উড়িয়ে দিই। খুব বেশি সরল, খুব ভাবাদর্শিক, প্রচণ্ড বর্ণবাদী! কিন্তু "পারসিয়া" নামের ঐ শত্রুর বেলায় ছোটো করার কায়দাটা কাজ করে যায়। যেমন সতর শতকে এক ইংরেজ ভদ্রলোক কর্তৃক "তুর্কীদের সম্পর্কে" লেখা বর্ণবাদী একটি গদ্য থেকে একটা পৃষ্ঠা পুনর্লিখন করেন *নিউ রিপাবলিকের* মার্টিন পেরেজ (১৯৮১, ফ্রেব্রুয়ারী ৭)এবং মন্তব্য করেন এটি মধ্যপ্রাচ্যের সংস্কৃতি বিষয়ে অধ্যয়নরত ছাত্রদের জন্য "ধ্রুপদ" জিনিষ। মুসলমানদের আচরণ কি রকম এ গদ্যটি আমাদের জানায়। আজকের "ইহুদিদের: আচরণ জানার জন্য সতর শতকের "ইহুদিদের" সম্পর্কে লেখা একটি গদ্য থেকে এক পৃষ্ঠা তুলে দিলে কেমন লাগতো পেরেজের? পরে আমি বিশ্লেষণ করে দেখাবো লেইনজেন বা পেরেজের লেখার মত জিনিষগুলো ইসলাম বা ইরান সম্পর্কে কিছুই শিখায় না, আবার বিপ্লবোত্তর ইরান ও যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে চলমান পারস্পরিক উত্তেজনার প্রেক্ষিতে ওখানে যুক্তরাষ্ট্রের ভূমিকা কি হওয়া উচিত সে নির্দেশনাও দেয় না। প্রশ্ন হচ্ছে, এ ধরনের দলিলপত্র তাহলে কোন কাজে লাগে?

লেইনজেনের এক কথা : ইরানে যা-ই ঘটে থাকুক "পারসিয়ানদের" স্বাভাবিক ঝোঁক (পশ্চিমের দৃষ্টিকোণ থেকে) "যৌক্তিক আলোচনা প্রক্রিয়ার ধারণায়ই বাধা সৃষ্টি করে। আমরা যৌক্তিক হতে পারি, পারসিয়ানরা পারে না। কেন? তিনি বলেন : কারণ এরা

www.pathagar.com

অসম্ভব অহংবাদী; ওদের বিবেচনায় বাস্তব হলো অশুভ ব্যাপার; "বাজারী মনোভাবের" কারণে দীর্ঘ মেয়াদী লাভের পরিবর্তে ত্বরিৎ পাওয়ার আকাঙ্ক্ষা ওদের; ইসলামের সর্বশক্তিমান আল্লাহ ওদের জন্য ক্ষয়ক্ষতি বোঝার কাজ অসম্ভব করে রেখেছে; ওদের কাছে কথা ও বাস্তবতা পরস্পর সম্পর্কিত নয়। লেইনজেনের বিশ্লেষণ থেকে আহরিত পাঁচটি শিক্ষা অনুযায়ী পারস্যবাসীরা বিশ্বাসঅযোগ্য আলোচক; "অন্য পক্ষ" ব্যাপারটা সম্পর্কে ওদের ধারণাই নেই, বিশ্বাস বা দিচ্ছার ক্ষমতা নেই, নিজের কথা রাখার মত চরিত্রও নেই ওদের।

এই বিনীত প্রস্তাবটির চমৎকার দিক হলো, কোনো প্রমাণ ছাড়াই পারসিয়ান ও মুসলমানদের ওপর আক্ষরিক অর্থে যতগুলো দোষ আরোপ করা হয়েছে তার সব ক'টি আমেরিকানদের জন্য প্রযোজ্য। এই বার্তায় আধা কাল্পনিক বেনামী লেখক মূলত আমেরিকাই। ইতিহাস ও বাস্তবতা পারসিয়ানদের কাছে কিছুই না বলে আমেরিকাই ইতিহাসের বাস্তবতাকে খারিজ করে দিয়েছে। এখন তাহলে এই পার্লার খেলাটি চলুক: লেইনজেনের পারসিয়ান বৈশিষ্ট্যের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ গুরুত্বপূর্ণ কোনো ইহুদি-খ্রিস্টীয় সাংস্কৃতিক-সামাজিক তুলনা খুঁজে দেখা যাক। যেমন, অতিরিক্ত অহংবাদ? -রুশো। বাস্তবকে অশুভ মনে করা?- কাফকা। ঈশ্বর সর্বশক্তিমান?— আদি ও নয়া টেস্টামেন্ট। কার্যকারণ বোধের অভাব?- বেকেট। বাজারী মনোভাব?- নিউইয়র্ক স্টক এক্সচেঞ্জ। শব্দ ও বাস্তবতার দ্বন্দ্ব? - অস্টিন ও সিয়ার্ল। তবে এমন লোক খুব বিরল যে নার্সিসিজম সম্পর্কে ক্রিস্টোফার ল্যাচের বক্তব্য বা মৌলবাদী প্রীস্টের কথাবার্তা, বা প্ল্যাটোর *ক্র্যাটিলাস* কিংবা দুএকটি বিজ্ঞাপনের রুনুঝুনু শব্দ অথবা (সুস্থির ও মঙ্গলজনক বাস্তবতায় বিশ্বাস রাখতে পশ্চিমের অক্ষমতার প্রমাণস্বরূপ) লেভিসাসের কিছু পংক্তির সাথে মেশানো ওভিদের *মেটামরফসিস*- আলোকে পশ্চিমের ভাবমূর্তি নির্মাণের চেষ্টা করেন। লেইনজেনের মেসেজ এমনই এক ভাবমূর্তির মত। এটি অন্য কোনো পরিপ্রেক্ষিতে খুব ভালো কেরিকেচার মনে হতো, আর খারাপ হলেও অত ক্ষতিকর কিছু হয়ে উঠতে পারতো না।

এটি এমনকি মনস্তাত্ত্বিক যুদ্ধেরও উপযোগী নয়। কারণ এতে লেখকের দুর্বলতা তার শত্রুদের দুর্বলতার চেয়েও বেশি প্রকট। যেমন, লেখাটি বোঝায় লেখক বিপরীত পক্ষের সংখ্যার কারণে নার্ভাস; তিনি তার নিজের হুবহু প্রতিফলন ছাড়া আর কিছুই দেখেন না। ইরানী দৃষ্টিকোণ বোঝার এবং তার জন্য ইসলামী বিপ্লব উপলব্ধির ক্ষমতা কই তার, যে দৃষ্টিকোণ থেকে দেখলে বোঝা যাবে অসহনীয় *পারসিয়ান* শাসন-নিপীড়নের প্রত্যক্ষ ফল হিসেবে সে শাসন উৎখাতের জন্যই বিপ্লব সংঘটিত হয়েছিলো। আপোষের আলোচনার যৌক্তিকতার প্রতি বিশ্বাস ও সদিচ্ছার প্রসঙ্গে বলবো, এমনকি ১৯৫৩ সালের ঘটনা বাদ দিলেও, বিপ্লবের বিরুদ্ধে ক্যু ঘটানোর চেষ্টা সম্পর্কে অনেক কথাই বলা যায়; ১৯৭৯ সালের জানুয়ারীর শেষ দিকে মার্কিন জেনারেল হাইসার আর্মি ক্যু'র পরিকল্পনাকে সরাসরি উৎসাহিত করেন। এরপর আছে যুক্তরাষ্টের বিভিন্ন ব্যাংকের কীর্তিকলাপ (যেগুলো শাহ্‌র শাসনামলে তাল

www.pathagar.com

মিলিয়ে বিধি-বিধান পরিবর্তন করে নিতো, খানিকটা অস্বাভাবিকভাবেই)। ১৯৭৯ সালে ব্যাংকগুলো ইরানের সাথে চলমান ঋণচুক্তি বাতিলের উদ্যোগ নেয়; এগুলো স্বাক্ষরিত হয়েছিলো ১৯৭৭ সালে। তাদের অভিযোগ ছিলো ইরান সময় মতো সুদ পরিশোধ করেনি। অথচ *লো মঁদ* পত্রিকার এরিখ রোলো ১৯৭৯ সালের ডিসেম্বরের ২৫-২৬ তারিখের রিপোর্টে উল্লেখ করেন, তিনি প্রমাণ দেখেছেন, সময় হওয়ার আগেই সুদ পরিশোধ করে দিয়েছে ইরান। অবাক হওয়ার কিছু নেই যে, "পারসিয়ান" ধরে নিয়েছে তার বিপরীত সংখ্যাটি শত্রু। লেইনজেন খোলাখুলিই বলেন: তিনি শত্রু এবং নিরাপত্তাহীন।

আমরা বরং স্বীকার করে নিই নিরপক্ষেতা নয়, যাথার্থ্যের প্রশ্ন এটি। ঘটনাস্থলে অবস্থানরত যুক্তরাষ্ট্রের লোকটি পরামর্শ দিচ্ছে ওয়াশিংটনকে। কিসের ওপর নির্ভর করছে সে? গুটিকয় ছাল-ওঠা প্রাচ্যতাত্ত্বিক উক্তি; আলফ্রেড লাইয়ালের প্রাচ্যতাত্ত্বিক সম্পর্কিত লেখা থেকেও এগুলো তুলে দেয়া যেতো, কিংবা মিশরে স্থানীয়দের সাথে কাজ করার ব্যাপারে ক্রোমারের বিবরণ থেকে। লেইনজেনের বক্তব্য অনুযায়ী, তৎকালীন ইরানী পররাষ্ট্রমন্ত্রী ইব্রাহিম ইয়াজদী যদি এধারণার প্রতিবাদ করে থাকেন যে "ইরানের আচরণ যুক্তরাষ্ট্রে ইরানের ভাবমূর্তির ওপর প্রভাব ফেলেছে", তাহলে কোন আমেরিকান নীতি-নির্ধারক এ বক্তব্য আগাম মেনে নিতে প্রস্তুত ছিলেন যে যুক্তরাষ্ট্রের আচরণও ইরানে যুক্তরাষ্ট্রের ভাবমূর্তির ওপর প্রভাব ফেলেছিলো? তা হলে শাহ্‌কে এখানে জায়গা দেয়া হলো কেন? "কারো কৃতকর্মের দায় মেনে নিতে" আমাদেরই বা এত অনীহা কেন, যে প্রবণতা আছে "পারসিয়ানদের"?

লেইনজেনের বার্তাটি আসলে একীভূত বোধহীন ক্ষমতার উৎপাদন; অন্য সমাজকে বোঝার কাজে তা কোনো সহায়তাই করে না। কিভাবে আমরা বিশ্বের মুখোমুখি হবো তার উদাহরণ হিসেবে আমাদের মধ্যে কোনো আত্মবিশ্বাস যোগায় না এ বার্তা। তাহলে কোন কাজে লাগে এই জিনিষ? এটি আমাদেরকে বলে কিভাবে যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিনিধিবৃন্দ ও প্রাচ্যতাত্ত্বিক প্রতিষ্ঠানগুলোর একাংশ মিলে এমন এক বাস্তবতা তৈরি করে যার সাথে না আছে আমাদের জগতের মিল, না ইরানের। কিন্তু এ বার্তা যদি দেখাতে না পারে কিভাবে এ ধারার ভুল প্রতিনিধিত্ব দূরে ছুঁড়ে ফেলাই ভালো, তাহলে আমেরিকানরা আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে আরো সমস্যার মুখোমুখি হবে। এবং আবার বেকার আক্রমণের শিকার হবে ওদের অপরাধহীনতা।

স্বীকার করি ইরান ও যুক্তরাষ্ট্র পরস্পর প্রচণ্ড অপ্রীতিকর অবস্থার মধ্য দিয়ে অগ্রসর হয়েছে, এবং এও স্বীকার করে নিই যে, দূতাবাস দখলের ঘটনাটি ইরানের অনুৎপাদনমুখি, পশ্চাদপদ বিশৃঙ্খলার সূচক। তাহলেও, সমকালীন ইতিহাস থেকে অসম্পূর্ণ জ্ঞানের এঁটো কুড়ানোর দরকার নেই। প্রকৃত সত্য হলো "ইসলাম" এবং "পশ্চিম" উভয়েরই পরিবর্তন চলছে। ভঙ্গি ও পদক্ষেপে ফারাক আছে, কিন্তু উভয়ের বেলাতেই কিছু বিপদ ও অনিশ্চয়তা একইরকম। সমর্থকদের জন্য উচ্চকিত জিকিরে "ইসলাম" ও "পশ্চিম" (বা "আমেরিকা") উভয়েই অন্তর্দৃষ্টির চেয়ে বেশি করে

www.pathagar.com

সরবরাহ করে উত্তেজনা। নয়া বাস্তবতায় পরিপার্শ্বকে চিনতে না পারার ঘোর থেকে সৃষ্ট প্রতিক্রিয়ায় "ইসলাম" ও "পশ্চিম" তাদের বিশ্লেষণকে পরিণত করতে পারে সরল বিতর্কে, কল্পজাগতিক অভিজ্ঞতায়। মুখোমুখি দ্বন্দ্ব ও সঙ্কোচক শত্রুতার চেয়ে মানবীয় অভিজ্ঞতার খুঁটিনাটির প্রতি শ্রদ্ধা, অন্যকে সহানুভূতির সাথে দেখার মধ্য দিয়ে জেগে ওঠা উপলব্ধি ক্ষমতা, নৈতিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক সততার মধ্য দিয়ে পাওয়া ও ছড়িয়ে দেয়া জ্ঞান— এগুলো যদিও কঠিন, তবু উৎকৃষ্ট লক্ষ্য। এবং এই প্রক্রিয়ায় যদি আমরা "মুসলিম", "পারসিয়ান", "তুর্কি", "আরব", বা "পশ্চিমা" ইত্যাদি লেবেলগুলোর আক্রমণাত্মক সামগ্রিকতা ও অস্বাভাবিক বিদ্বেষ মুছে ফেলতে পারি তাহলেই ভালো।

ই. ডব্লিউ. এস.
ফেব্রুয়ারি ৯, ১৯৮১
নিউইয়র্ক।

www.pathagar.com

প্রথম অধ্যায় :

সংবাদ হিসেবে ইসলাম

www.pathagar.com

www.pathagar.com

ইসলাম ও পশ্চিম

আমেরিকানদের জন্য জ্বালানীর বিকল্প উৎস খোঁজার পক্ষে যুক্তি প্রদর্শনের উদ্দেশ্যে নিউইয়র্কের কনসলিডেটেড এডিসন (কন এড) একটি টিভি বিজ্ঞাপন প্রচার করে ১৯৮০ সালের গ্রীষ্মে। বিজ্ঞাপনটি ছিলো চিন্তায় ধাক্কা দেয়ার মত। ওপেকের বিভিন্ন নেতৃবৃন্দ যেমন ইয়ামেনী, গাদ্দাফী, এবং কমপরিচিত, আলখাল্লা গায়ে আরব ব্যক্তিত্বের টুকরো টুকরো ফিল্ম দেখানো হয় বিজ্ঞাপনটিতে। এর ফাঁকে ফাঁকে থাকে তেল ও ইসলামের সাথে জড়িত আরো কিছু আরব নেতার চলচ্চিত্র ও স্থিরচিত্র; যেমন- খোমেনী, আরাফাত, হাফেজ আল আসাদ। চলচ্চিত্র ও স্থিরচিত্রগুলো এমন যে, দেখামাত্র প্রত্যেকটি লোককে চেনা যায়। কারো নাম নেয়া হয় না। অথচ আমরা বুঝে যাই এই লোকগুলোই নিয়ন্ত্রণ করছে মার্কিন তেলের উৎস। ব্যাকগ্রাউন্ডের গুরুগম্ভীর কণ্ঠস্বর উল্লেখ করে না এরা কারা, কোত্থেকে এসেছে; বরং দর্শকদেরকে এমন অনুভূতির দিকে ছেড়ে দেয় যে, এই পুরুষ শয়তানের দলই আমেরিকাকে ঠেলে দিয়েছে অনিয়ন্ত্রিত ধর্ষকামের মধ্যে। 'এইসব লোকদের' জন্য কেবল টিভির পর্দায় ভেসে ওঠাই যথেষ্ট, যেমন ওরা সংবাদপত্র ও টিভিতে উপস্থিত হয় বাণিজ্যিক স্বার্থে মার্কিন দর্শকদের মনে ক্ষোভ, অসন্তোষ, ভয় ঢুকিয়ে দেয়ার জন্য। ঠিক এই মিশ্রিত অনভূতিটা জাগাতে চেয়েছে কনএড। আভ্যন্তরীণ নীতি বিষয়ে প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট কার্টারের তৎকালীন উপদেষ্টা স্টুয়ার্ট আইজেনস্ট্যাটও এক বছর আগে প্রেসিডেন্টকে পরামর্শ দিয়েছিলেন "দৃঢ় কর্মসূচী নিয়ে প্রকৃত একটি সংকটকে কেন্দ্র করে সুনির্দিষ্ট শত্রু ওপেক-এর দিকে গোটা জাতিকে জাগিয়ে তোলার।" এই আইজেনস্ট্যাট এখন ক্লিনটন প্রশাসনের উঁচু পদে আসীন।

কনএডের বিজ্ঞাপনটির দুটো দিক এক করে আমার এই বইয়ের বিষয় গঠিত। এর একটি হচ্ছে সাধারণভাবে পশ্চিমে, বিশেষ করে যুক্তরাষ্ট্রে ইসলাম বা ইসলামের ভাবমূর্তি। দ্বিতীয়টি হলো পশ্চিমে, বিশেষত যুক্তরাষ্ট্রে "ইসলাম"-এর ব্যবহার। আমরা দেখবো এই দুই দিক যে-উপায়ে পরস্পর সম্পর্কিত তা একদিকে পশ্চিম ও যুক্তরাষ্ট্র সম্পর্কে অনেক কিছু ফাঁস করে দেয়, অন্যদিকে তা ইসলাম সম্পর্কেও অনেক কথা পরিষ্কার আলোয় নিয়ে আসে— অবশ্য আরো মজার ও হালকা কায়দায়।

অন্তত আঠারো শতকের শেষ থেকে আমাদের কাল পর্যন্ত ইসলামের প্রতি পাশ্চাত্যের প্রতিক্রিয়া পরিচালিত হয়েছে চরম সরল চিন্তাধারায়, যে-চিন্তাধারাকে বলা যায় 'প্রাচ্যতাত্ত্বিক'। প্রাচ্যতাত্ত্বিক ভাবনার ভিত্তি হলো পৃথিবীকে কল্পনায় অসম দুই ভাগে বিভক্তকারী তীব্র দ্বিমেরুকেন্দ্রিক ভূগোল। 'ভিন্ন ধরনের' বড় অংশটার নাম 'প্রাচ্য';

www.pathagar.com

'আমাদের' বলে পরিচিত অন্য অংশটিকে বলা হয় পাশ্চাত্য বা পশ্চিম।[১] কোনো সমাজ বা সংস্কৃতি যখন তার থেকে অন্যরকম কোনো সমাজ ও সংস্কৃতি সম্পর্কে চিন্তা করে তখনই এমন ভাগাভাগির বোধ সৃষ্টি হয়। মজার ব্যাপার হলো প্রাচ্যকে যখন পুরোপুরি নিকৃষ্ট রূপেও কল্পনা করা হয়েছে, তখনও প্রাচ্যকে মনে করা হয়েছে পশ্চিমের তুলনায় বড় বেশি শক্তির সম্ভাবনাময় (সচরাচর ধ্বংসাত্মক শক্তি)। এ যাবত প্রাচ্যের জিনিষ বলেই ভাবা হয় ইসলামকে। তাই ইসলামকে প্রথমেই প্রাচ্যতত্ত্বের সামগ্রিক কাঠামোর সাথে জড়িয়ে বিদ্বেষ ও ভয়ের সাথে আদিম ব্যাপার হিসেবে দেখার রীতি পরিণত হয় ইসলামের নিয়তিতে। অবশ্য এর অনেক ধর্মীয়, মনস্তাত্ত্বিক ও রাজনৈতিক কারণও আছে। কিন্তু এসব কারণের পেছনেও রয়েছে এই রকম বোধ যে, ইসলাম কেবল পশ্চিমের প্রতিদ্বন্দ্বীই নয়, বিলম্বে উদ্ভূত চ্যালেঞ্জও।

প্রায় গোটা মধ্যযুগ এবং ইউরোপে রেঁনেসাসের প্রথম দিকে মনে করা হতো ইসলাম স্বধর্মত্যাগী, ঈশ্বরনিন্দুক, অস্পষ্ট শয়তানী ধর্ম[২]। মুসলমানরা যে মোহাম্মদকে খোদা নয়, নবী মনে করে তা যেন কোনো ব্যাপারই নয়। খ্রিস্টানদের কাছে গুরুত্বপূর্ণ কথা হলো মোহাম্মদ ভণ্ড নবী, মতভেদের বীজরোপক, ইন্দ্রিয়পরায়ণ, ভাণকারী, শয়তানের প্রতিনিধি। এমন নয় যে এইসব ধারণা মতবাদে পরিণত হয়েছে। বাস্তব পৃথিবীতে বাস্তব ঘটনাবলী ইসলাম থেকে সৃষ্টি করে যথেষ্ট বেগবান এক রাজনৈতিক শক্তি। ইসলামী সেনা ও নৌবাহিনী শত শত বছর ধরে ইউরোপকে হুমকির ওপর রাখে, এর সীমানা ঘাঁটিগুলো ধ্বংস করে ফেলে, উপনিবেশ বানায় ইউরোপের দখলাধীন এলাকায়। এ যেন প্রাচ্যে খ্রিস্ট ধর্মেরই কমবয়সী, আরো পৌরুষময় ও শক্তিশালী এক সংস্করণের উত্থান; প্রাচীন গ্রীকশিক্ষায় সমৃদ্ধ, সহজ, নির্ভিক, তেজোদীপ্ত যুদ্ধংদেহী এই ধর্ম যেন খ্রিস্টধর্মকে ধ্বংস করতে উদ্যত। পরবর্তী কালে ইসলামের পতন এবং ইউরোপের উত্থান সূচিত হলেও 'মোহামেডানিজম'-এর ভয় থেকেই যায়। অন্য যে কোনো ধর্মের তুলনায় নিকটবর্তী ইসলাম তার নৈকট্যের কারণেই ইউরোপের মনে জাগরূক রাখে ইউরোপের ওপর ইসলামের চড়াও হওয়ার স্মৃতি। এর প্রচ্ছন্ন ক্ষমতা সবসময়ই বিচলিত করে ইউরোপকে। প্রাচ্যের অন্যান্য সভ্যতা, যেমন চীন ও ভারতকে পরাজিত ও দূরবর্তী বিবেচনা করা সম্ভব ছিলো। তাই এরা সার্বক্ষণিক দুশ্চিন্তা হয়ে ওঠেনি। কেবল ইসলামকেই মনে হয় যেন কখনই পশ্চিমের কাছে পুরোপুরি নুয়ে পড়ছে না। ১৯৭০ সালের শুরুতে তেলের দাম দপ করে ওঠে যাওয়ার পর মনে হয় ইসলাম তার আগের বিজয়-গর্বিত দিনে প্রত্যাবর্তনের কাছাকাছি দাড়িয়ে। যেন কেঁপে ওঠে গোটা পশ্চিম। এ আঘাত আরো গভীর ও তীব্র হয় ১৯৮০ ও ১৯৯০-এর দশকে "ইসলামী সন্ত্রাসী তৎপরতা"র কারণে।

সেই সময় মঞ্চের কেন্দ্র জুড়ে ভেসে ওঠে ইরান। দিন দিন তীব্র উদ্বেগ ও আবেগে আক্রান্ত হতে বাধ্য করে যুক্তরাষ্ট্রকে। অত দূরবর্তী ও ভিন্ন স্বভাবের খুব কম জাতিই যুক্তরাষ্ট্রকে অতটা ব্যস্তসমস্ত রাখতে পেরেছে, যা করেছে ইরান। চোখের সামনে একটার পর একটা নাটকীয় ঘটনা থামানোর প্রচেষ্টায় আর কখনো অত শক্তিহীন, অত

www.pathagar.com

অসাড় মনে হয়নি যুক্তরাষ্ট্রকে। এতসবের মধ্যেও আমেরিকানরা ইরানকে কখনো ভাবনা থেকে বের করতে পারেনি। জ্বালানী সংকটের সময় ইরান ছিলো সবচেয়ে বড় সরবরাহকারী। সামগ্রিকভাবে উত্তেজনাপূর্ণ ও কৌশলগতভাবে গুরুত্বপূর্ণ মনে হয় এমন এক অঞ্চলে দেশটির অবস্থান। বিপ্লবের বছর আমেরিকা তার এই সাম্রাজ্যবাদী দোসরকে হারায়, বিশ্বরাজনীতির হিসেব-নিকেশে এর সেনাবাহিনী, এর অবস্থানগত মূল্য সবই হাতছাড়া হয়ে যায়। আর সে বিপ্লব বিস্তারে ও বেগে ছাড়িয়ে যায় ১৯১৭ সালের অক্টোবর বিপ্লব পরবর্তী সকল গণঅভ্যুত্থানকে। তখন নতুন এক রকম বিন্যাস জন্ম নেয়ার কসরতে ব্যস্ত, যা নিজেই নিজেকে 'ইসলামী' বলে ঘোষণা দেয়, জনপ্রিয় হয়ে ওঠে সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী মতবাদ হিসেবে। প্রচার মাধ্যম জুড়ে চলে আসে আয়াতুল্লাহ খোমেনীর ভাবমূর্তি ও উপস্থিতি। কিন্তু তাকে ঠিকমতো উপস্থাপন করতে ব্যর্থ হয় প্রচার মাধ্যম। তাকে দেখানো হয় কেবল দুর্দম, ক্ষমতাশালী এক মানুষ হিসেবে, যুক্তরাষ্ট্রের প্রতি যার প্রবল ক্রোধ। সবশেষে, ১৯৭৯ সালের ২২শে অক্টোবর ইরানের প্রাক্তন শাহ আমেরিকায় পালানোর পর প্রতিক্রিয়া হিসেবে একদল ছাত্র দখল করে নেয় তেহরানের মার্কিন দূতাবাস। অবরুদ্ধ আমেরিকানরা ছাড়া পায় বহু মাস পর।

ইরানে যা ঘটে তার প্রতিক্রিয়া শূন্যে শেষ হয়ে যায় না। গণ-মানসের মগ্ন চৈতন্যে ছিলো আরব ও প্রাচ্যের প্রতি বিশেষ এক মনোভাব, যাকে আমি বলেছি প্রাচ্যতত্ত্ব। সাম্প্রতিক কাজকর্ম, যেমন ভি.এস. নাইপলের *'বেন্ড ইন দি রিভার'*, জন আপডাইকের *দ্য ক্যু*-এর কথাই ধরা যাক, কিংবা স্কুলের টেক্সট বই, কমিক, টিভি সিরিয়াল ইত্যাদির কথা বিবেচনা করা যাক। দেখা যাবে ইসলামের বিশেষ এক মূর্তি সাদৃশ্যপূর্ণভাবে আঁকা, সবখানে ছড়ানো। আর এগুলোর মালামাল সংগৃহীত হয়েছে একই কালপর্বে, ইসলামের প্রতি লালিত মনোভাব থেকে: অর্থাৎ তেল-সরবরাহকারী মুসলমানের বহু-প্রচারিত ক্যারিকেচার, সন্ত্রাসী চেহারা এবং সম্প্রতি নির্মিত রক্তপিপাসু খুনির ভাবমূর্তি থেকে। অন্যদিকে, সামগ্রিকভাবে সংস্কৃতিতে—বিশেষ করে অ-পশ্চিমাদের বিষয়ে জ্ঞানভাষ্যে—সহানুভূতির সাথে ইসলামের ভাবমূর্তি নির্মাণ তো দূরের কথা, কিছু বলার বা চিন্তার সুযোগও নেই। যদি জিজ্ঞাসা করা হয় একজন ইসলামী লেখকের নাম বলেন, বহু লোক একবাক্যে বলবে খলিল জিবরান (যদিও তিনি ইসলামী লেখক নন)। ইসলাম বিষয়ক বিদ্যায়তনিক বিশেষজ্ঞরা এ ধর্ম ও সংস্কৃতিকে বিবেচনা করে নির্ধারিত মতবাদগত পরিকাঠামোর মধ্যে। সেই পরিকাঠামোটি আবেগ, আত্মরক্ষামূলক ডাঁটফাট, কখনো কখনো উদোর পিণ্ডি বুদোর ঘাড়ে ঢেলে দেয়ার ঘটনায় পরিপূর্ণ; চিন্তার এই পরিকাঠামোর কারণে ইসলামকে বোঝার কাজটি এক দুরূহ ব্যাপারে পরিণত হয়েছে। ১৯৭৯ সালের বসন্তে ইরানী বিপ্লবের সময় প্রচারিত সিরিয়াস প্রতিবেদনগুলোয় দেখা যায় ইরানের বিপ্লবকে যুক্তরাষ্ট্রের পরাজয় (যা কেবল এক নির্দিষ্ট অর্থে সত্য) কিংবা আলোর ওপর অন্ধকারের বিজয় ছাড়া আর কিছু মনে করার বিন্দুমাত্র প্রবণতা নেই।

১৯৯০-এর দশকেও যুক্তরাষ্ট্রের ভাবনা জুড়ে থেকে যায় ইরান। স্নায়ুযুদ্ধ শেষ হওয়ার পর এই দেশটি এবং এর সাথে "ইসলাম" পরিণত হয় আমেরিকার এক নম্বর

www.pathagar.com

ভিনদেশী শয়তানে। কারণ তা দক্ষিণ লেবাননে হিজবুল্লাহর মত সংগঠনকে মদদ দেয়। ইসরাইল দক্ষিণ লেবাননের এক অংশ দখল করে নেয়ার পর অবৈধ ইসরাইলী দখলদারিত্ব উচ্ছেদের জন্য হিজবুল্লাহর জন্ম। ইরানকে মনে করা হয় মৌলবাদ সরবরাহকারী। সবচেয়ে বড় কথা মধ্যপ্রাচ্যে, বিশেষ করে উপসাগরীয় অঞ্চলে মার্কিন আধিপত্যে ইরানের অনমনীয় বিরোধিতায় একরকম ভয় দেখা দেয় যুক্তরাষ্ট্রের মনে। ১৯৯১ সালের জানুয়ারীর ২৬ তারিখে প্রকাশিত একটি কলামে *লস এঞ্জেলেস টাইমসের* প্রধান ইসলাম বিশেষজ্ঞ রবিন রাইট লেখেন যুক্তরাষ্ট্রের এবং পশ্চিমের কর্মকর্তার এখনো চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় যুৎসই কৌশল নির্ধারণের চেষ্টা করছেন। বুশ প্রশাসনের কোনো এক প্রধানতম কর্মকর্তাকে উদ্ধৃত করে তিনি লেখেন যে, ওরা স্বীকার করেন "তিরিশ-চল্লিশ বছর আগে কমিউনিজমকে মোকাবিলার তুলনায় ইসলামকে মোকাবেলার ক্ষেত্রে আরো চতুর হতে হবে তাদেরকে।" সহজভাবে অসংখ্য দেশকে একত্রিত করে ফেলার বিপদের কথাটাও তিনি বলেন। তবে পাঁচ কলামের লেখায় থাকে কেবল আয়াতুল্লাহ খোমেনির ছবি। ইসলামের যা কিছু আপত্তিকর তার সবই যেন মূর্ত হয়ে উঠে খোমেনি ও ইরানের মধ্যে: সন্ত্রাস ও পশ্চিম-বিরোধিতা, কিংবা "এমন একমাত্র একেশ্বরবাদী জাতি" হয়ে ওঠা "যা সমাজ পরিচালনার জন্য প্রস্তাব করে একরাশ রীতিনীতি এবং তুলে ধরে একগুচ্ছ আধ্যাত্মিক বিশ্বাস"। রীতিনীতিগুলো আসলে কি এবং "ইসলামই" বা কি তা নিয়ে তখন খোদ ইরানে উত্তপ্ত বিতর্ক চলছে, প্রশ্ন উঠছে খোমেনির অবস্থান নিয়েও। তার কিছুই উল্লেখ করা হয় না রবিনের কলামে। যেন বিশ্বব্যাপী যে-বিষয়টি নিয়ে "আমাদের" দুশ্চিন্তা সেটাকে কেবল "ইসলাম" শব্দটি দিয়ে নির্দেশ করাই যথেষ্ট। পরিস্থিতি উস্কে দেয়ার জন্য নতুন আইন পাশ করে ক্লিনটন প্রশাসন: যে-সব দেশ ইরানের সাথে (তেমনি, লিবিয়া ও কিউবার সাথে) ব্যবসা করবে, তাদেরকে শাস্তি দেয়া হবে।

ইসলামের প্রতি এই সাধারণ শত্রুতা আরো পরিষ্কার করার ক্ষেত্রে বেশ মজার ভূমিকা রেখেছেন ভি. এস. নাইপল। *নিউজ উইক ইন্টারন্যাশনালকে* দেয়া এক সাক্ষাৎকারে (আগস্ট ১৮, ১৯৮০) তিনি জানান ইসলাম সম্পর্কে একটি বই লিখছেন তিনি। তারপর নিজ থেকেই মন্তব্য করেন, "মুসলিম মৌলবাদে বুদ্ধিবৃত্তিক সারবত্তা কিছু নাই, তাই এটি নিশ্চিত ব্যর্থ হবে।" নাইপল উল্লেখ করেননি কোন মুসলিম মৌলবাদের কথা বলেছেন তিনি, আর কেমন বুদ্ধিবৃত্তিক সারবত্তার প্রসঙ্গ ছিলো তার মনে। নিঃসন্দেহে ইরানকেই ইঙ্গিত করা হয়েছে। তবে তাও অস্পষ্ট ধারণা। তেমনি ইরানের মত তৃতীয় বিশ্বের সাম্রাজবাদ-বিরোধী আন্দোলনের কথাও বলা হয়েছে। সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী ইসলামী আন্দোলনের প্রতি বিশেষ বিদ্বেষ ছিলো নাইপলের মনে। তার প্রকাশ দেখি *"এ্যামঙ দি বিলিভার্স: এন ইসলামিক জার্নি*-তে। নাইপলের সাম্প্রতিক উপন্যাসগুলোর মধ্যে *গেরিলা ও দি বেন্ড ইন দি রিভার*-এ ইসলাম জিজ্ঞাসার সম্মুখীন, যা তৃতীয় বিশ্বের বিরুদ্ধে তার (সেইসঙ্গে উদার পশ্চিমা পাঠকদের জনপ্রিয়) অভিযোগেরই অংশ। তৃতীয় বিশ্বকে তিনি বিবেচনা করেন কয়েকজন অদ্ভুত

www.pathagar.com

শাসকের কলঙ্ক, ইউরোপীয় সাম্রাজ্যবাদের পতন, আফ্রিকা ও এশিয়ায় বুদ্ধিবৃত্তিক ব্যর্থতা হিসেবে স্থানীয় সমাজগুলোর উত্তর-উপনিবেশী পুনর্গঠন প্রয়াস—এ তিনের সমন্বয়ে। তার মতে এক্ষেত্রে ইসলাম প্রধান ভূমিকা পালন করেছে; তা হতে পারে ইসলামের প্রতি সহানুভূতিশীল ওয়েস্ট ইন্ডিজ গেরিলাদের ইসলামী নাম গ্রহণে বা আফ্রিকায় দাস ব্যবসার পুরোনো সাক্ষ্যে। মোটকথা, নাইপল ও তার পাঠকের জন্য "ইসলাম" ধারণাটি এমন ভাবে বানানো যে, তা নির্দেশ করে সেইসব তাবৎ বিষয় যা সভ্য ও পশ্চিমা দৃষ্টিকোণ থেকে গ্রহণ-অযোগ্য[৩]। যেন ধর্মীয় আবেগের মধ্যে বৈষম্য, ন্যায়সঙ্গত কারণে সংগ্রাম, সাধারণ মানবীয় দুর্বলতা, রাজনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বিতা, নারী-পুরুষ-সমাজের ইতিহাস— যাকে ভাবা হয় ইরানে ও অন্যত্র চলমান 'ইসলামের' কারণে নারী-পুরুষ-সমাজের না-হয়ে ওঠার ইতিহাসরূপে—এ সকল কিছুকে মোকাবেলা করছেন উপন্যাসিক, রিপোর্টার, নীতি-নির্ধারক ও বিশেষজ্ঞরা। "ইসলাম" শব্দটি যেন বৈচিত্র্যপূর্ণ মুসলিম বিশ্বের সকল বৈশিষ্ট্যের ধারক, যেন তা সবকিছুকে সংকুচিত করে পরিণত করে অশুভ, অচিন্তনীয় এক সত্তায়। এরই পরিণতি হলো বিশ্লেষণ ও উপলব্ধির পরিবর্তে সবখানে "আমরা-ওরা" পরিকাঠামো সৃষ্টি। যখন ইরানী মুসলমানরা তাদের ন্যায়বিচারবোধের কথা বলে, তাদের দমনের ইতিহাসের কথা বলে, নিজেদের সমাজের ভবিষ্যৎ কল্পনা করে, তখন এগুলোকে মনে হয় অপ্রাসঙ্গিক। যুক্তরাষ্ট্রের কাছে গুরুত্বপূর্ণ হলো এই মুহূর্তে ইসলামী বিপ্লব ঠিক কি করছে, খোমাইটদের হাতে কত লোক মারা গেছে, আয়াতুল্লাহ কতগুলো উদ্ভট দৌরাত্ম্যপূর্ণ কাজের নির্দেশ দিয়েছেন ইসলামের নামে, ইত্যাদি। কিন্তু কেউ কখনো জোনসটাউনের গণহত্যা বা ওকলোহামা বিস্ফোরণের ভয়াবহতা অথবা ইন্দোচীনের ধ্বংসযজ্ঞের সাথে খ্রিস্টান ধর্মকে কিংবা পশ্চিমা বা মার্কিন সংস্কৃতিকে এক করে দেখে না। ঐ রকম মিল-দেখানোর রীতি তুলে রাখা আছে কেবল "ইসলাম"-এর জন্য।

কেন বিশাল একরাশ রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক, সামাজিক, এমনকি অর্থনৈতিক ঘটনাবলীকে এমন প্যাভলোভিয়ান কায়দায় "ইসলাম" শব্দটিতে সঙ্কুচিত করে আনা হয়? এই "ইসলাম"-এর ব্যাপারটাই বা কি যা দ্রুত ও লাগামহীন প্রতিক্রিয়ার জন্ম দেয়? পশ্চিমের কাছে ইসলামী জগত কোন দিক দিয়ে তৃতীয় বিশ্বের অবশিষ্ট অংশ থেকে ভিন্ন, কিংবা স্নায়ুযুদ্ধকালীন সোভিয়েত ইউনিয়ন থেকে অন্যরকম? জটিল প্রশ্ন এগুলো। কাজেই জবাব দেয়া উচিত প্রশ্নগুলোকে ভেঙ্গে ভেঙ্গে, যথাযথ বৈশিষ্ট্য ও পার্থক্য বিবেচনায় রেখে।

খুবই ব্যাপ্ত জটিল বাস্তবতাগুলোকে আখ্যায়িত করার জন্য নাম উদ্ভাবনের ব্যাপার আসলে জঘন্যরকম অস্পষ্ট একটি বিষয়, তা আবার এড়ানোও যায় না। যদি "ইসলাম" লেবেলটি বেঠিক হয়ে থাকে এবং মতাদর্শের ভারে বোঝাই হয়ে থাকে, তাহলে এও সত্য যে "পশ্চিম" এবং "খ্রিস্টানত্ব" কথাগুলোও বিতর্কিত। অথচ এ জাতীয় লেবেল এড়ানো কঠিন। কারণ মুসলমানরা ইসলামের কথা বলে—খ্রিস্টানরা খ্রিস্টানত্বের, ইহুদিরা ইহুদিবাদের এবং অন্য সবাই সংশ্লিষ্ট ধারণাগুলোর কথা বলে থাকে; বলে

www.pathagar.com

এমনভাবে যেন এগুলো খুবই গ্রহণযোগ্য সোজাসাপ্টা সত্য। এই লেবেলগুলো ছাড়িয়ে যাওয়ার উপায় না বাৎলে বরং আপাতত স্বীকার করে নেয়া ভালো যে, এগুলো আছে এবং উদ্দেশ্যমূলক শ্রেণীবিভাজনরূপে নয়, সাংস্কৃতিক ইতিহাসের অংশ হিসেবেই ব্যবহৃত হয়ে আসছে। তবে এ অধ্যায়ের শেষে আমি দেখাবো এগুলো আসলে তাফসীর মাত্র। যাদের প্রয়োজনে এবং যাদের দ্বারা এগুলো বানানো আমি তাদের নাম দিয়েছি তাফসীরকারী দল। কাজেই আমাদের মনে রাখতে হবে "ইসলাম", "পশ্চিম", "খ্রিস্টান বিশ্ব" ইত্যাদি ধারণা যখনই ব্যবহৃত হয় তখনই এগুলো সক্রিয় হয়ে ওঠে অন্তত দুভাবে এবং সৃষ্টি করে দুই রকম অর্থ। প্রথমটি হলো চিহ্নিত করার কাজ; যেমন আমরা যখন বলি খোমেনী একজন মুসলমান বা পোপ দ্বিতীয় জন পল একজন খ্রিস্টান। এ ধরনের বিবৃতি আমাদেরকে বলে কোনো একটি জিনিষ বা বিষয় বা মানুষ ন্যূনতম কী; তা জানায় অন্যসব কিছুর বৈপরীত্যের ভিত্তিতে। এ স্তরে আমরা কমলা বা আপেলের (বা মুসলিম ও খ্রিস্টানের) পার্থক্য এইটুকু বুঝতে পারি যে, এগুলো ভিন্ন ভিন্ন ফল, একেকটা একেক গাছে জন্মায়।

বহুস্তরের দ্বিতীয়টির কাজ সৃষ্টি করে অনেক জটিল অর্থ। পশ্চিমে "ইসলাম" কথাটি উচ্চারণ করার অর্থ হলো অনেক অপ্রিয় ব্যাপার বোঝানো যেগুলো এতক্ষণ ধরে উল্লেখ করেছি। আবার "ইসলাম" এমন কিছুই বোঝায় না শ্রোতা চাইলে যা বিষয়মুখিভাবে সরাসরি জানতে পারবেন। একই কথা খাটে যখন আমরা "পশ্চিম"। যারা ক্ষোভ বা নিশ্চয়তা নিয়ে নামগুলো ব্যবহার করে তাদের কয়জন পাশ্চাত্য ঐতিহ্য বা ইসলামী নীতিমালা অথবা ইসলামী বিশ্বের আসল ভাষা সম্পর্কে জ্ঞান রাখে? এ সত্ত্বেও প্রবল আত্মবিশ্বাসের সাথে "ইসলাম" বা "পশ্চিম" ধারণাগুলোর ব্যবহার বন্ধ হয় না। এই বিশ্বাসেও চিড় ধরে না যে, বিষয়টি সম্পর্কে তারা যা জানে তা-ই পরম সত্য।

এ কারণে এইসব লেবেলকে গুরুত্বের সাথে নিতে হবে। যে মুসলমান পশ্চিম সম্পর্কে বলেন কিংবা যে খ্রিস্টান কথা বলেন "ইসলাম" সম্পর্কে, তার জন্য আছে এই বহু-বিস্তৃত সাধারণীকরণের পেছনের এক দীর্ঘ ইতিহাস; তা তাদেরকে যেমন সক্ষম করে, তেমনি অক্ষমও বানায়। এগুলো মতবাদভিত্তিক মার্কা, তীব্র আবেগের মধ্যে গড়ে ওঠা। এগুলো পার করে এসেছে অনেক অভিজ্ঞতা; এগুলো নতুন তথ্য ও বাস্তবতার সাথে খাপ-খাওয়াতে সক্ষম। এই মুহূর্তে "ইসলাম" ও পশ্চিম নতুন জরুরী গুরুত্বের সাথে জড়ানো। এবং সাথে সাথে এও লক্ষণীয় যে, খ্রিস্টান বিশ্ব নয়, বরাবর পশ্চিমই ইসলামের বিরুদ্ধে সক্রিয়। কেন? কারণ ওরা অনুমানে ধরে নিয়েছে যে, পশ্চিম তার প্রধানত ধর্ম খ্রিস্টানত্বের স্তর ছাড়িয়ে আরো বিস্তৃত ও বড় হয়ে গেছে; কিন্তু ইসলামী বিশ্ব এখনো তার ধর্মীয় আদিমতা ও পশ্চাদপদতার পাঁকে আটকা। অথচ ইসলামী বিশ্ব সম্পর্কে এমন অনুমানের ক্ষেত্রে এই জগতটির বিচিত্রধর্মী সমাজ, ইতিহাস ও ভাষার প্রসঙ্গটি তাদের বিবেচনায় আসেনি। সুতরাং পশ্চিম আধুনিক, এর বিভিন্ন অংশের যোগফলের চেয়েও বড়, সমৃদ্ধিকারক বৈপরীত্যে পরিপূর্ণ; এ সত্ত্বেও সাংস্কৃতিক পরিচয়ের প্রশ্নে তা বরাবরই "পশ্চিমা"।

www.pathagar.com

অন্যদিকে, ইসলামের জগত কেবলই "ইসলাম"—কিছু অপরিবর্তনীয় বৈশিষ্ট্যে সংকুচিত করার যোগ্য, আর কিছুই নয়। অথচ পশ্চিমের মত ইসলামেও রয়েছে প্রচুর আভ্যন্তরীণ সংঘাত, অভিজ্ঞতার বৈচিত্র্য।

আমি কি বোঝাতে চাই তার একটা দৃষ্টান্ত পাওয়া যায় সেপ্টেম্বর ১৪, ১৯৮০ তারিখের *নিউ ইয়র্ক টাইমস*-এর, "নিউজ অব দি উইক ইন রিভিউ" সেকশনে প্রকাশিত একটি লেখা থেকে। লেখাটি *টাইমস*-এর সুযোগ্য বৈরুত-প্রতিনিধি জন কিফনারের লেখা, মুসলিম বিশ্বে সোভিয়েত ইউনিয়নের প্রবেশ সম্পর্কে। শিরোনামে ["মার্কস এন্ড মস্ক আর লেস কম্প্যাটিবল দ্যান ইভার": (*মার্কস ও মসজিদ এসময়ই সবচেয়ে কম খাপ-খাওয়াতে পারছে*)] কিফনারের মনোভাবের প্রকাশ আছে। তবে এখানে লক্ষণীয় হলো বিমূর্ত একটি বিষয়ের সাথে বিশাল এক জটিল বাস্তবতার সরাসরি, গাছে-আর-মাছে জাতীয় সম্পর্ক তৈরি করার জন্য ইসলাম-কথাটির ব্যবহার। অন্য জায়গায় এটি গ্রহণঅযোগ্য ব্যাপার বলে গণ্য হতো। ধরা যাক, আর সব ধর্মের বিপরীতে ইসলাম একটি সর্বনিয়ন্ত্রণবাদী বিশ্বাস এবং চার্চ ও রাষ্ট্রের মধ্যে অথবা ধর্ম ও দৈনন্দিন জীবনে কোনো পার্থক্য করে না। তা সত্যি হলেও, নিচের মন্তব্যের মধ্যে নজিরহীন ও সুচিন্তিত অজ্ঞতা ও অজ্ঞতাসৃজক একটা ব্যাপার থেকে যায়, যদিও তা যথেষ্ট প্রচলিত ধাঁচের:

> মস্কোর প্রভাব কমে আসার নিশ্চিত সরল কারণ হলো: মার্কস ও মসজিদ খাপ-খায় না। (কিফনারের কথা অনুযায়ী আমরা কি তাহলে ধরে নেব মার্কস ও চার্চ বা মার্কস ও মন্দির বেশি খাপ-খায়?)
>
> সংস্কারের যুগ থেকে শুরু করে ঐতিহাসিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক বিকাশের যুগ পর্যন্ত পশ্চিমা মন এমনভাবে বিকশিত হয়েছে যাতে ধর্মের ভূমিকা কেবল হ্রাস পেয়েছে (এখানে 'পশ্চিমা মন' কথাটাই আসল)। এই মনের পক্ষে বোঝা কঠিন ইসলাম কি ধরনের ক্ষমতা সক্রিয় করে তুলতে পারে (এখানেও ধরা নেয়া হয়েছে ইতিহাস বা বুদ্ধিবৃত্তির কোনোটার দ্বারাই কোনো বিকাশ হয়নি ইসলামের)। এ সত্ত্বেও বহু শতাব্দী ধরে ইসলাম এ অঞ্চলের মানুষের জীবন যাপনের কেন্দ্রীয় শক্তি, আর অন্তত এই মুহূর্ত পর্যন্ত, এর ক্ষমতা হঠাৎ করে তুঙ্গে ওঠে যাচ্ছে।
>
> ইসলামে মসজিদ ও রাষ্ট্রের মধ্যে ফারাক নাই। এটি বিশ্বাস ও কর্মের সমন্বয়ে একটি সামগ্রিক পদ্ধতি, যাতে আছে প্রাত্যহিক জীবনযাপনের নির্ধারিত বিধি-বিধান এবং অবিশ্বাসীদেরকে হয় ধর্মান্তরিত করা অথবা তাদের বিরুদ্ধে লড়াই করার মেসিয়ানিক তাড়না। গভীরভাবে ধর্মে বিশ্বাসী মানুষ, বিশেষত আলেম ও মোল্লাদের নিকট, তেমনি সাধারণ জনতার কাছেও (অন্য কথায়, কেউই বাদ থাকছে না) মার্কসবাদ কেবল অন্য জগতের ব্যাপারই নয়, বিরুদ্ধবাদী মতবাদও।

কিফনার এখানে ইতিহাসকে উপেক্ষা করেছেন এবং মার্কসবাদ ও ইসলামের মধ্যে একগুচ্ছ সীমিত সমান্তরাল তুল্য অবস্থার জটিলতা অস্বীকার করে গেছেন (এ বিষয়ে

www.pathagar.com

আলোচনা করেছেন ম্যাক্সিম রডিনসন তার একটি বইয়ে, যাতে তিনি ব্যাখ্যার চেষ্টা করেছেন বিগত বছরগুলোয় মার্কসবাদ কেন ইসলামী সমাজের অভ্যন্তরে খানিকটা প্রবেশ করতে পেরেছিলো বলে মনে হয়[৪])। অধিকন্তু, কিফনারের যুক্তিবিন্যাস সেই 'ইসলাম' ও পশ্চিম-এর- প্রচ্ছন্ন তুলনার ওপর নির্ভরশীল; আদিম, সর্বনিয়ন্ত্রণবাদী ইসলামের তুলনায় এ পশ্চিম বৈচিত্র্যময়; একে কোনো নির্দিষ্ট প্রকৃতির ছাঁচে চিহ্নিত করা যায় না। এখানে মজার ব্যাপার হচ্ছে, কিফনার যা বলতে চান তা-ই বলে যেতে পারেন; কোনো ভুল করার বা নিজের বক্তব্য অদ্ভুত কিছু মনে হওয়ার বিপদের ভয়ও যেন তার নেই। মূল সমস্যা হলো, কিফনারের মত ভাষ্যকাররা দুইবার চিন্তা না করেই বিমূর্ত রূপের ইসলাম থেকে এক লাফে চলে যান অত্যন্ত জটিল এক বাস্তবে।

ইসলাম বনাম পশ্চিম: বিস্ময়কর উর্বর একরাশ পার্থক্যের মূল সুর। তা নিজের মধ্যে টেনে নেয়, আমেরিকা বনাম ইসলামের মতই, ইউরোপ বনাম ইসলাম-এর তত্ত্ব।[৫] তবে সামগ্রিকভাবে পশ্চিমের নিরিখে কিছু নিরেট অভিজ্ঞতাও তলে তলে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। কারণ ইসলাম বিষয়ে ইউরোপীয় ও মার্কিন মনোভাবের মধ্যে খুবই গুরুত্বপূর্ণ পার্থক্য যথাযথভাবে নির্দেশ করা জরুরী। দৃষ্টান্ত হিসেবে বলা যায়, এই কিছুদিন আগেও ফ্রান্স ও ইংল্যান্ডের ছিলো বিশাল মুসলিম সাম্রাজ্য। ইসলামী বিশ্বের সাথে সরাসরি সংযোগজনিত অভিজ্ঞতা রয়েছে এই দুটো দেশের।[৬] তেমনি স্বল্পমাত্রার একইরকম অভিজ্ঞতা আছে মুসলিম উপনিবেশের অধিকারী ইতালী ও হল্যান্ডেরও। তা ছাড়া, মেট্রোপলিটান ফ্রান্স ও বৃটেনে এখন বসবাস করছে আফ্রিকা ও এশিয়ার মিলিয়ন মুসলমান। এ পরিস্থিতির প্রতিফলন লক্ষ্য করা যায় ইউরোপের গুরুত্বপূর্ণ বিদ্যায়তনিক বিষয় প্রাচ্যতত্ত্ব-এ। উপনিবেশক দেশগুলোয় তো ছিলোই, এ ছাড়া অন্য যে-সব দেশ উপনিবেশ প্রতিষ্ঠার আকাঙ্ক্ষা পোষণ করতো বা মুসলিম দেশের নিকটবর্তী ছিলো, কিংবা একসময় ছিলো মুসলিম এলাকা সেগুলোতেও প্রাচ্যতত্ত্বের চর্চা ছিলো (যেমন জার্মানী, স্পেন, প্রাক-বিপ্লবকালীন রাশিয়া)। এখন রাশিয়া ও তার অন্যান্য প্রজাতন্ত্রে মুসলমানের সংখ্যা পাঁচ কোটি। ১৯৭৯ সাল থেকে ১৯৮৮ সাল পর্যন্ত আফগানিস্তান ছিলো রাশিয়ার সামরিক দখলাধীন। এই সব বিষয়ের কোনোটাই যুক্তরাষ্ট্রের বেলায় ঘটেনি; যদিও এখানে এখন ক্রমশ বর্ধিষ্ণু সংখ্যক প্রচুর মুসলমানের বসবাস। এবং পূর্বের যে-কোনো সময়ের তুলনায় সম্প্রতি অনেক বেশি আমেরিকান ইসলাম সম্পর্কে লিখছে, ভাবছে অথবা আলোচনা করছে। উপনিবেশী অভিজ্ঞতা না থাকার কারণে এবং ইসলামের প্রতি দীর্ঘকালীন সাংস্কৃতিক মনোনিবেশের অভাবে আমেরিকার বর্তমান আবেগাচ্ছন্নতা হয়ে উঠেছে আরো উদ্ভট, আরো বিমূর্ত ও পরোক্ষ। তুলনামূলকভাবে বলা যায়, প্রকৃত মুসলমানদের সাথে উঠা-বসার মতো ব্যাপার ছিলো খুব কম আমেরিকানেরই। সে তুলনায়, ফ্রান্সে ধর্মের হিসেবে মুসলমানরা দ্বিতীয় বৃহত্তম জনগোষ্ঠী; অবশ্য এরফলে ইসলাম ওখানে কোনো জনপ্রিয় বিষয়ে পরিণত হয়নি, তবে বেশ জানাশোনা একটা ব্যাপারে দাড়িয়েছে অন্তত। ইসলামে ইউরোপীয় আগ্রহের আকস্মিক ধাক্কা তথাকথিত "অরিয়েন্টাল রেঁনেসার"

www.pathagar.com

অংশ। আঠারো শতকের শেষ ও উনিশ শতকের শুরুর সেই যুগে "প্রাচ্য" অর্থাৎ ভারত, চীন, জাপান, মিশর, পবিত্র ভূমি মেসোপটেমিয়াকে নতুন করে আবিষ্কার করে ফরাসি ও বৃটিশ পণ্ডিতরা। ভালো বা মন্দ যে কারণেই হোক, ইসলামকে দেখা হয় প্রাচ্যের সাথে মিলিয়ে। একে মনে করা হয় প্রাচ্যের রহস্যময়তা, চমক, দুর্নীতি ও সুপ্ত ক্ষমতার ঐতিহ্যে পুষ্ট। এ কথা সত্য যে, এর আগে কয়েক শতক ধরে ইসলাম ছিলো ইউরোপের প্রতি সরাসরি সামরিক হুমকি। তেমনি গোটা মধ্যযুগ ধরে এবং রেঁনেসার প্রথম দিকে এটি ছিলো খ্রিস্টীয় চিন্তাবিদদের নিকট এক সমস্যার মতো। সে কালে তারা মনে করতেন ইসলাম ও মোহাম্মদ হলো সবচেয়ে জঘন্য একরকম ধর্মত্যাগী। তা সত্ত্বেও ইউরোপীয়দের নিকট ইসলামকে মনে হয়েছে বহুযুগের ধর্মীয়-সাংস্কৃতিক চ্যালেঞ্জ; তবে তা ইসলামী এলাকায় ইউরোপীয় সাম্রাজ্যবাদের উপনিবেশ প্রতিষ্ঠায় বাধা হয়ে দাড়ায় না। এবং যত শত্রুতাই থাকুক, ইসলাম ও ইউরোপের পরস্পরের মধ্যে সরাসরি অভিজ্ঞতাও ছিলো। গোয়েতে, গেরার্ড ডি নেরভাল, রিচার্ড বার্টন, ফ্লবেয়ার ও লুই ম্যাসিগননের মত পণ্ডিত, কবি, উপন্যাসিকদের বেলায় ছিলো কল্পনা ও পরিশোধন।

এরা এবং এদের মত আরো অনেক ব্যক্তিত্বের উপস্থিতি সত্ত্বেও ইসলামকে কখনো ইউরোপে স্বাগত জানানো হয়নি। হেগেল থেকে স্পেঙলার পর্যন্ত অধিকাংশ দার্শনিক কোনো আগ্রহ বোধ করেননি ইসলামের ব্যাপারে। বিশ্বাসের একটি পদ্ধতিরূপী ইসলামের ওপর এই বিরামহীন, চোখে পড়ার মতো ক্ষতিকর চাপের কথা আলোচনা করেছেন আলবার্ট হোরাইনি তার সহজবোধ্য চমৎকার প্রবন্ধ "ইসলাম এবং দর্শনের ইতিহাস"-এ।[৭] দু'একজন বিচ্ছিন্ন সুফী লেখক ও সাধক ব্যক্তিত্বের প্রতি কদাচ আগ্রহের কথা বাদ দিলে বলা যায়, "প্রাচ্যের জ্ঞান" নিয়ে ইউরোপীয়দের হালফিল রীতির চর্চা কখনো ইসলামী জ্ঞানতাপস বা কবিদের অন্তর্ভুক্ত করেনি। মোটামুটি হিসেবে শিক্ষিত আধুনিক ইউরোপীয়দের কাছে ইসলামী ব্যক্তিত্বের তালিকায় সবমিলিয়ে আছে ওমর খৈয়াম, হারুন-আল-রশিদ, সিনবাদ, আলাদীন, হাজী বাবা, শেহেরজাদ, সালাদীন এই কয়েকটা নাম। কার্লাইলও মোহাম্মদকে সবখানে গ্রহণযোগ্য করতে পারেননি। খ্রিস্টীয় বিশ্বাসের পটভূমিতে দীর্ঘকাল ধরে গ্রহণ-অযোগ্য ছিলো মোহাম্মদের প্রচারিত ধর্মবিশ্বাস, যদিও ঠিক এ কারণে সে বিশ্বাসের প্রতি আগ্রহ থেমে থাকেনি। উনিশ শতকের শেষ দিকে এশিয়া ও আফ্রিকায় ইসলামী জাতীয়তাবাদ বৃদ্ধি পেতে থাকলে সবখানে এমন একটি সাধারণ ধারণা গড়ে ওঠে যে, মুসলিম উপনিবেশগুলোকে ইউরোপীয় অভিভাবকত্বে রাখতে হবে: কারণ এগুলো অনুন্নত আবার লাভজনক, তেমনি এদের দরকার পশ্চিমের জ্ঞান।[৮] এ অবস্থা এবং মুসলিম বিশ্বে প্রায়শই বর্ণবাদ আরোপ ও আগ্রাসন চালানো সত্ত্বেও ইসলাম ইউরোপের কাছে কী বোঝায় তার একটা প্রাণচঞ্চল প্রকাশ আমরা ইউরোপের মধ্যে পাই। এখান থেকে ইউরোপ কর্তৃক ইসলামের প্রতিনিধিত্বকরণ শুরু—পাণ্ডিত্য, শিল্প, সাহিত্য, সঙ্গীত ও গণপর্যায়ের জ্ঞানভাষ্যে— ইউরোপীয় সংস্কৃতি জুড়ে, আঠারো শতকের শেষ থেকে আমাদের কাল পর্যন্ত।

www.pathagar.com

এ ছাড়া, মুসলিম ও আরব বিশ্বের সাথে সাংস্কৃতিক ও আধ্যাত্মিক আলোচনার নীতি গ্রহণ করেছিলো অনেক ইউরোপীয় সরকার। তার ফলাফল অনেক সেমিনার, সম্মেলন, বিভিন্ন বইয়ের ভাষান্তর। এরকম কিছুই হয়নি যুক্তরাষ্ট্রে। ওখানে ইসলাম মূলত পররাষ্ট্রনীতি বিষয়ক কাউন্সিলে নীতি-নির্ধারণী জিজ্ঞাসা, একটা "হুমকি" বা সামরিক ও নিরাপত্তা চ্যালেঞ্জ; যুক্তরাষ্ট্রের সাথে সম্পর্কিত অসংখ্য জাতি ও সংস্কৃতির মধ্যে যার জুড়ি মেলা ভার।

কাজেই ইউরোপীয় অভিজ্ঞতার নিরেট বৈশিষ্ট্যের কোনোকিছুই মার্কিন ইসলামী অভিজ্ঞতায় পাওয়া যাওয়ার কথা নয়। ইসলামের সাথে উনিশ শতকের আমেরিকার সংযোগ ছিলো খুবই সীমিত। এখানে হয়তো মনে পড়তে পারে মার্ক টুয়েন ও হারমেন মেলভিলের মত ভ্রমণকারী, এদিক-সেদিক মিশনারীদের তৎপরতা এবং উত্তর আফ্রিকায় সীমিত মাত্রার যুদ্ধাভিযানের প্রসঙ্গ। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের আগে পর্যন্ত সাংস্কৃতিক দিক থেকে ইসলামের বিশেষ কোনো জায়গা ছিলো না আমেরিকায়। বিদ্যায়তনিক পণ্ডিতরা গবেষণা করেছেন এক কোণার আধ্যাত্মিক অঙ্গনে। প্রাচ্যতত্ত্বের বর্ণবহুল জগত বা বিখ্যাত জার্নালগুলোর পাতায় তাদের লেখালেখি ছিলো না। প্রায় এক শতাব্দী ধরে খুবই চিত্তাকর্ষক মিথোজীবীতার সম্পর্ক ছিলো মুসলিম দেশগুলোয় বসবাসকারী মার্কিন মিশনারী পরিবার, পররাষ্ট্র বিভাগের কর্মকর্তাবৃন্দ আর তেল কোম্পানীগুলো মধ্যে; মাঝে মধ্যে পররাষ্ট্র দপ্তর ও তেল কোম্পানীর "আরববিদদের" সম্পর্কে বিদ্বেষপূর্ণ মন্তব্যের আকারে তা প্রকাশ পেতো। প্রচণ্ড বিষময় ও এন্টি-সেমিটিক প্রবণতার ইসলাম চর্চায় মদদদাতা মনে করা হতো এইসব "আরববিদদেরকে"। অন্যদিকে, বিশ বছর আগ পর্যন্ত আমেরিকায় বিদ্যায়তনিক ইসলাম বিশেষজ্ঞ ও বিশ্ববিদ্যালয়ে বিভাগ প্রতিষ্ঠাতা সব বিশেষ ব্যক্তিত্ব বিদেশী: যেমন প্রিন্সটনে লেবানিজ ফিলিপ হিট্টী, শিকাগো ও ইউসিএল-এ অষ্ট্রিয়ার গুস্তাভ ভন গ্রোনেভম, হার্ভার্ডে বৃটিশ এইচ. এ. আর. গিব, কলাম্বিয়ায় জার্মান জোসেফ সোচেট। কিন্তু বৃটেনের আলবার্ট হোরানি অথবা ফ্রান্সের জ্যাক বার্কের মত সাংস্কৃতিক মর্যাদা ছিলো না এদের কারোরই।

আমেরিকান দৃশ্য থেকে মুছে গেছেন হিট্টী, গিব, ভন গ্রোনেভম ও সোচেটের মত ব্যক্তিত্বও। কিন্তু, ১৯৯৩ সালে বার্ক ও হোরাইনির মৃত্যুর পর, নিঃসন্দেহে তাদের উত্তরাধিকার জন্মাবে ফ্রান্সে ও বৃটেনে। তাদের সাংস্কৃতিক ঔদার্য ও পাণ্ডিত্যের বিস্তৃতি আর কারো মধ্যে চোখে পড়ে না। এখন পশ্চিমের ইসলাম বিশেষজ্ঞরা দশ শতকের বাগদাদ বা উনিশ শতকের মরোক্কো শহুরে সমাজের বিধি-বিধান সম্পর্কিত মতবাদগুলো জানতে আগ্রহী; কিন্তু কখনো (প্রায় কখনোই) গোটা ইসলাম সম্পর্কে— তার সাহিত্য, আইন-কানুন, রাজনীতি, ইতিহাস, সমাজতত্ত্ব প্রভৃতি বিষয়ে জানতে আগ্রহী হয় না। এই না-জানা সত্ত্বেও প্রায়ই "ইসলামী মনোভাব" বা "শহীদ হওয়ার জন্য শিয়াদের আবেগ" বিষয়ে সাধারণীকরণে তারা থেমে থাকেনি। এইসব ঘোষণার প্রচার মূলত প্রচারমাধ্যম ও জনপ্রিয় জার্নালেই সীমাবদ্ধ থাকে। এবং এর ফলেই

www.pathagar.com

এগুলো স্থান করে নেয় সামনের দিকে। এখানে গুরুত্ব দিয়ে চিন্তা করার মতো ব্যাপার হলো, বিশেষজ্ঞ/ অবিশেষজ্ঞদের নিয়ে ইসলাম সম্পর্কে গণপর্যায়ের আলোচনা অনুষ্ঠিত হয় কেবল বিশেষ বিশেষ রাজনৈতিক সংকটকালেই। *নিউ ইয়র্ক রিভিউ অব বুকস্* বা *হারপার*-এ ইসলামী সংস্কৃতি বিষয়ক তথ্যহুল প্রবন্ধের প্রকাশ রীতিমত দুর্লভ ঘটনা। কেবল সৌদী আরবে বোমা ফাটলে বা ইরানে আমেরিকার বিরুদ্ধে সন্ত্রাসের হুমকি দেখা দিলে ইসলাম সার্বিক মন্তব্যের যোগ্যতা অর্জন করে বলে মনে হয়। তারপর, বিশেষত ১৯৯৩ সালে ওয়ার্ল্ড ট্রেড সেন্টারে বোমা বিস্ফোরণের পর থেকে, বিভিন্ন সংবাদপত্র, ম্যাগাজিন ও একটি সিনেমা "ইসলামের জগত" সম্পর্কে ধারণা দেয়ার চেষ্টা করে সাধারণ আমেরিকানদেরকে; জ্ঞান দেয়ার প্রক্রিয়ার মধ্যে আছে বিভিন্ন জরীপ, সারণী, মানুষদের সম্পর্কে একক গল্প (যেমন পাকিস্তানী পানি-বিক্রেতা, মিশরীয় কৃষক পরিবার ইত্যাদি)। অথচ জঙ্গীবাদের সপক্ষে রয়েছে হুমকিদায়ক আপাত-আকর্ষণীয় পটভূমি; তার বিপরীতে ঐ সব যৎসামান্য লেখালেখি আকামা জিনিষ বলেই প্রমাণিত।

এখন ভেবে দেখুন, সার্বিক অর্থে অধিকাংশ সাধারণ আমেরিকান, এমনকি ইউরোপ ও লাতিন আমেরিকার ব্যাপারে ওয়াকিবহাল বিদ্যায়তনিক পণ্ডিত ও বুদ্ধিজীবীদের চৈতন্যে ইসলাম প্রবেশ করেছে তেল, ইরান ও আফগানিস্তান বা সন্ত্রাসের মত প্রচারযোগ্য সংবাদ-আইটেমের সাথে সম্পর্কিত বিষয় হিসেবে।[৯] এবং ১৯৭৯ সালের মাঝামাঝি সময় থেকে এসব কিছুকে একত্রে বলা হচ্ছে ইসলামী বিপ্লব বা "সঙ্কটে চাঁদ" বা "অস্থিরতার বাঁকাচাঁদ" বা "ইসলামের প্রত্যাবর্তন" ইত্যাদি। অর্থবোধক একটা দৃষ্টান্ত হলো আটলান্টিক কাউন্সিলের মধ্যপ্রাচ্য বিষয়ক বিশেষ কর্ম-কমিটি (এতে অন্যান্যদের মধ্যে আছেন ব্রেন্ট স্কোক্রফ্ট, জর্জ বল, রিচার্ড হেলম, লাইম্যান লেম্‌নিৎজার, ওয়াল্টার লেভি, ইউজিন রোস্টাউ, কারমিন রোজভেল্ট ও জোসেফ সিস্কোর মত মানুষ)। ১৯৭৯ সালে কমিটির প্রদত্ত রিপোর্টের শিরোনাম হয় "তেল ও বিক্ষোভঃ মধ্যপ্রাচ্যে পশ্চিমের করণীয় বিকল্পসমূহ"।[১০] সে বছর এপ্রিলের ১৬ তারিখে *টাইম ম্যাগাজিন*-এর মূল প্রতিবেদনটি ছিলো ইসলাম সম্পর্কে। পত্রিকার প্রচ্ছদে ছাপা হয় মিনারাত-এ দাড়িয়ে আজানরত এক মুয়াজ্জিনের একটি পেইন্টিঙঃ একেবারে উনিশ শতকীয় প্রাচ্যতাত্ত্বিক চিত্রকলার একটা নমুনা—যতটা কল্পনা করা যায় ততটাই অলংকারময় ও অতিরঞ্জিত। যুগের সাথে বেমানান এই সুবোধ চিত্রটির সাথে জুড়ে দেয়া হয়েছে অপ্রাসঙ্গিক এই শিরোনামঃ "জঙ্গী পুনরুজ্জীবন (দি মিলিট্যান্ট রিভাইভাল)"। ইসলাম বিষয়ে ইউরোপ ও আমেরিকার মধ্যে পার্থক্য বোঝানোর জন্য এর চেয়ে ভালো উদাহরণ আর হতে পারে না। ইউরোপে এমন ধরনের একটি পেইন্টিঙ প্রায়ই আঁকা হতে পারে, সার্বিক সংস্কৃতির বৈশিষ্ট্য হিসেবে। অথচ যুক্তরাষ্ট্রে এটিই তিনটি মাত্র শব্দে রূপান্তরিত হয়েছে সামগ্রিক আমেরিকান মোহাবেশে।

আমি নিশ্চয়ই বাড়িয়ে বলছি? ইসলাম সম্পর্কে *টাইমসের* প্রচ্ছদ কাহিনী কি রুচিবিনষ্টির নমুনা নয়? স্পর্শকাতর রুচির অনুকূল পরিবেশন নয়? তা কি এরচেয়ে

www.pathagar.com

গুরুতর কিছু প্রকাশ করে? সারবত্তা, নীতি ও সংস্কৃতির প্রশ্নে কখন থেকে প্রচার মাধ্যম গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে? এবং এর অর্থ কি এই নয় যে, ইসলাম নিজেই বিশ্বের মনোযোগের সামনে ঝাঁপিয়ে পড়েছে? আর ইসলাম বিশেষজ্ঞদেরই বা কি হলো? কেন তাদের অবদান এড়িয়ে যাওয়া হয়েছে অথবা গলিয়ে মিশিয়ে দেয়া হয়েছে প্রচার মাধ্যমের আলোচিত ও নির্বীজকৃত ইসলামে?

প্রথম আসে কিছু সহজ ব্যাখ্যার কথা। আগে যেমন বলেছি, আমেরিকায় কখনো এমন কোনো ইসলাম বিশেষজ্ঞ ছিলো না যার রয়েছে ব্যাপক সংখ্যক পাঠক। মার্শাল হডসনের তিন খণ্ডের *দি ভেঞ্চার অব ইসলাম* (১৯৭৫, মৃত্যুর পর প্রকাশিত) বাদ দিলে, আমেরিকায় সাধারণ শিক্ষিত মানুষের সামনে ইসলাম সম্পর্কে কোনো সার্বিক আলোচনা উপস্থাপন করা হয়নি।[১১] সেক্ষেত্রে বিশেষজ্ঞগণ হয়তো এমন মাপের বিশেষজ্ঞ যে, তারা কেবল আরেকদল বিশেষজ্ঞের সামনেই কথা বলেন। অথবা এমন হতো পারে যে জাপান বা পশ্চিম ইউরোপ বা ভারত সম্পর্কিত বইয়ের সংস্পর্শে আসেন যে-সব সাধারণ মানুষ তাদেরকে প্রভাবিত করার মতো অতটা বুদ্ধিবৃত্তিক গুরুত্ব অর্জন করেননি এরা। এর ফলাফল দুদিকেই কাজ করেছে। একদিকে, আমেরিকার কোনো "প্রাচ্যতাত্ত্বিক" প্রাচ্যতত্ত্বের বাইরে বিশেষ খ্যাতি অর্জন করতে পারেননি, যেমন পেরেছেন ফ্রান্সে বার্ক ও রডিনসন। আবার অন্যদিকে এও সত্যি যে, যারা নিজেদের খ্যাতি ও সহজাত মেধার বদৌলতে স্ব-স্ব ক্ষেত্রে ইসলামের অভিজ্ঞতাকে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় করে তুলেছেন[১২] তারা বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে ইসলাম চর্চা বা গণ পর্যায়ের সংস্কৃতিতে ইসলামকে ধরে রাখার ব্যাপারে উৎসাহ দেননি। রেবেকা ওয়েস্ট, ফ্রেইয়া স্টার্ক, টি. ই. লরেন্স, উইলফ্রিড থেসিগার, গর্ট্রুড বেল, পি. এইচ. নিউবি কিংবা আরেকটু সাম্প্রতিক জোনাথন র‍্যাবানের মত আমেরিকান কই? ওখানে বড়জোর আছে মাইলস কোপল্যান্ড বা কারমিট রোজভেল্টের মত প্রাক্তন সিআইএ কর্মকর্তা, বিশেষ সাংস্কৃতিক গুরুত্বের লেখক বা চিন্তাবিদ বিরল। পিটার থেরক্সের মত মেধাবী তরুণ লেখক-অনুবাদকরা এখনো বিশেষ প্রভাব সৃষ্টি করতে পারেননি।

ইসলাম সম্পর্কে বিশেষজ্ঞ পর্যায়ের মতামতের অভাবের দ্বিতীয় কারণ হলো সত্তর দশকের মাঝামাঝি ইসলামী বিশ্ব হঠাৎ "খবর" হয়ে উঠার সময় ঐসব বিশেষজ্ঞদের অবস্থান ছিলো প্রান্তিক। প্রভাবশালী, রূঢ় ও বাস্তব কিছু ঘটনাবলীর মধ্যে দেখা যায় : উপসাগরীয় অঞ্চলের তেল-সমৃদ্ধ দেশগুলি হঠাৎ করে ক্ষমতাশালী হয়ে ওঠে; লেবাননে চলমান হিংস্র এবং প্রায়-অনি:শেষ গৃহযুদ্ধ; দীর্ঘ যুদ্ধে লড়ছে ইথিওপিয়া ও সোমালিয়া; কুর্দিদের সমস্যা হঠাৎ করেই অচিন্তনীয়ভাবে গুরুতর হয়ে দেখা দেয়, আবার ১৯৭৫ সালের পর হঠাৎ অচিন্তনীয়ভাবেই মিইয়ে যায়; ব্যাপক, বিস্ময়কর "ইসলামী" বিপ্লবের সূচনায় ক্ষমতাচ্যুত হয় ইরানের শাসকগোষ্ঠী; ১৯৭৮ সালে আফগানিস্তানে সংগঠিত হয় কমিউনিস্ট ক্যু, অতপর ১৯৭৯ সালে প্রবেশ করে সোভিয়েত সেনাবাহিনী; দক্ষিণ সাহারা নিয়ে মরোক্কো ও আলজিরিয়ার লম্বা যুদ্ধের শুরু ; পাকিস্তানে এক প্রেসিডেন্টকে হত্যা এবং নতুন মিলিটারী শাসকের ক্ষমতা

www.pathagar.com

গ্রহণ। এরপর আরো ঘটনা আছে: ইরান-ইরাক যুদ্ধ, হিজবুল্লাহ ও হামাসের উত্থান, ইসরাইল ও অন্যত্র ক্রমাগত বোমা-বিস্ফোরণের ক্ষোভ, আলজিরিয়ায় ইসলামপন্থী ও বিকল সরকারের মধ্যে রক্ষক্ষয়ী সংঘাত... এই তালিকা নিয়েই সন্তুষ্ট থাকা যাক। মোটের ওপর নিরপেক্ষভাবে এটুকু বলা যায় যে, পশ্চিমে ইসলাম সম্পর্কে বিশেষজ্ঞ পর্যায়ের লেখায় যথাযথ পটভূমিতে ব্যাখ্যার মাধ্যমে এই সব ঘটনার কিছু কিছু পরিষ্কার করা সম্ভব ছিলো। এ অবস্থা সম্পর্কে তারা কোনো ভবিষ্যৎবাণীও করেননি, তেমনি মানসিকভাবে প্রস্তুতও করেননি পাঠকদেরকেও। বরং এ সকল বিষয়ে এমন সব সাহিত্যিক লেখা লিখেছেন, চলমান বাস্তবতার সাথে তুলনা করে এগুলো পড়লে মনে হবে এ যেন পৃথিবীর দূরবর্তী এক জগতের ব্যাপার, প্রচার মাধ্যমে চোখের সামনে যে বিক্ষোভ ও হুমকি বলকে উঠছে তার সাথে যেন ঐ জগতের কোনো অর্থবোধক সম্পর্ক নেই।

এটা মূল ব্যাপারগুলির একটা। এ নিয়ে এখনো তেমন যুক্তিনির্ভর আলোচনা শুরু হয়নি। কাজেই সতর্কতার সাথে এগুতে হবে আমাদেরকে। ইসলাম যে-সকল বিদ্যায়তনিক বিশেষজ্ঞের প্রদেশ তারা সেই সতর শতকেরও পূর্বের রীতিতে প্রত্নতাত্ত্বিক স্তরে কাজ করেন। এ ছাড়া অন্যান্য বিষয়ের গবেষকদের মতোই এদের কাজ সীমানা-দেয়াল দ্বারা খুবই চাপানো। ইসলামের ইতিহাসের আধুনিক কালের ঘটনাবলী নিয়ে দায়িত্বশীল উপায়ে ভাবেননি বা ভাবতে চাননি ওরা। সীমিত অর্থে ওদের কাজ স্থির বলে ধরে নেয়া ইসলামী বিন্যাসে অথবা পুরোনো ভাষাতাত্ত্বিক প্রশ্নে আটকা-পড়ে, কিংবা "ধ্রুপদ" ইসলামের ধারণায় বাঁধা। এদের কাজ কোনো অবস্থাতেই আধুনিক ইসলামের জগত বুঝার ক্ষেত্রে সহায়ক নয়। অথচ এই ইসলাম এর আকর্ষণীয় উপাদানগুলোর ওপর নির্ভর করে প্রথমযুগের শতকগুলোয় (সপ্তম-নবম শতকে) আভাসিত পথ থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন পথে বিকশিত হচ্ছিলো, সকল উদ্দেশ্য ও প্রয়োজন সমেত।

আধুনিক ইসলাম বিষয়ে—কিংবা বলা যায় আঠারো শতক থেকে পরবর্তী সময়ের ইসলামী বিশ্বের সমাজ, জনগোষ্ঠী, ও প্রতিষ্ঠান সম্পর্কে—বিশেষজ্ঞগণ এমন এক স্থিরীকৃত পরি-কাঠামোর সীমানার ভেতরে কাজ করেছেন যা ইসলামী বিশ্বের দ্বারা নির্ধারিত হয়নি। বৈচিত্র্য ও জটিলতা থাকা সত্ত্বেও এ বাস্তবতাকে আবার অতিরিক্ত গুরুত্ব দেয়া যাবে না। অস্বীকার করার উপায় নেই, অক্সফোর্ড বা বোস্টনে বসে গবেষণারত পণ্ডিত সচরাচর গবেষণা করেন ও লিখেন তার গুরুর দ্বারা চিহ্নিত মানদণ্ড, প্রথা-রীতি ও আকাঙ্ক্ষা অনুযায়ী; যাদের নিয়ে গবেষণা সেই মুসলমানরা এতে কোনো প্রভাব ফেলতে পারে না। এ হয়তো অনিবার্য সত্য, তবু এর গুরুত্ব দিতে হবে। শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানগুলোর আধুনিক ইসলাম চর্চা মূলত আঞ্চল-বিদ্যার কর্মসূচীর অন্তর্ভুক্ত: যেমন পশ্চিম ইউরোপ, সোভিয়েত ইউনিয়ন, দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া, ইত্যাদি। কাজেই এগুলো জাতীয় নীতি নির্ধারণ কৌশলের সাথে সম্বন্ধযুক্ত, ব্যক্তি পণ্ডিতের একক পছন্দের সুযোগের মধ্যে নেই। হয়তো প্রিন্সটনের কেউ ঘটনাক্রমে আফগানদের ধর্মীয় মতামত

www.pathagar.com

সম্পর্কে গবেষণা করবেন। এ ধরনের অধ্যয়নের অবশ্যই (বিশেষত এই সময়) "রাজনৈতিক নিহিতার্থ" থাকতেও পারে। তাই সংশ্লিষ্ট পণ্ডিত না চাইলে সরকারী নেটওয়ার্ক, করপোরেট ও পররাষ্ট্র নীতি নির্ধারণী চক্রের সাথে জড়িয়ে পড়বেন; প্রভাব পড়বে গবেষণার তহবিলে, যে-সব লোকের সাথে দেখা হবে তারাও প্রভাবিত হবেন এবং হয়তো নির্দিষ্ট কিছু আদান-প্রদান ও পুরস্কারের প্রস্তাব আসবে। অর্থাৎ ইচ্ছা-অনিচ্ছায় যেভাবেই হোক, ঐ গবেষক বেচারা রূপান্তরিত হবেন "অঞ্চল বিশেষজ্ঞে"। কিংবা ইসরাইল বিষয়ে জুডিথ মিলার ও প্রচারণাকারী মার্টিন পেরেজের মত সাধারণ ও অযোগ্য হলে লোকে তার কথা শুনবে ধর্মসভার নীরবতা নিয়ে।

যাদের কাজ সরাসরি নীতি বিষয়ক ইস্যুর সাথে জড়িত (যেমন মুখ্যত রাষ্ট্রবিজ্ঞানী; ইতিহাসবিদ, অর্থনীতিবিদ, সমাজবিজ্ঞানী ও নৃ-বিজ্ঞানীও) তাদের সামনে থাকে স্পর্শকাতর— যদি বিপদজনক না-ও বলি— নানা ইস্যু যা আলোচনায় আনতেই হবে। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যায়, পণ্ডিত হিসেবে কারো অবস্থান কিভাবে সরকারের দাবীর সাথে তাল মেলাবে? ইরান একটি নিখুঁত উদাহরণ। শাহ্‌র শাসনামলে ইরানবিদদের জন্য পাহ্‌লভি ফাউন্ডেশন ও মার্কিন প্রতিষ্ঠানসমূহ থেকে সহজে অর্থপ্রাপ্তির সুযোগ ছিলো। এ অর্থ দেয়া হতো সেই সব গবেষণার কাজে যা শুরু হতো বর্তমান অবস্থা থেকে (অর্থাৎ সামরিক ও অর্থনৈতিকভাবে যুক্তরাষ্ট্রের সাথে বাঁধা পাহলভি শাসনামল থেকে); ব্যাপারটা এক অর্থে ঐ সময়ের ইরানে 'গবেষণা-নমুনায়' পরিণত হয়। সঙ্কটের শেষের দিকে পার্লামেন্টে গোয়েন্দা কর্মকর্তাদের বিষয়ে পার্মানেন্ট সিলেক্ট কমিটির অধ্যয়নে প্রকাশ পায় যে, শাহ্‌র শাসন সম্পর্কে যুক্তরাষ্ট্রের মনোভাব বর্তমান নীতিমালা দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলো, "বিরূপ সংবাদ গোপন করার মতো সরাসরি প্রক্রিয়ায় নয়, পরোক্ষ উপায়ে... নীতিনির্ধারকরা কখনো প্রশ্ন করেননি শাহ্‌র স্বৈরাচারী শাসন-ব্যবস্থা অনির্দিষ্ট কালের জন্য টিকবে কি না; কারণ চলমান নীতি বিশ্বাস করতো তা অনির্দিষ্ট কালের জন্য টিকবে।"[১৩] এর ফলে শাহ্‌র শাসনামল সম্পর্কে সিরিয়াস গবেষণা হয়েছে হাতেগোণা কয়েকটি মাত্র, যাতে শাহ-বিরোধিতার জনপ্রিয় উৎসগুলো চিহ্নিত করা হয়েছে। আমার জানামতে বার্কলের হামিদ আলগারই একমাত্র গবেষক যিনি সমকালীন ইরানের ধর্মীয় আবেগপ্রসূত রাজনৈতিক শক্তি পরিমাপ করতে সক্ষম হন; তিনি এমনকি অতদূর নির্ভুল ভবিষ্যৎবাণী করেন যে, হয়তো আয়াতুল্লাহ খোমেনির দ্বারাই ঐ শাসকগোষ্ঠীর পতন হবে। অন্যান্যদের মধ্যে রিচার্ড কোটাম ও এরভান্ড আব্রাহামিয়ানও তাদের লেখায় পূর্বোক্ত সূচনা বিন্দু (শাহ শাসনামল) ত্যাগ করেন; এদের সংখ্যা একেবারেই নগণ্য।[১৪] (নিরপেক্ষতার প্রয়োজনে বলে নেয়া দরকার ইউরোপীয় বামপন্থী পণ্ডিতরা শাহ্‌র স্থায়িত্বের ব্যাপারে সন্দিহান ছিলেন; তবে এরাও শাহ-বিরোধী রাজনৈতিক শক্তির ধর্মীয় উৎস চিহ্নিত করার ব্যাপারে সুবিধা করতে পারেননি[১৫])।

ইরানের কথা বাদ দিলেও বুদ্ধিবৃত্তিক ব্যর্থতার আরো বহু উদাহরণ আছে। ব্যর্থতার কারণ সরকারী নীতি ও জীর্ণ উক্তিগুলোর সমন্বয়ের ওপর বিশ্বাস স্থাপন। এখানে

www.pathagar.com

লেবানন ও ফিলিস্তিনের ঘটনা খুবই অর্থবহ দৃষ্টান্ত। বহুপাক্ষিক বা মিশ্র সংস্কৃতি কেমন হতে পারে তার একটা আদর্শ হিসেবে বিবেচিত হয়ে আসছিলো লেবানন, বহু বছর ধরেই। কিন্তু সেই আদর্শ এমন স্থির ও অপরিবর্তনীয় রূপ লাভ করে যে, এর আলোকে লেবাননের ওপর গবেষণা করার ফলে (১৯৭৫ সাল থেকে অন্তত ১৯৮০ সাল পর্যন্ত ব্যাপ্ত) গৃহযুদ্ধের ভয়াবহতা ও ত্রাসের বিন্দুমাত্র পূর্বাভাস দেয়া সম্ভব হয়নি। গৃহযুদ্ধের পূর্বে বিশেষজ্ঞদের চোখ যেন লেবাননের "সুস্থিরতার" ওপর বিশেষভাবে আটকে যায়: গবেষণায় পাঠ করা হয় প্রথানুসারী নেতৃত্ব, এলিট শ্রেণী, দল, জাতীয় চরিত্র ও চমৎকার সফল আধুনিকায়ন, ইত্যাদি।

এমনকি যখন লেবাননের রাজনীতিকে মনে হয়েছে বিপজ্জনক এবং "ভব্যতা" অপর্যাপ্ত, তখনো সার্বিক ধারণা ছিলো দেশটির সমস্যা নিয়ন্ত্রণযোগ্য, বিপর্যয় দেখা দেয়ার মতো নয়।[১৬] ষাটের দশকে এক বিশেষজ্ঞ আমাদেরকে জানালেন লেবানন "সুস্থির", কারণ "আন্ত:আরব" পরিস্থিতি সুস্থির; যতদিন এই সূত্র মেনে নেয়া হয়েছে ততদিন তিনি যুক্তি দিয়েছেন লেবানন নিরাপদ।[১৭] একবারও ভেবে দেখা হয়নি যে, আন্ত:আরব সুস্থিরতা অক্ষুন্ন থাকলেও লেবানীজ অস্থিরতা দেখা দিতে পারে। তার প্রধান কারণ প্রথাগত জ্ঞান — প্রচলিত মত-শাসিত এ ক্ষেত্রটির অন্যান্য বিষয়ের মত—এর ভেতরের ফাটল এবং আরব প্রতিবেশীদের অ-প্রাসঙ্গিকতা এড়িয়ে লেবাননের ওপর চাপিয়ে দিয়েছে আকাঙ্ক্ষিত "বহুত্ববাদ" ও সুসমন্বিত ধারাবাহিকতা। কাজেই কোনো বিপদ যদি আসে তা আসবে চারপাশের আরব দেশগুলোর তরফ থেকে, ইসরাইল বা যুক্তরাষ্ট্রের পক্ষ থেকে কখনো নয়; যদিও এই দুই দেশই নিজস্ব পরিকল্পনা চাপিয়ে রেখেছে লেবাননের ওপর। এই পরিকল্পনা কখনো বিশ্লেষিত হয়নি।[১৮] এরপর আছে স্বয়ং লেবানন—আধুনিকায়ন অতিকথার মূর্ত রূপদানকারী। এ জাতীয় জোলার-জ্ঞানের ধ্রুপদ উদাহরণগুলোর কোনো একটি এখন পড়তে গেলে বিস্মিত হতে হয় যে, এইসব উপকথা কি প্রশান্তি নিয়েই না ১৯৭৩ সাল পর্যন্ত চলে টিকে থাকতে পারে, যখন প্রকৃত অর্থে গৃহযুদ্ধ শুরু হচ্ছে! ভবিষ্যৎ সম্পর্কে আমাদের জানানো হয় লেবাননে বৈপ্লবিক পরিবর্তন আসতে পারে, তবে সম্ভাবনা খুবই "ক্ষীণ"; যা ঘটার সম্ভাবনা সবচেয়ে বেশি তা হচ্ছে "ভবিষ্যৎ আধুনিকায়নের ক্ষেত্রে বর্তমান রাজনৈতিক বিন্যাসের আওতায় জনগণের অংশগ্রহণ"[১৯] (এ যেন সাম্প্রতিক আরব ইতিহাসের সবচেয়ে রক্তক্ষয়ী গৃহযুদ্ধ সম্পর্কে দুঃখজনক কোমল কথার শ্লেষাত্মক ভবিষ্যৎবাণী)। কিংবা একজন প্রখ্যাত নৃ-বিজ্ঞানী যেমন বলেন, "লেবাননে 'বহুবর্ণের চমৎকার মিশ্রণ' অক্ষুণ্ন থেকে যায়। প্রকৃতপক্ষে, লেবানন তার আদিম গভীর ফাটলগুলোকে কেমন কার্যকরভাবে চমৎকার গলাধঃকরণ করে আছে।"[২০] এর ফলে লেবানন ও অন্যান্য দেশের ব্যাপারে বিশেষজ্ঞরা বুঝতে ব্যর্থ হন যে, উত্তর-উপনিবেশী রাষ্ট্রগুলোয় যা কিছু গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার তাকে সহজে "সুস্থিরতা" শব্দটির মনোহারিত্বে একপালভুক্ত করা সম্ভব নয়। লেবাননে ওগুলো ঠিক সেই সব ঘূর্ণায়মান শক্তি যা কখনো বিশেষজ্ঞদের দ্বারা চিহ্নিত

www.pathagar.com

হয়নি, অথবা অব্যাহতভাবে উপেক্ষিত হয়েছে: যেমন সামাজিক স্থানচ্যুতি, শিয়া জনগোষ্ঠীর সংখ্যাধিক্যের মত জনসংখ্যা বিষয়ক পরিবর্তন, স্বীকারোক্তিমূলক আনুগত্য, নানা মতবাদের প্রবাহ; এইসব মিলে প্রবল বর্বরতার মতো ছিঁড়ে ফেলেছে দেশটিকে।[২১] তেমনি প্রচলিত ধারার জ্ঞান নিকটপ্রাচ্যের রাজনৈতিক পরিস্থিতির যৌক্তিক বিশ্লেষণে উদ্বাস্তু ফিলিস্তিনীদেরকে বিবেচনাযোগ্য ও প্রভাবক রাজনৈতিক শক্তি হিসেবে দেখেনি, দেখেছে শুধুই উদ্বাস্তু হিসেবে যাদেরকে পুনরায় জায়গা করে দেয়া সম্ভব। তবুও সত্তর দশকের মাঝামাঝি থেকে যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্রনীতিতে প্রধানতম স্বীকৃত সমস্যায় পরিণত হয় ফিলিস্তিনীরা। এ সত্ত্বেও, ফিলিস্তিনীদের গুরুত্ব যেমনটা দাবী করে তেমন পণ্ডিতি ও বুদ্ধিবৃত্তিক মনোযোগ দেয়া হয়নি তাদের ব্যাপারে।[২২] বরং ওদেরকে মনে করা হয় যুক্তরাষ্ট্রের মিশর ও ইসরাইল সম্পর্কিত নীতিতে সামান্য অনুষঙ্গ মাত্র, আর লেবাননের আগুনে সমস্যা বিবেচনায় একেবারেই উপেক্ষণীয়। ১৯৮৭ সালে ইন্তিফাদা শুরু হওয়ার পর সমান বিস্মিত হয়ে যান কর্মকর্তা ও ভাষ্যকাররা। এইরকম নীতির অন্ধত্বের বিপরীতে কোনো বিশেষজ্ঞ মতামত দাঁড়ায়নি। মার্কিন স্বার্থের প্রশ্নে তার ফলাফলও বিপর্যয়কর হবে বলেই মনে হচ্ছে; কারণ, ইরান-ইরাক যুদ্ধ গোয়েন্দা সমাজকে বেকুব বানিয়েছে; দুই দেশের সামরিক শক্তি জরীপেও মারাত্মক ভুল ছিলো তাদের। এ ছাড়া, মূল কথা হলো যুক্তরাষ্ট্র ও তার 'এক পায়ে খাড়া' বিশেষজ্ঞরা আশা করতে পারেন না যে, যে-সব মুসলমান তাদের জাতভাইকে বসনিয়া, চেচনিয়া, ফিলিস্তিনে খুন হতে দেখেছে, তাদের জনসমর্থনহীন শাসকদেরকে যুক্তরাষ্ট্রের বন্ধু হিসেবে প্রশংসিত হতে দেখেছে, যারা তাদের ধর্ম ও সংস্কৃতিকে "ক্রুদ্ধ" ও 'হিংস্র" আখ্যায় সীমাহীন কলঙ্কিত হতে দেখেছে, তারা হাত বাড়িয়ে আন্তরিকভাবে আলিঙ্গন করবে যুক্তরাষ্ট্রকে।

এর সাথে যোগ করা যায় একই ধারার আরেকটি দুঃখজনক সত্য : আড়ালে-থাকা সরকারী স্বার্থ ও ঘরে-পালা গোদা পাণ্ডিত্যের মাঝখানে ইসলামী বিশ্ব সম্পর্কিত বিপুল সংখ্যক লেখক সংশ্লিষ্ট ভাষাটাও জানে না, ফলে তাদেরকে তথ্যের জন্য নির্ভর করতে হয় অন্যান্য পশ্চিমা লেখকদের ওপর। এই বর্ধিত নির্ভরশীলতা হচ্ছে বিষয়টির অফিসিয়াল বা প্রচলিত চেহারার ওপর একটা ফাঁদ। প্রাক-বিপ্লব ইরানে তাদের কর্মকাণ্ড পরিচালনার সময় এ ফাঁদেই ধরা পড়েছে প্রচার মাধ্যম। তারা একই কাজ করেছে *ইন্তিফাদার* পূর্বে এবং "মৌলবাদ" ও "সন্ত্রাস"-এর ব্যাপারে হিস্টিরিয়া চলাকালে। বার বার ফোকাস করা হয়েছে এবং পর্যবেক্ষণ ও পুনপর্যবেক্ষণ হয়েছে একই উপাদানগুচ্ছের ওপর: এলিট, আধুনিকীকরণ কর্মসূচী, সেনাবাহিনীর ভূমিকা. প্রথমসারির নেতৃবৃন্দ, স্পর্শকাতর সঙ্কট, জিহাদ নেটওয়ার্ক, (মার্কিন দৃষ্টিকোণ থেকে) ভূ-রাজনৈতিক কৌশল, "ইসলামী" প্রবেশপথ, ইত্যাদি সম্পর্কে।[২৩] হয়তো তখন এই বিষয়গুলো উপভোগ্য মনে হয়েছে যুক্তরাষ্ট্রের কাছে। কিন্তু বাস্তব এই যে, ইরানী বিপ্লবের মাত্র কয়েকদিনে আক্ষরিক অর্থেই ভেসে যায় এর সবকিছুই। দুমড়ে পড়ে গোটা রাজকীয় পরিষদ; বহু বিলিয়ন ডলারে পোষা আর্মি বিভক্ত হয়ে পড়ে;

www.pathagar.com

তথাকথিত এলিটরা হয় পালিয়ে বাঁচে, নয় তো খুঁজে নেয় নতুন পরিস্থিতির সাথে সম্পৃক্ত হওয়ার উপায়— যদিও কোনো ক্ষেত্রেই বোঝা সম্ভব হয় না যে এদের ভূমিকা ইরানী রাজনীতির গতিধারাকে প্রভাবিত করেছে কি না। পরিস্থিতি সম্পর্কে ভবিষ্যৎবাণী করতে সক্ষম হওয়ার কৃতিত্ব দেয়া হয় একমাত্র-যে "বিশেষজ্ঞ"কে তিনি টেক্সাস বিশ্ববিদ্যালয়ের জেম্‌স বিল। বিল প্রায় শেষদিকে, ১৯৭৮ সালের ডিসেম্বরে যুক্তরাষ্ট্রের নীতি-নির্ধারকদের পরামর্শ দেন যাতে "নতুন প্রক্রিয়া সূচিত করার জন্য... শাহ্‌কে"[২৪] উৎসাহ দেয়া হয়। লক্ষণীয় যে, আপাতভাবে ভিন্নমতাবলম্বী মনে হয়, এমন একজন বিশেষজ্ঞও সেই শাসকগোষ্ঠীকেই ক্ষমতায় রাখার জন্য সচেষ্ট যার বিরুদ্ধে ইতিহাসের প্রধানতম এক গণ-অভ্যুত্থানে জেগে উঠেছে লক্ষ লক্ষ স্বদেশী মানুষ।

অবশ্য বিল অন্তত এই গুরুত্বপূর্ণ কথাটা বলেছেন : সামগ্রিক বিচারে যুক্তরাষ্ট্র ইরান সম্পর্কে অজ্ঞ। তেমনি তার এসব কথাও যথার্থ যে, প্রচার মাধ্যমের প্রতিবেদনগুলো ছিলো কৃত্রিম, অফিসিয়াল রিপোর্টগুলো ছিলো পাহলভির ইচ্ছার অনুকূলে সাজানো; যুক্তরাষ্ট্র দেশটিকে ভালোভাবে জানার চেষ্টা করেনি, আবার বিরোধী দলের সাথে যোগাযোগও করেনি। বিল অবশ্য অতদূর বলতে যাননি যে, এই ব্যর্থতা হচ্ছে ইসলামী বিশ্ব ও তৃতীয় বিশ্বের প্রতি, স্বল্পমাত্রায় ইউরোপের, সামগ্রিকভাবে যুক্তরাষ্ট্রের দৃষ্টিভঙ্গির ব্যর্থতা, আবার তার লক্ষণও। আসলে, বিল যে তার ইরান সম্পর্কিত বক্তব্যের সাথে সমগ্র মুসলিম বিশ্বকে যুক্ত করেননি তাও ঐ দৃষ্টিভঙ্গিরও একটা দিক। প্রথম কথা হচ্ছে, মূল পদ্ধতিগত প্রশ্নটিকে সযত্নে আঁকড়ে ধরার চেষ্টা হয়নি। যেমন- "ইসলাম" ও ইসলামী পুনরুজ্জীবন সম্পর্কে কথা বলার মূল্য কী (যদি আদৌ থেকে থাকে)? দুই নম্বর কথা হচ্ছে, সরকারী নীতি ও পণ্ডিতি গবেষণার সম্পর্ক কেমন হওয়া উচিত? বিশেষজ্ঞরা কি রাজনীতির উর্ধ্বে থাকবেন, নাকি সরকারের রাজনৈতিক অংশে পরিণত হবেন? ব্রাউন বিশ্ববিদ্যালয়ের বিল ও উইলিয়াম বীম্যান আলাদা আলাদা আলোচনায় লিখেছেন যে, ১৯৭৯ সালের ইরান-যুক্তরাষ্ট্র সঙ্কটের মূল একটা কারণ হলো এই যে, ইসলামী বিশ্ব সম্পর্কে জ্ঞানার্জনের জন্য যেসব বিশেষজ্ঞ বহুমূল্যের শিক্ষা গ্রহণ করেছেন তাদের পরামর্শ গ্রহণ করা হয়নি।[২৫] কিন্তু বিল ও বীম্যান একটা বিষয় গুরুত্ব দিয়ে ভাবেননি যে, বিশেষজ্ঞদের পরামর্শ গ্রহণ না করার কারণটা হলো ঐসব বিশেষজ্ঞরা একইসঙ্গে এমন এক ভূমিকা বেছে নিয়েছেন আবার নিজেদেরকে পণ্ডিতও দাবী করেছেন যাতে তাদেরকে রহস্যময় মনে হয়েছে। ফলে তারা বিশ্বাসযোগ্য গণ্য হননি, না সরকার না বুদ্ধিবৃত্তিক সমাজের নিকট।[২৬]

তা ছাড়া এমন কোনো কায়দা আছে কি যার বলে স্বাধীন বুদ্ধিজীবী (বিদ্যায়তনিক পণ্ডিত বলতে তা-ই বুঝানো হয়) সরাসরি সরকারের জন্য কাজ করবেন, আবার তার স্বাধীনতাও বজায় রাখবেন। খোলামেলা রাজনৈতিক অংশীদারিত্ব এবং চমৎকার অন্ত র্দৃষ্টির মধ্যে কি সম্পর্ক? এর একটা কি আরেকটা বর্জন করে চলে, কিংবা কেবল কোনো কোনো ক্ষেত্রে তা করে? দেশে ইসলাম-বিশেষজ্ঞের বিশাল দলটির পাঠক

www.pathagar.com

সংখ্যা এত কম কেন? বিশেষত এখন, এমন এক সময়ে, যখন মনে হয় যুক্তরাষ্ট্রের সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন নির্দেশনা? বাস্তব ও প্রধানত রাজনৈতিক যে-পরিকাঠামো ইসলামী বিশ্ব ও পশ্চিমের সম্পর্ক ঐতিহাসিকভাবে শাসন করে এসেছে কেবল তার আওতায় এইসকল প্রশ্নের উত্তর দেয়া সম্ভব। তাহলে সেই পরিকাঠামোটি দেখা যাক এবং খুঁজে দেখা যাক ওতে কি ভূমিকা রয়েছে বিশেষজ্ঞদের।

ইউরোপ ও আমেরিকার ইতিহাসে এমন কোনো যুগ পাইনি আমি যেখানে আবেগ, আত্ম-অহমিকা ও রাজনৈতিক স্বার্থের দ্বারা সৃষ্ট ঐ পরিকাঠামোর বাইরে ইসলাম আলোচিত হয়েছে। একে অবশ্য বিরাট কোনো আবিষ্কার নাও মনে হতে পারে। তবে এর মধ্যেই আছে একটি পণ্ডিতি ও বৈজ্ঞানিক বিষয়ের যাবতীয় কিছু; উনিশ শতকের শুরু থেকে এ বিষয়টি নিজেই নিজেকে প্রাচ্যতাত্ত্বিক জ্ঞানশাখা হিসেবে পরিচিত করেছে অথবা, অন্তত প্রাচ্যকে নিয়ে সুশৃঙ্খল পদ্ধতিভিত্তিক কাজের চেষ্টা করেছে। কেউ ভিন্নমত পোষণ করার কথা নয় যদি বলি ইসলাম বিষয়ে প্রথম যুগের ভাষ্যকার মহান পিটার ও বার্থলেমি ডি হারবেলট তাদের কাজে চরমভাবে খ্রিস্টান তার্কিক। কিন্তু ইউরোপ আধুনিক বৈজ্ঞানিক যুগে প্রবেশ করে অজ্ঞতা ও কুসংস্কার কাটিয়ে ওঠার সময় প্রাচ্যতত্ত্বকেও সঙ্গে নিয়ে এগিয়েছে—এমন সিদ্ধান্ত আসলে অপরীক্ষিত অনুমান মাত্র। এ কথা কি সত্যি নয় যে, সিলভেস্ত্রা ডি সেসি, এডওয়ার্ড লেইন, আর্নেস্ত রেনান, হ্যামিল্টন গিব ও লুই ম্যাসিগনন প্রমুখ জ্ঞানী, বিষয়মুখি পণ্ডিত ছিলেন? এও কি সত্য নয় যে, প্রিন্সটন, হার্ভার্ড ও শিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়ের মতো প্রতিষ্ঠানে ইসলাম বিষয়ক শিক্ষকেরা সমাজতত্ত্ব, নৃ-তত্ত্ব, ভাষাবিজ্ঞান ও ইতিহাস অধ্যয়নে সকল অগ্রগতি আত্মস্থ করেছিলেন, তাই হয়ে উঠেছিলেন পরিপূর্ণ নিরপেক্ষ ও সকল আবেদনমুক্ত? উত্তরটা হলো 'না'। প্রাচ্যতত্ত্ব যে অন্যান্য মানবিক ও সামাজিক বিজ্ঞানের চেয়ে বেশি পক্ষপাতদুষ্ট হয়ে পড়ে, এমন নয়। এ বিষয়টিও মতবাদশাসিত এবং অন্যান্য বিষয়ের মতই বাস্তব পৃথিবীর দ্বারা আক্রান্ত। দুয়ের পার্থক্য হলো প্রাচ্যতাত্ত্বিক পণ্ডিতরা বিশেষজ্ঞ অবস্থানের শক্তিতে ইসলামের প্রতি তাদের গভীর আবেগ অস্বীকার করতে—এমনকি কখনো কখনো লুকাতে চেয়েছেন, এমন এক কর্তৃত্বময় ভাষায় যার উদ্দেশ্য "বিষয়মুখিতা" ও "বৈজ্ঞানিক নিরপেক্ষতা"র সনদ প্রদান।

এই গেলো একদিক। অন্য বিষয়টি তুলে ধরে প্রাচ্যতত্ত্বের বিশেষ বৈশিষ্ট্য অর্জনের ধরনটিকে; না হলে তা থেকে যেতো বোধের আড়ালে। আধুনিক কালে যখনই প্রাচ্য ও প্রতীচ্য (বা ইসলাম ও পশ্চিমের) মধ্যে তীব্র রাজনৈতিক উত্তেজনা দেখা দিয়েছে, পশ্চিম তখন প্রথমেই ত্রাসের আশ্রয় নেয়নি, বরং প্রতিনিধিত্বের শীতল, বিচ্ছিন্ন, আধা বিষয়মুখি ও বৈজ্ঞানিক হাতিয়ারগুলোকে আশ্রয় করার প্রবণতা দেখিয়েছে। এভাবে "ইসলাম" পরিষ্কার বোধগম্য হয়, এর হুমকির "যথার্থ চেহারা" বেরিয়ে পড়ে, এর বিরুদ্ধে একটি ধারাবাহিক পরোক্ষ তৎপরতা গ্রহণের প্রস্তাব আসে। এই পটভূমিতে, বিচিত্র পরিস্থিতির বাসিন্দা মুসলমানরা বিজ্ঞান ও প্রত্যক্ষ সন্ত্রাস উভয়কেই মনে করে ইসলামের বিরুদ্ধে আগ্রাসন।

www.pathagar.com

একই চেহারার দুটো দৃষ্টান্ত আমার কথাকে সমর্থন করে। অতীতের দিকে তাকালে আমরা দেখবো ফ্রান্স ও বৃটেন উভয়েই ইসলামী বিশ্বের কোনো কোনো অঞ্চল দখল করে নেয়ার আগের যুগটায় প্রাচ্যকে উপলব্ধি ও চিত্রিত করার বিভিন্ন পদ্ধতি কৌশল উল্লেখযোগ্যরকম আধুনিক ও উন্নত হয়েছে।[২৭] ১৮৩০ সালে আলজিরিয়া দখলের পরবর্তী দুই যুগে ফ্রান্সে প্রাচ্য বিষয়ক পড়ালেখা প্রাচীন নিদর্শনাদির আলোচনা থেকে পরিণত হয় একটি যুক্তিশীল বিষয়ে। অবশ্য, এর আগেই ১৭৯৮ সালে নেপোলিয়ান মিশর দখল করেন; তার কর্মসূচী আরো কার্যকর করা জন্য তিনি পূর্বেই বিরাট একদল প্রাচ্যতাত্ত্বিক পণ্ডিত প্রস্তুত করেন। আমার বক্তব্য হচ্ছে মিশরে নেপোলিয়ানের স্বল্পায়ুর দখল একটি অধ্যায়ের ইতি টানে। আরেকটি নতুন দীর্ঘায়ু অধ্যায়ের শুরু হয়, যখন ফ্রেঞ্চ ইনস্টিটিউট অব অরিয়েন্টাল স্টাডিজের সিলভেস্ত্রা ডি সেসির তত্ত্বাবধানে ফ্রান্স হয়ে ওঠে প্রাচ্যতত্ত্বের বিশ্বগুরু। এই অধ্যায়টি চরম পরিণতি পায় আর কিছুদিন পর, ১৮৩০ সালে ফরাসি সেনাবাহিনী কর্তৃক আলজিরিয়া দখলের ঘটনায়।

একটা ঘটনা বা বিষয়ের সাথে আরেকটা সম্পর্ক দেখানো আমার লক্ষ্য নয়। কিংবা আমি এমন অবুদ্ধিবৃত্তিক ধারণা গ্রহণ করছি না যে, সব বৈজ্ঞানিক জ্ঞান আমাদেরকে সন্ত্রাস ও দুর্ভোগের দিকেই নিয়ে যায়। আমি বলছি কোনো এক মুহূর্তে তাৎক্ষণিকভাবে সাম্রাজ্যের জন্ম হয়নি, তেমনি আধুনিক কালে কোনোরূপ পূর্ব-প্রস্তুতি ছাড়া সেগুলো পরিচালিতও হয়নি। যদি একথা সত্যি হয় যে, জ্ঞানের উন্নয়নের জন্য দরকার মানবীয় অভিজ্ঞতা পুনর্নির্ধারণ ও পুনর্গঠন এবং তা করবেন সেই সব বৈজ্ঞানিকেরা যারা তাদের অধ্যয়নের বিষয়ের চেয়েও উঁচু হয়ে দাড়িয়ে আছেন, তাহলে প্রসঙ্গেক্রমে আরেকটি ব্যাপার সত্য বলে ধরে নেয়া যায় যে, রাজনীতিবিদদের মধ্যেও একইরকম উন্নয়ন ঘটে যাদের কর্তৃত্ব পুনর্নির্ধারিত হয় পৃথিবীর বহু "নিকৃষ্ট" অঞ্চলকে অন্তর্ভুক্ত করার মধ্য দিয়ে; কেননা, সেই সব অঞ্চলে নতুন "জাতীয়" স্বার্থ আবিষ্কারের সম্ভাবনা দেখা দেয়; আবার কিছুদিন পর মনে হয় ঐ অঞ্চলগুলোর ওপর সার্বক্ষণিক নজরদারী প্রয়োজন।[২৮] মিশর দখল করার পর ইংল্যাণ্ড সুকৌশলে দীর্ঘমেয়াদী প্রাতিষ্ঠানিকীকরণ সম্পন্ন করে। প্রাচ্যতাত্ত্বিক জ্ঞানচর্চায় দীর্ঘদিনের লগ্নি ছাড়া তা সম্ভব হতো কি না সে ব্যাপারে আমার ঘোরতর সন্দেহ। সে লগ্নির সূচনা এডওয়ার্ড উইলিয়াম লেইন ও উইলিয়াম জোনসের মাধ্যমে: ঘনিষ্ঠ-পরিচয়, প্রবেশযোগ্যতা, প্রতিনিধিত্ব করার ক্ষমতা— এগুলো দেখিয়েছে প্রাচ্যতাত্ত্বিক পণ্ডিতেরা: অর্থাৎ প্রাচ্যকে দেখা সম্ভব, প্রাচ্য সম্পর্কে অধ্যয়ন করা সম্ভব, একে নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব। সমৃদ্ধ প্রাচ্যকে অসাধারণ, দুর্বোধ্য, দূরবর্তী হিসেবে সরিয়ে রাখার প্রয়োজন নেই। একে নিজের বাড়িতে নিয়ে আসা যায়, কিংবা ইউরোপই ওই জায়গাটাকে নিজের বাড়ি বানিয়ে নিতে পারে। যথারীতি তা-ই করেছে ইউরোপ।

আমার দুই নম্বর দৃষ্টান্তটি এ কালের। সম্পদ ও ভূ-রাজনৈতিক অবস্থানের কারণে ইসলামী প্রাচ্য এখন খুব গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু এর কোনোটাকেই স্থানীয় প্রাচ্যজনের স্বার্থ, প্রয়োজন ও আকাঙ্ক্ষার সাথে অদলবদল করা যায় না। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর থেকে

www.pathagar.com

যুক্তরাষ্ট্র ইসলামী প্রাচ্যে কর্তৃত্ব ও আধিপত্যশীল অবস্থান গুছিয়ে নিচ্ছে, আগে যা ছিলো ফ্রান্স ও বৃটেনের আয়ত্ত্বে। যুক্তরাষ্ট্র তার স্বার্থ নিরাপদ করার জন্য ১৯৯১ সালে যুদ্ধ করেছে উপসাগরীয় এলাকায়; একই কারণে সোভিয়েত ইউনিয়নের বিরুদ্ধে লড়াকু আফগান জঙ্গীদেরকে অস্ত্র দিয়েছে, গাজা ও পশ্চিম তীরে জেগে ওঠা জঙ্গী প্রবণতার বিরুদ্ধে গবেষণা ও গোয়েন্দা কাজ চালিয়েছে ইসরাইলের সাথে মিলে। এই যে এক সাম্রাজ্যবাদী পদ্ধতির দ্বারা আরেক সাম্রাজ্যবাদী পদ্ধতির জায়গা দখল, তার সাথে ঢুকে গেছে আরো দুটো জিনিষ : একটা হলো ইসলাম সম্পর্কে সঙ্কট-প্রসূত বিদ্যায়তনিক ও বিশেষজ্ঞ পর্যায়ের পরিমিত আগ্রহ; আরেকটা হলো প্রাইভেট সেক্টর প্রচার মাধ্যম ও ইলেকট্রনিক সাংবাদিকতা শিল্পে আয়ত্ত্বাধীন কৌশলে অসামান্য বিপ্লব। এর আগে প্রচার মাধ্যম এমন তাৎক্ষণিকতার সাথে ও নিয়মিতভাবে ইরান ও বসনিয়ার মত কোনো আন্তর্জাতিক সঙ্কট-কেন্দ্র কাভার করেনি। এজন্য মনে হয় যেন মার্কিন জীবনের সাথে মিশে গেছে ইরান, অথচ কত অচেনা, কেমন প্রগাঢ় দূর!

ঠিক যেমন হয়েছে ১৯৯০ দশকের বসনিয়ার বেলায়। প্রথমটির চেয়ে দ্বিতীয়োক্ত ক্ষেত্রে প্রবণতাগুলো আরো তীব্র হয়। এই দুই ঘটনার সাথে যুক্ত হয় বিশ্ববিদ্যালয়, সরকার ও বাণিজ্য বিশেষজ্ঞদের ইসলাম অধ্যয়নের উল্লেখযোগ্য কলাকৌশল। এইসব ব্যাপার একত্রে পশ্চিমের প্রতিটি সংবাদ-ভোক্তার নিকট ইসলামকে পরিণত করে জানা একটা বিষয়ে; ইসলামী বিশ্ব অথবা অন্তত এর প্রচারযোগ্য (তাদের মতে) বৈশিষ্ট্যের প্রায় সবগুলোকেই একেবারে ঘরোয়া ব্যাপার বানিয়ে ফেলে। এই জগতের ওপরই পশ্চিমের সাংস্কৃতিক ও আর্থ রঙ-রসের প্রভাব ছড়িয়ে পড়ে সবচেয়ে ব্যাপকভাবে; ইতিহাসে তার সমপর্যায়ের উদারহরণ আর নেই। অবশ্য তার কারণ এই নয় যে, বর্তমান আরব-ইসলামী অঞ্চলের মত আর কোনো অপশ্চিমা জগত যুক্তরাষ্ট্রের দ্বারা অত ব্যাপকভাবে প্রভাবিত হয়নি। আর পশ্চিমের রঙ-রস ছড়ানোতেই শেষ নয়, ইসলাম ও পশ্চিমের মধ্যে—এ ক্ষেত্রে, ইসলাম ও যুক্তরাষ্ট্রের— পারস্পরিক আদান-প্রদানও ছিলো একপাক্ষিক; তেমনি প্রচার-অযোগ্য বলে বিবেচিত অন্যান্য ইসলামী বিষয়গুলো হয়েছে উপেক্ষিত, টেরা-চাউনির শিকার।

মুসলিম ও আরবরা অনিবার্যভাবেই আলোচিত ও প্রচারিত হয়েছে এবং মনোযোগ লাভ করেছে হয় তেল-সরবরাহকারী নয়তো সন্ত্রাসী হিসেবে: এ বক্তব্যে অতিরঞ্জন একেবারেই সামান্য। এমনকি যাদের পেশা ইসলামী বিশ্ব সম্পর্কে রিপোর্ট করা তাদের ভাবনাতেও খুঁটিনাটি বিষয়, যেমন- মানুষের নিবিড়তা, আরব-মুসলিম জীবনের আবেগ ইত্যাদি কখনো জায়গা পায়নি। বরং আমরা পাই ইসলামী বিশ্বের একরাশ কাঁচা, মূলবাদী ক্যারিকেচার; এগুলো অন্যান্য বিষয়ের সাথে মিলিয়ে এমন কায়দায় পরিবেশিত হয়, যা সামরিক হামলার ঝুঁকির মুখে ফেলে দেয় ইসলামকে।[২৯]

১৯৭০-এর দশকে আরব উপসাগরীয় এলাকায় যুক্তরাষ্ট্রের সম্ভাব্য সেনা অভিযান, কার্টার মতবাদ, র‍্যাপিড ডিপ্লয়মেন্ট ফোর্স নিয়োগ এবং "ইসলাম"কে "আর্থ-সামরিক" উপায়ে মোকাবিলার আলোচনা হচ্ছিলো খুব। কিন্তু এ কোনো কাকতালীয়

www.pathagar.com

ব্যাপার নয় যে, এর আগে আগে একটা সময় গেছে যখন প্রায়ই "ইসলাম"কে যৌক্তিকভাবে উপস্থাপন করা হতো শীতল টেলিভিশন অনুষ্ঠানে এবং "বিষয়মুখি" প্রাচ্যতাত্ত্বিক অধ্যয়নে (আপাত-স্ববিরোধীভাবে, হয় আধুনিক বাস্তবতার সাথে এর "অপ্রাসঙ্গিকতার" আলোকে অথবা প্রচারণাপ্রবণ বিষয়মুখি বৈচিত্র্যের মধ্যে, যার পরিণাম হলো আরো বিচ্ছিন্নতা) : এর সাথে ভয়াবহ সাদৃশ্য আছে উনিশ শতকের ফ্রান্স ও বৃটেনের বিভিন্ন দৃষ্টান্তের, একটু আগেই যেগুলো আলোচনা করেছি।

আরো কিছু রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক কারণ আছে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর যুক্তরাষ্ট্র বৃটেন ও ফ্রান্সের সাম্রাজ্যবাদী ভূমিকা নিজের কাঁধে তুলে নেয়ার পর বাইরের পৃথিবীকে মোকাবিলা করার লক্ষ্যে এমন এক নীতিমালা তৈরি হয় যা ঐসব অঞ্চলের ভিন্ন ভিন্ন বৈশিষ্ট্য ও স্বতন্ত্র সমস্যাদির সাথে খাপ-খাওয়ানোর যোগ্য, যেখানে মার্কিন স্বার্থ প্রশ্নের সম্মুখীন (এবং ওগুলোর স্বার্থও মার্কিন প্রভাবে ক্ষতিগস্ত)। যুদ্ধের ক্ষয়-ক্ষতি কাটিয়ে ওঠার লক্ষ্যে কাজ করার জন্য চিহ্নিত হয় ইউরোপ। বিভিন্ন মার্কিন নীতির মধ্যে মার্শাল প্ল্যান এ লক্ষ্যের সাথে খাপ-খাইয়ে যায়। যুক্তরাষ্ট্রের সবচেয়ে দুর্ধর্ষ প্রতিদ্বন্দ্বীরূপে আবির্ভূত হয় সোভিয়েত ইউনিয়ন। কাউকে বুঝিয়ে বলার দরকার নেই যে, স্নায়ুযুদ্ধ যেসব নীতিমালা, গবেষণা ও এমনকি মনোভাব জন্ম দিয়েছে সেগুলো এখনো নিয়ন্ত্রণ করছে বড় শক্তিগুলোর পরস্পরিক সম্পর্ক এবং অন্যান্য রাষ্ট্রের সাথে ওদের সম্পর্ক। স্নায়ুযুদ্ধের শেষে তা তথাকথিত তৃতীয় বিশ্বকে ত্যাগ করে। এই তৃতীয় বিশ্ব হচ্ছে যুক্তরাষ্ট্র ও বিভিন্ন স্থানীয় শক্তির প্রতিদ্বন্দ্বিতার ক্ষেত্র, যেগুলো কিছুদিন আগেই উপনিবেশী শাসন থেকে স্বাধীনতা পেয়েছে।

প্রায় কোনো ব্যতিক্রম ছাড়া, সর্বপ্রথম মার্কিন নীতি-নির্ধারকদের বিবেচনাতেই তৃতীয় বিশ্বকে "অনুন্নত" মনে হয়। মনে হয় তা অর্থহীনভাবে সেকেলে ও স্থিরতর ঐতিহ্যিক জীবনযাত্রায় আটকে-পড়া, কমিউনিস্ট ষড়যন্ত্র ও আভ্যন্তরীণ অচলাবস্থার বিপদজনক ঝুঁকির সম্মুখীন। কাজেই যুক্তরাষ্ট্রীয় কায়দায় যুগের হালচাল হয়ে দাড়ায় তৃতীয় বিশ্বের "আধুনিকায়ন"। এবং, যেমন বলেছেন জেমস পেক, "আধুনিকায়ন তত্ত্ব ছিলো ক্রমেই বর্ধিষ্ণু বৈপ্লবিক আলোড়ন এবং স্থানীয় ঐতিহ্যিক রাজনৈতিক এলিটদের মধ্যে চলমান সংঘাতের বিরুদ্ধে মতবাদগত জবাব।"[৩০] বিশাল পরিমাণ অর্থ ঢেলে দেয়া হয় আফ্রিকা ও এশিয়ায় : উদ্দেশ্য কমিউনিজম ঠেকানো, মার্কিন বাণিজ্য বাড়ানো এবং স্থানীয় একদল সঙ্গী তৈরি করা; সঙ্গীদের উপস্থিতির সমর্থক যুক্তি ছিলো যে এরা পশ্চাদপদ দেশগুলোকে রূপান্তরিত করবে একেকটি মিনি-আমেরিকায়। পরে কর্মসূচী চালিয়ে যাওয়ার জন্য সূচনালগ্নের বিনিয়োগে আরো অর্থ ঢালা এবং সামরিক সমর্থন যোগানোর প্রয়োজন দেখা দেয়। এর থেকেই গোটা এশিয়া ও আফ্রিকায় মার্কিন হস্তক্ষেপের সূচনা হয়, যা প্রায়-প্রত্যেক প্রকৃতির স্থানীয় জাতীয়তাবাদের বিরুদ্ধে দাঁড় করিয়ে দেয় যুক্তারাষ্ট্রকে।

তৃতীয় বিশ্ব আধুনিকায়ন ও উন্নয়নের বিষয়টিকে ভালোভাবে বুঝতে হলে আরো কিছু ব্যাপার উপলব্ধি করতে হবে আমাদেরকে। যেমন এ নীতি নিজেই সৃষ্টি করে চিন্তার বিশেষ একটি ধরন, জন্ম দেয় ততীয় বিশ্বকে বিবেচনা করার বিশেষ এক দৃষ্টিভঙ্গির;

www.pathagar.com

একসময় এগুলোই আবার আধুনিকায়নের ধারণার পেছনে ঢেলে দেয় আরো রাজনৈতিক, আবেগগত ও কৌশলগত বিনিয়োগ। ভিয়েতনাম এর নিখুঁত দৃষ্টান্ত। একবার যখন সিদ্ধান্ত হয় যে দেশটিকে এর নিজের ও কমিউনিজমের হাত থেকে বাঁচাতে হবে, তখন জন্ম নেয় আধুনিকায়নের গোটা একটা বিজ্ঞান (যার সর্বশেষ বহুমূল্য পর্যায়টি পরিচিত হয় "ভিয়েতনামীকরণ" হিসেবে)। কেবল সরকারী বিশেষজ্ঞ নয়, জড়িত ছিলেন বিশ্ববিদ্যালয়ের বিশেজ্ঞরাও।

এক সময় দেখা গেলো কমিউনিজম-বিরোধী ও মার্কিনপন্থী দলের টিকে যাওয়া অংশটি সায়গনে সবকিছু নিয়ন্ত্রণ করছে; অথচ তখন সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষ মনে করছে ঐসব শাসকরা বিদেশী ও নিপীড়ক। এদেরই সমর্থনে পরিচালিত অসফল যুদ্ধে বিধ্বস্ত হয়ে গেছে গোটা দেশ, আর তার পরিণতি হিসেবে রাষ্ট্রপতির পদ হারিয়েছেন লিন্ডন জনসন। আমেরিকায় এখনো আধুনিকায়নের গুণকীর্তন বিষয়ক লেখালেখি সামাজিক ও সাংস্কৃতিক গুরুত্বে আসীন; সেই সঙ্গে তৃতীয় বিশ্বে জনমনে "আধুনিকায়নের" সাথে জড়িয়েছে বোকার মত অর্থ-অপচয়, অপ্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি-কলকব্জা ও অস্ত্রশস্ত্র, দুর্নীতিবাজ শাসক এবং ছোটো ছোটো দুর্বল দেশগুলোর কাজকর্মে যুক্তরাষ্ট্রের অমানবিক হস্তক্ষেপের প্রসঙ্গ।

আধুনিকায়ন তত্ত্বে টিকে যাওয়া অনেক বিভ্রমের একটি ইসলামী বিশ্বের সাথে বিশেষভাবেই সম্পর্কযুক্ত। তা হলো: যুক্তরাষ্ট্র এগিয়ে আসার আগে ইসলাম ছিলো এক রকম সুদীর্ঘ শৈশবে স্থির, প্রাচীন একরাশ কুসংস্কারের বেড়ায় আবদ্ধ থাকার কারণে উন্নয়ন থেকে বিযুক্ত; মোল্লা-মৌলানাদের বাধার কারণে তা মধ্যযুগ পার হয়ে আধুনিকতায় ঢুকতে অক্ষম। এই জায়গায় এসে প্রাচ্যতত্ত্ব ও আধুনিকতার তত্ত্ব সুন্দর জোড়া লেগে যায়। প্রাচ্যতত্ত্ব প্রচলিত কায়দায় শিখিয়েছে যে, মুসলমানরা তাদের মনের বিশেষ ধরন, উলেমাদল এবং অগ্রগতি ও পশ্চিম-বিরোধী শাসকদের প্রভাবে পরিণত হয়েছে নিয়তিবাদী নিপীড়ক শিশুতে। আদতে যদি তাই হতো তাহলে কি বিশ্বাসযোগ্য সকল রাষ্ট্রবিজ্ঞানী, নৃ-বিজ্ঞানী ও সমাজবিজ্ঞানী সুযোগ পেলে বুঝিয়ে দিতে পারতো না যে, ইসলামে ভোগ্যদ্রব্য ও "ভালো" শাসক মারফত আমেরিকান জীবনযাত্রার ধরন পরিচিত করে তোলা যায়? আসল সমস্যা হচ্ছে, চীন ও ভারতের মত নয় ইসলামী বিশ্ব; একে কখনো সম্পূর্ণ বশীভূত বা পরাজিত করা যায়নি। পণ্ডিতদের উপলব্ধির সাথে সংঘাতমুখি কতিপয় কারণে ইসলাম (বা এর কতক অংশ) তার অনুগামীদের ওপর নিয়ন্ত্রণ অব্যাহত রেখে চলেছে। এইসব অনুগামীদের সম্পর্কে যুক্তি দেখিয়ে বলা হয়ে থাকে এরা বাস্তবকে মানতে চায়না, নিদেনপক্ষে সেই বাস্তবকে মানতে অস্বীকার করে যেখানে পশ্চিমের শ্রেষ্ঠত্ব প্রদর্শনের সুযোগ রয়ে গেছে।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরবর্তী দুই দশক ধরে আধুনিকায়নের চেষ্টা চলতে থাকে। ইরান হয়ে উঠে আধুনিকায়নের সফলতার একটি কাহিনী, আর তার শাসক "আধুনিকায়িত", উৎকর্ষের উপমা। ইসলামী বিশ্বের বাকী অংশের বিরোধিতা করে পশ্চিমা পণ্ডিতরা, নয়তো ওদেরকে আলোচনাতেই আনে না। তারা হতে পারেন আরব জাতীয়বাদী

www.pathagar.com

নেতৃবৃন্দ, মিশরের জামাল আবদেল নাসের, ইন্দোনেশিয়ার সুকার্নো, ফিলিস্তিনী জাতীয়তাবাদী, ইরানের বিরোধী নেতৃবন্দ অথবা হাজার হাজার অপরিচিত ইসলামী শিক্ষক, ভ্রাতৃত্ব সংঘ। এই সব পণ্ডিতরা প্রধানত বিনিয়োগ করেন আধুনিকায়ন তত্ত্বের ওপর এবং ইসলামী বিশ্বে আমেরিকার কৌশলগত ও আর্থ স্বার্থে।

সত্তর দশকের বিস্ফোরণোন্মুখ সময়ে আবার তার মৌলবাদী আপসহীনতার প্রমাণ দেয় ইসলাম। যেমন ইরানের বিপ্লবঃ না আধুনিকতাপন্থী না কমিউনিষ্ট। যারা শাহকে ক্ষমতাচ্যুত করে তারা আধুনিকায়ন তত্ত্বের পূর্ব-নির্ধারিত আচরণ বিধিমালায় ব্যাখ্যেয় নয়। তারা আধুনিকায়নের দৈনন্দিন লাভের জন্য (গাড়ি, বিশাল সামরিক ও নিরাপত্তা ব্যবস্থা, সুস্থির শাসন) কৃতজ্ঞতাও বোধ করে না এবং "পশ্চিমা" মতবাদসমূহের চাটুকারিতার মুখেও নির্বিকার।[৩১] এদের—বিশেষ করে খোমেনির যে ব্যাপারটা সবচেয়ে সমস্যাজনক মনে হয় তা হচ্ছে, এমন যে-কোনো শাসন ব্যবস্থা মেনে নিতে মারমুখি অনীহা যা তাদের নিজস্ব নয়। সবচেয়ে বড় কথা, এরা এমন এক ইসলামে বিশ্বস্ত যা বিশেষভাবে ইরানী প্রকৃতির, হিংস্র প্রতিদ্বন্দ্বিতার বিষয়, এবং নিজস্ব ধরনে সমর্থিত; এ সমর্থনও যেন মারমুখি। অথচ ইরানের কয়েক মাইল পশ্চিমে বেনিনের ইসরাইলে ক্ষমতাসীন শাসকদল এক পায়ে খাড়া হয়ে আছে ধর্মীয় কর্তৃপক্ষের অনুমোদনক্রমে তাদের কাজকর্ম পরিচালনা করার জন্য, যার ভিত্তি অত্যন্ত পশ্চাদপদ এক ধর্মীয় মতবাদে। অথচ, অবাক হওয়ার মত ব্যাপার যে, পশ্চিমের যে-সব পণ্ডিত ইসলামের অতীতমুখিনতা নিয়ে কথা বলেন তাদের দুএকজন মাত্র ইসরাইলের প্রসঙ্গ তুলেছেন।[৩২] তারচেয়েও কম সংখ্যক ভাষ্যকার এ প্রসঙ্গ উল্লেখ করেছেন যে, যুক্তরাষ্ট্রের টেলিভিশন ধর্মে অনুপামির সংখ্যা বহু মিলিয়ন, কিংবা ১৯৮০ সালের নির্বাচনে প্রতি তিনজন প্রেসিডেন্ট পদপ্রার্থীর দুই জনই আরেক জন্মে খ্রিস্টান হয়ে জন্ম নিতে আগ্রহী। এইসব ভাষ্যকাররাই ইসলামী উত্থানের নিন্দা করেন। কিন্তু তার সাথে যুক্তরাষ্ট্রের উপরোক্ত পরিস্থিতির কোনো মিল দেখেন না।

দু'একটা প্রাচ্যতাত্ত্বিক সাধারণীকৃত মন্তব্য উল্লেখ করা এখন একরম রীতিতে পরিণত হয়েছে (এগুলোর অধিকাংশই প্রচারিত হয়েছে বার্নার্ড লুইসের মত প্রবীণ প্রাচ্যতাত্ত্বিকদের দ্বারা)। এগুলো উল্লেখের উদ্দেশ্যে হলো গোটা ইসলামী বিশ্বের মুখে একটা চড় মারা। এইসব মামুলী কথা প্রত্যেক মুসলমানের আচরণের প্রতিনিধিত্ব করে কি না সেই খোঁজ নেয়ার প্রয়োজন দেখেন না। এই প্রবণতার সবচেয়ে তীব্র প্রকাশ দেখা যায় ইসলাম ও সন্ত্রাসকে একই ব্যাপার প্রমাণ করার আলোচনায়। এক কালের বামপন্থী, পরে ১৯৮০-র দশকে প্রতিক্রিয়াশীল ডানপন্থীতে রূপান্তরিত কনর ক্রুজ ও ব্রায়ানের কথা বিবেচনা করা যাক। দক্ষিণ আফ্রিকায় ভয়ংকর নিষ্ঠুরতার প্রতিবাদে সংগঠিত সাংস্কৃতিক বয়কট ভেঙ্গেছিলেন এই কনর; ডানপন্থী ইসরাইলী ইহুদিবাদকে যথার্থ প্রমাণের জন্য তার যুক্তির শেষ নাই। এ সত্ত্বেও তিনি প্রগতিশীল বুদ্ধিজীবী হিসেবে পরিচিত। এখানে একটি প্যারা তুলে দেয়া হলো, যাতে আছে অলস ঐতিহাসিক-বিচার ও অতিমাত্রার সাধারণীকরণ এবং এমন অবিশ্বাস্য সব ছাঁচ নির্মাণ।

www.pathagar.com

ইসলাম সম্পর্কে গুরুত্বসহকারে চিন্তা করে এমন যে কোনো মানুষ এই সব ছাঁচ গ্রহণ করবে না, কেবল প্রায়-মূর্খ ছাড়া:

> কিছু সংস্কৃতি ও উপ-সংস্কৃতি এবং হতাশাব্যঞ্জক হেতু সন্ত্রাসের বংশবৃদ্ধির পূর্ব-নির্ধারিত উর্বর ক্ষেত্র। এর সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য দৃষ্টান্ত হলো ইসলামী সংস্কৃতি (ও ব্রায়ান কিন্তু আমাদেরকে বলেননি কিভাবে তিনি ধর্ম থেকে একলাফে সংস্কৃতিতে চলে গেলেন, এর প্রত্যেকটির সীমানাই বা কোনখানে শেষ)। নিজের সম্পর্কে এ সংস্কৃতির মত হলো পৃথিবীতে তার অবস্থান সঠিক (এমন সুবিধাজনক তথ্য কোথায় পেলেন ব্রায়ান?); অথচ সমকালীন বিশ্ব-বিন্যাসের সাথে তার ফারাক অনেক (এ কথা বলা যায় প্রায় যে-কোনো সংস্কৃতির "আত্ম-ধারণা" সম্পর্কে)। খোদার ইচ্ছা যুদ্ধের বংশধরদের (অমুসলিম বিশ্ব) ওপর ইসলামীদের বিজয়, তবে কেবল আধ্যাত্মিক শক্তিতে তা অসম্ভব। উপসাগরীয় এলাকায় ইরানী মৌলবাদীদের শ্লোগান ছিলো "ইসলাম অর্থ বিজয়" (ইরান-ইরাক যুদ্ধ, ১৯৮০-৮৮)। যুদ্ধের বংশধরদের ওপর আঘাত হানার কথাটা বেশ মেধাদীপ্ত; তেমনি পশ্চিমে নিন্দিত এইসব তৎপরতার পেছনে যথেষ্ট জনসমর্থনও ছিলো। (লক্ষণীয় যে, আলোচনায় ব্রায়ান বিশেষ কোনো ঘটনা, তথ্যের উৎস, উদ্ধৃতি বা পটভূমি জানাননি পাঠকদেরকে; তিনি আলোচনার এমন উদ্ভট পদ্ধতি বা যুক্তিবিন্যাস সম্পর্কে নিরুদ্বেগ)। তৎপরতার আসল লক্ষ্য ইসরাইল (ইসরাইল কি করেছে, এখনো করছে সে প্রসঙ্গ আলোচনায় আসে না; এ হচ্ছে নিখুঁত ইসলামী ত্রাস)। কিন্তু ইসরাইল নিশ্চিহ্ন হয়ে গেলেও এইসব তৎপরতা থেমে যাবে বলে মনে হয় না। ("থিংকিং এ্যাবাউট ইসলাম", *দি আটলান্টিক*, জুন ১৯৮৬, পৃ-৬৫)।

এভাবে, নির্দিষ্ট একরকম ধর্মীয় আবেগের মারমুখি তীব্রতাকে কেবল ইসলামের সাথে জড়িয়ে দেয়া হয়; যদিও এখন সর্বত্র ধর্মীয় আবেগের বিস্তার ঘটছে। সোলঝেনেৎসিন বা পোপ দ্বিতীয় পলের মত মার্কামারা ধর্মীয় ব্যক্তিত্বদের নিয়ে তথাকথিত উদারনৈতিক প্রচার মাধ্যমের প্রচারণা এবং বসনিয়ায় মুসলিম গণহত্যার ঘটনাকে খ্রিস্টান ধর্মের সাথে সম্পর্কিত না করার প্রবণতায় বোঝা যায় ইসলামের প্রতি কেমন পক্ষপাতদুষ্ট ও হিংসাত্মক মনোভাব পোষণ করা হয়।[৩৩] উদ্ভট ধর্মীয় যুক্তির কারণে যে দেশটি ক্যাম্প-ডেভিড চুক্তি গ্রহণ করেনি সেই সৌদী আরব থেকে শুরু করে পাকিস্তান, আফগানিস্তান, আলজিরিয়া প্রভৃতি বহু মুসলিম দেশের আলোচনায় ধর্মীয় আবেগের দিকে প্রত্যাবর্তনের প্রসঙ্গ তোলা এখন চলতি রীতি। সৌদী আরব ও কুয়েতকে "মুক্ত পৃথিবীর" অংশ বলার উপায় নেই; এমনকি শাহ্‌র আমলের ইরান প্রচণ্ড সোভিয়েত-বিরোধী অবস্থান নেয়া সত্ত্বেও দেশটিকে কখনো "আমাদের" বলে মনে হয়নি, যেমন মনে হয় ফ্রান্স বা বৃটেনকে। এ সত্ত্বেও নীতি-নির্ধারকরা ইরানকে "হারিয়ে" ফেলার কথা বলতে থাকেন, যেমন এর আগে চীন, ভিয়েতনাম ও এঙ্গোলা

www.pathagar.com

"হারিয়ে ফেলার" কথা বলতেন , প্রায় প্রথম তিন যুগ ধরে। তাছাড়া আমেরিকার সঙ্কট-ম্যানেজারদের বিবেচনায় পারস্য উপসাগরীয় এলাকায় সামরিক দখলের জন্য উন্মুক্ত দেশসমূহের মধ্যে একমাত্র ইরানই একটি অশান্তিদায়ক সমস্যা। ১৯৭০ সালের জুন ২৮ তারিখের *নিউইর্য়ক টাইমস ম্যাগাজিনে* জর্জ বল লিখেন "ভিয়েত নাম শোকগাঁথা" দেশে যুদ্ধবিরোধী মনোভাব ও বিচ্ছিন্নতার নীতির প্রতি সমর্থন জাগাতে পারে। কিন্তু মধ্যপ্রাচে মার্কিন স্বার্থ এত বিরাট যে প্রেসিডেন্টের উচিত ওখানে সম্ভাব্য সামরিক আক্রমণের জন্য এদেশের মানুষদেরকে আগাম শিখিয়ে-পড়িয়ে রাখা।[৩৪] ১৯৯১ সালের উপসাগরীয় যুদ্ধে অন্যতম মূলভাব ছিলো ভিয়েতনাম-জ্বিনের কবর দেয়া।

আরেকটা বিষয় আলোচনায় আসা দরকার: দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর থেকে ইসলামের প্রতি মার্কিন মনোভাব গঠনে ইসরাইলের ভূমিকা। প্রথম কথা, ইসরাইলের স্বীকৃত ধর্মীয় চরিত্র কদাচ আলোচিত হয়েছে মার্কিন প্রচার মাধ্যমে। এই কিছুদিন থেকে ইসরাইলীদের ধর্মীয় উন্মাদনার কথা প্রকাশ্যে বলা হয়, যার বেশিরভাগই গাশইমুনিমের ইহুদি ধর্মান্ধতা সম্পর্কে। ইমুনিমের মূল তৎপরতা হলো পশ্চিম তীরে জোরপূর্বক বসতি স্থাপন। কিন্তু আসলে সম্প্রতি তৎপর ধর্মান্ধ ইহুদিরা নয়, ইসরাইলের "অসাম্প্রদায়িক" সরকারই যে দখলকৃত আরব এলাকায় বসতি স্থাপনের কর্মসূচীকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দিয়েছে, সে সত্য অনেক আলোচনাতেই বাদ দেয়া হয়। আমি মনে করি, এ ধরনের এক-পাক্ষিক প্রতিবেদন থেকে বোঝা যায় কিভাবে ইসরাইলকে ইসলামের বিরুদ্ধে একটা প্রতিবন্ধক বল্লম হিসেবে ব্যবহার করা হচ্ছে; এ ইসরাইল হলো মধ্যপ্রাচ্যের "একমাত্র গণতন্ত্র", এবং "আমাদের" একনিষ্ঠ মিত্র।[৩৫] এভাবে ইসরাইল পরিণত হয় বন্য ইসলামের মধ্য থেকে কেটে তোলা বুরুজ (প্রচুর আত্ম-প্রশংসা ও স্বীকৃতিসহ)—যার কাজ পশ্চিমা সভ্যতাকে রক্ষা করা। দ্বিতীয়ত, আমেরিকানদের দৃষ্টিতে ইসরাইলের নিরাপত্তা ব্যবস্থাকে প্রয়োজনের সময় ইসলামী বিশ্বকে প্রাচীরাবদ্ধ করার কাজেও ব্যবহারযোগ্য; পশ্চিমের আধিপত্য স্থায়ী করা ও আধুনিকায়নের গুণাবলী প্রদর্শনেরও কাজে লাগে। এভাবে, প্রাচ্যে পশ্চিমের স্বার্থ ও ভাবমূর্তি উন্নয়নের জন্য তিন ধরনের বিভ্রম অর্থনৈতিকভাবে একে অপরকে উৎসাহিত ও পুনঃসৃজন করেছে : ইসলাম সম্পর্কিত মনোভাব, আধুনিকায়ন মতবাদ এবং ইসরাইলের সামগ্রিক মূল্যবোধে পশ্চিমের প্রতি ইতিবাচকতা।

উপরন্তু, ইসলাম সম্পর্কে "আমাদের" মনোভাব পরিষ্কার বোধগম্য করার প্রয়োজনে যুক্তরাষ্ট্রে তথ্য-সংশ্লিষ্ট ও নীতি-নির্ধারণী ক্ষেত্রে সক্রিয় গোটা এক গুচ্ছ যন্ত্র-সমবায় নির্ভর করেছে ঐ তিন বিভ্রমের ওপর; এগুলোকে ছড়িয়ে দিয়েছে ব্যাপক পরিসরে। ভূ-রাজনৈতিক কৌশলবিদদের সাথে জোটে বাঁধা বড়সড়ো একদল বুদ্ধিজীবীও ইসলাম, তেল, পশ্চিমা সভ্যতার ভবিষ্যত এবং আন্দোলন-সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে গণতন্ত্রের যুদ্ধ বিস্তারের ধারণা—প্রদান করেছেন। পূর্বালোচিত কারণে এ ধারায় আরো জ্বালানী যুগিয়েছে ইসলাম বিশেষজ্ঞরা; যদিও স্বীকার করা দরকার যে, প্রাতিষ্ঠানিক ইসলাম

www.pathagar.com

চর্চার একটা অংশ মাত্র ভূ-রাজনৈতিক কৌশল ও স্নায়ুযুদ্ধের মতবাদের সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি দ্বারা সরাসরি কলুষিত হয়েছে। এর নিচেই আছে গণমাধ্যমগুলো; এরা গ্রহণ করে উপরোক্ত দুই স্তর থেকে; অতপর গৃহীত জিনিষগুলো চাপ দিয়ে রূপান্তরিত করে নেয় ক্যারিকেচার, ভয়ংকর জনতা বা ইসলামী শক্তির ভাবমূর্তি, ইত্যাদিতে। ওদের আত্ম-অহমিকা ও অজ্ঞতার সর্বোচ্চ প্রকাশ দেখা গেছে ওকলোহামা সিটিতে বোমা বিস্ফোরণের সময় (এপ্রিল, ১৯৯৫)। স্টিভেন এমারসনের মত "বিশেষজ্ঞদের" নেতৃত্বে ওরা একযোগে লাফ দিয়ে সাদামাটা সিদ্ধান্তে পৌছে যায় যে, বোমা-বিস্ফোরণের পেছনে আছে ইসলামী সন্ত্রাসীরা। ১৯৯৬ সালের জুলাইয়ে টিডব্লিউএ ফ্লাইট নম্বর-৮০০ দুর্ঘটনায় পড়লে এই দলটি আবার একই দোষারোপ শুরু করে, অবশ্য এবার একটু নিচু গলায়। এর সব কিছুর তত্ত্বাবধায়ক হচ্ছে পরাশক্তির বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান: তেল কোম্পানী, বিশাল করপোরেশন ও বহুজাতিক কোম্পানী, নিরাপত্তা ও গোয়েন্দা সম্প্রদায়, সরকারের নির্বাহী বিভাগ।

১৯৭৮ সালে প্রেসিডেন্ট কার্টার প্রথমবারের মত নতুন বছরের সূচনালগ্নটি কাটালেন তার অফিসে ইরানের শাহ্‌র সঙ্গে এবং বললেন ইরান হচ্ছে "সুস্থিরতার একটি দ্বীপ"। সেই মুহূর্তে কার্টার কথা বলছিলেন ঐ দুধর্ষ যন্ত্রগুচ্ছের ঘূর্ণায়মান শক্তি নিয়ে; তিনি মার্কিন স্বার্থের প্রতিনিধিত্ব করছিলেন, আবার তুলে ধরছিলেন ইসলামের ভাবমূর্তিও। আঠারো বছর পর, যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিরক্ষা সচিব সৌদী আরব সফরে এসে আগষ্টের দুই তারিখে যখন বললেন খোবার বোমা-বিস্ফোরণের জন্য দায়ী অপরাধীর তালিকায় ইরানের নাম এক নম্বরে এবং দেশটির বিরুদ্ধে "কঠোর পদক্ষেপ" নেয়া হবে, তখন তিনিও কথা বলছিলেন ঐ যন্ত্রটির বলে বলীয়ান হয়ে; এমনকি কিছুদিন পর যখন তিনি তার বক্তব্য সম্পূর্ণ উল্টে দেন, তখনো তা করেন সেই শক্তির প্রভাবেই।

www.pathagar.com

তাফসীরকারী সম্প্রদায়

ভূ-রাজনৈতিক কৌশলবিদ ও উদারনৈতিক বুদ্ধিজীবীরা কিভাবে ইসলামকে ব্যবহার করছে তা এখানে আলোচিত হওয়ার দাবী রাখে। ১৯৭৪ সালে তেলের দাম আতকা বেড়ে যাওয়ার আগ পর্যন্ত যুক্তরাষ্ট্রের প্রচার মাধ্যম বা সংস্কৃতিতে "ইসলামের" খুব একটা গুরুত্ব ছিলো না বললে বাড়িয়ে বলা হয় না। ওরা অনেক আরব, ইরানী, পাকিস্তানী বা তুর্কি দেখেছে বা ওদের কথা শুনেছে। কিন্তু মুসলমান দেখেছে বা তার কথা শুনেছে ক্বচিৎ। কিন্তু আমদানী করা তেলের দাম হঠাৎ বেড়ে যাওয়ায় ঘটনাটি জনমনে কিছু অশান্তিদায়ক ব্যাপারের সাথে জড়িয়ে যায়। যেমন আমদানী করা তেলের ওপর নির্ভরশীলতা থেকেই শুরু হয় "বিদেশী তেল-উৎপাদকের করুণার শিকার হওয়ার" কথা, মধ্যপ্রাচ্য ও পারস্য উপসাগরীয় অঞ্চল থেকে আপসহীন মনোভাব দেখানো হচ্ছে ব্যক্তি আমেরিকানদের প্রতি— এমন অনুমান; সর্বোপরি, মনে হয় যেন কোনো নয়া অজানা শক্তি সংকেত দিচ্ছে যে, জ্বালানী তেল আর "আমাদের" নিয়ে আসার জন্য নয়। আচমকা বাজার পেয়ে যায় *একাধিপত্য, বাধাদান, আটকানো* প্রভৃতি শব্দ। অথচ বহুজাতিক মার্কিন কোম্পানিগুলোর ছোট দলটির ব্যাপারে 'বাধাদান' শব্দটি ব্যবহার করে না কেউ, তা কেবল ওপেক সদস্যদের জন্য আলাদা করে তুলে রাখা। যদিও এখন মনে হয়, মূলত অর্থনীতির ওপর নয়া চাপ ছিলো, হাতের কাছে ছিলো নয়া সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক পরিস্থিতি। আর হঠাৎ আধিপত্যশীল শক্তির অবস্থান থেকে একরকম লড়াইয়ের মুখে পড়ে যায় যুক্তরাষ্ট্র নিজেই। *কমেন্টারি* পত্রিকায় ফ্রিৎজ স্টার্ন লিখেন, এখন যুদ্ধোত্তর কালপর্ব উত্তীর্ণ।[৩৬] সম্ভাব্য পরিবর্তন সম্পর্কে প্রথম দিককার কিছু উল্লেখযোগ্য মন্তব্য ছাপা হয় *কমেন্টারিতে*, ১৯৭৫ সালের প্রথম দিকে। প্রথম রবার্ট থুকারের লেখা "তেল: মার্কিন হস্তক্ষেপ ইস্যু"(জানুয়ারী), এরপর ড্যানিয়েল প্যাট্রিক ময়নিহানের "বিরোধিতার মুখে যুক্তরাষ্ট্র"(মার্চ)। উভয়ের লেখার শিরোনামই নির্ভুলভাবে ইঙ্গিত করে তাদের যুক্তিটা কি। ময়নিহান জাতিসংঘে যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিনিধিত্ব করেন। ওখানে বহু বক্তৃতায় তিনি বিশ্বের দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলেন যে, কেবল সংখ্যায় বেশি হওয়ার কারণে প্রাক্তন উপনিবেশগুলো ত্রাস চালিয়ে যাবে আর "পশ্চিমা গণতন্ত্র" বসে বসে তা দেখবে, এমনটি হতে পারে না।" তিনি তার বক্তব্যের শর্তগুলো নেন *কমেন্টারিতে* প্রকাশিত তার আর ময়নিহানের পূর্বোক্ত নিবন্ধগুলো থেকে।

দুজনের কারোরই ইসলাম সম্পর্কে কিছু বলার নাই। কিন্তু থুকার ও ময়নিহান কর্তৃক বর্ণিত হঠাৎ-পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে "ইসলাম" যে নির্ধারিত ভূমিকা পালনের জন্য

www.pathagar.com

এগিয়ে যাচ্ছে, তা বোঝা যায় আরও বছর খানেক পর। যুক্তরাষ্ট্রে অনেকে যে অভিজ্ঞতার মুখোমুখি হচ্ছিলেন তাতে আকুতি, ভাষা ও নাটকীয় গঠনসুষমা দেন ঐ দুজন। যুক্তরাষ্ট্রের ইতিহাসে এই প্রথম মনে হয় বুঝি বাইরে থেকে যুক্তরাষ্ট্রে ছড়িয়ে পড়ছে "সমতাবাদী" বোধ; নামটা থুকারের দেয়া। ময়নিহানের মতে "বাইরে থেকে" কথাটার অর্থ হলো বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের সৃষ্ট জাতিসমূহ থেকে, যাদের আত্মপরিচয় ও ভাবধারা উৎসরিত হয়েছে বৃটিশ সমাজতন্ত্র থেকে। ওদের দর্শনের ভিত্তি হলো সম্পদের অধিগ্রহণ, না হলে বণ্টন। ওরা কেবল সমতায় আগ্রহী, উৎপাদনে নয়; মনে হয় মুক্তিতেও ওদের আগ্রহ নেই। "আমরা লিবার্টি পার্টির অন্তর্ভুক্ত!", ময়নিহান বলেন এবং মিলিটারীসুলভ দৃঢ়তায় যোগ করেন, "ঐসব ব্যানার খুলে ফেলে দিলে তা থেকে অতটা শক্তিই মুক্তি পেতে পারে যা আমাদের অবাক করে দেবে।"[৩৭]

এইসব নয়া জাতিসমূহের মধ্যে তেল-উৎপাদকও আছে। "আমাদের" ও "ওদের" মধ্যে বিদ্যমান বৈষম্য সম্পূর্ণ দূর করতেই ওদের আগ্রহ; থুকারের মতে যা সূচনা করবে অশুভ "পরস্পর-নির্ভরশীলতা"। তিনি তাই এ ভবিষ্যৎ পরিস্থিতি ঠেকানোর পক্ষে, প্রয়োজনে ঐসব দেশ দখল করে হলেও।[৩৮]

ঐ দুটো নিবন্ধে ব্যবহৃত কিছু কৌশল উল্লেখ করার মত। থুকারের তেল-উৎপাদক দেশ কিংবা ময়নিহানের তৃতীয় বিশ্বের নয়া দেশগুলোর কোনটারই আত্মপরিচয়, ইতিহাস বা নিজস্ব জাতীয় সামর্থে পরিচালিত হওয়ার ক্ষমতা নাই। ঐ সব দেশকে সংক্ষেপে উল্লেখ ও চিত্রিত করা হয় একত্রে একটি দল হিসেবে, এরপর বাদ দিয়ে দেয়া হয়। প্রাক্তন উপনিবেশ হলো প্রাক্তন উপনিবেশ, তেল উৎপাদক দেশ হলো তেল-উৎপাদক দেশ। এ ছাড়া সবই নামপরিচয়হীন—বিস্ময়করভাবে, এমনকি হুমকির মতো, অদম্য। ঐদেশগুলোর "ওখানটায় অস্তিত্বশীল হওয়ার" বৈশিষ্ট্যও আমাদের জন্য ঝুঁকি-নির্দেশক। দ্বিতীয়ত, এ দেশগুলো যেন বিমূর্ত কিছু একটা, যার বিপরীতে দাড়িয়ে আছে সুশৃঙ্খল প্রাক্তন বিশ্বশক্তিসমূহ। তেল ও শক্তি বিষয়ে লেখা পরবর্তী একটি নিবন্ধে বলেন থুকার, "আতকা আমরা মুখোমুখি হলাম একটা আন্তর্জাতিক সমাজের; সে সমাজে বিশ্বের উৎপাদনের সুশৃঙ্খল বণ্টন নিশ্চিত করা অসম্ভব। কারণ পুঁজিবাদী ও উন্নত দেশগুলো মূল শক্তির ধারক, কিন্তু মূল শৃঙ্খলার স্রষ্টা ও চালক নয়।[৩৯]

এইসব নতুন দেশও শৃঙ্খলার স্রষ্টা কিংবা পরিচালক নয়, কিন্তু তাতে বিঘ্নসৃষ্টিকারী নিঃসন্দেহ। এবং তৃতীয়ত, শৃঙ্খলা বিঘ্নিত করার কারণ হলো এরা সকলে মিলে একটা দল—কেবল একটা দলরূপেই "আমাদের" সমানতালে ও বিপরীতে অস্তিত্বশীল।

থুকার ও ময়নিহান যা বলেন তা অংশত পশ্চিমের অবরুদ্ধ আত্মিক বৈশিষ্ট্যের প্রতি যাজকদের প্রশংসামন্ত্রের অনুরণন; এইসব বৈশিষ্ট্য সময় সময় আবির্ভূত ও পুনরাবির্ভূত হয়েছে পশ্চিমের আধুনিক ইতিহাসে। আমরা তা দেখেছি আঁরি মাসিসের *লা ডিফেন্স ডি লা অক্সিডেন্টে*, কিংবা সাম্প্রতিককালে এন্থনি হার্টলের নিবন্ধ "দি বারবারিয়ান কানেকশান: অন দি ডেস্ট্রাকটিভ এলিমেন্টস ইন সিভিলাইজড হিস্ট্রি"তে।[৪০] থুকার

www.pathagar.com

ও ময়নিহানের নিকট পশ্চিম-বিরোধীরা "আমাদের" চেনা-জানা কেউ নয়। কিন্তু ইউরোপীয় সাম্রাজ্যবাদীরা বলতে পারে প্রাচ্যজন হলো সেই মানবগোষ্ঠী যাদেরকে আমরা চিনি; কারণ আমরা ওদেরকে শাসন করেছি। ময়নিহানের মতে তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলো অনুকরণ মাত্র, ওরা যা অনুকরণ করে তা দিয়েই ওদের পরিচিতি, ওদের প্রকৃত নিজস্ব বৈশিষ্ট্যে পরিচিত নয়। থুকারের "আন্তর্জাতিক সমাজ" সম্পর্কে তথ্যসূত্রগত যুক্তি আছে বলে মনে হয় না। কেবল এই যুক্তি আছে যে, ওরা পুরোনো শৃঙ্খলা বিপর্যস্ত করে। কারা এই জনগোষ্ঠী, ওদের প্রকৃত বাসনা কি, কোত্থেকে এসেছে এরা, ওরা কেন এমন আচরণ করে যেমন এখন করছে? এগুলো অ-জিজ্ঞাসিত এবং সে কারণে জবাবহীন প্রশ্ন।

একই সময়ে ইন্দোচীন থেকে সরে আসছিলো যুক্তরাষ্ট্র। মার্কিন রাজনীতিতে "ভিয়েতনাম সিনড্রোম" নিয়ে সম্প্রতি অনেক লেখালেখি হয়েছে। তবে অনেক পাঠকই লক্ষ্য করেননি যে সে-সব লেখায় দাবী করা হয় দূরবর্তী মার্কিন স্বার্থের সামরিক নিরাপত্তা প্রয়োজন; কারণ ভিয়েতনামকেন্দ্রিক অস্থিরতা ছড়িয়ে পড়তে আশপাশে—বিশেষ করে মুসলিম বিশ্বে। এর সাথে যুক্ত হয় তৃতীয় বিশ্বের যুক্তিসঙ্গত কারণগুলোর ব্যাপারে প্রগতিশীল উদারনৈতিকদের মোহমুক্তি; বিশেষত তাদের ব্যাপারে যারা তাদের প্রতিশ্রুতি রক্ষা করতে পারেনি বলে মনে হয়। যেমন গেরার্ড চ্যালিয়ান্ডের *রেভ্যালিউশন ইন দি থার্ডওয়ার্ল্ড*-এর কথা ধরা যাক। এ রচনাটিকে বলা যেতে পারে ভিয়েতনাম, কিউবা, এঙ্গোলা, আলজিরিয়া ও ফিলিস্তীনের স্বাধীনতা সংগ্রামের সুপরিচিত এক সমর্থকের মনোবেদনাজাত আর্তনাদ। ১৯৭৭ সালে এটি লেখার সময় তিনি এই বলে শেষ করেন যে, বেশিরভাগ উপনিবেশ-বিরোধী আন্দোলন রূপান্তরিত হয়েছে সাধারণ, দমনমূলক রাষ্ট্রে, যা পশ্চিমের মনোযোগ আকর্ষণ করার মতো নয়।[৪১] অথবা ১৯৭৮ সালের বসন্তে *ডিসেন্ট* ম্যাগাজিন কর্তৃক আয়োজিত "কম্বোডিয়ার সাম্প্রতিক ঘটনাবলী (খেমাররুজের জয় এবং এরই ফলে সংঘটিত ভয়ংকর ঘটনাবলী) কি আমাদের ভিয়েতনাম যুদ্ধ-বিরোধী তৎপরতার পুনর্বিবেচনা দাবী করে?" শীর্ষক সিমপোজিয়ামের কথা ধরা যায়। ১৯৬০-এর দশকের বিপুল উৎসাহ উদ্দীপনা থেকে সরে আসার এবং এর বদলে নয়া আন্তর্জাতিক বাস্তবতা নিয়ে এক সমস্যাজনক অস্বস্তির ইঙ্গিত রয়েছে এ প্রশ্নে, উত্তর যদি বা না-ই থাকে। এর সবকিছুই আসন্ন বিপর্যয়ের আভাস দেয়। এ যুক্তির পক্ষে যথাযথ প্রমাণস্বরূপ খাড়া করা হয় আন্তর্জাতিক অর্থনীতির সামগ্রিক ব্যর্থতাকে।

তেল ও সংবাদের ভোক্তারা অনুভব করে কি এক বিপর্যয় ও ক্ষতির সমূহ আশঙ্কা, যার না আছে কোনো চেহারা না সুনির্দিষ্ট পরিচয়। আমরা কেবল এইটুকু জানতে পারি যে, যা আমাদের নিজেদের জিনিষ বলে ধরে নিয়েছিলাম তা এখন আমাদের কাছ থেকে ছিনিয়ে নেয়া হচ্ছে। আমরা আর আগের মত রাস্তায় গাড়ি চালাতে পারবো না; তেল এখন অনেক দামী জিনিষ; আমাদের আরাম-অভ্যাস বুঝি বিরাট কোনো পরিবর্তনের ভেতর দিয়ে যাচ্ছে। এমন কি জিজ্ঞাসার কেন্দ্রবিন্দুতে যে জিনিষ সেই তেলও বুঝি

www.pathagar.com

তেল-হারানোর হুমকির তুলনায় অস্পষ্টই থেকে যায়। কেউ-ই মনে হয় জানতো না আসলেই তেলের সরবরাহ কমেছে নাকি কেবল অনিশ্চিত ভয়ে গ্যাসের জন্য লম্বা লাইন ধরছে লোকেরা, অথবা তেল কোম্পানীগুলোই তাদের লাভের পরিমাণ বাড়িয়ে দিলো কিনা এবং সঙ্কটের ব্যাপারে এসবের প্রভাব আছে কি না।[৪২] বরং প্রাসঙ্গিক মনে হয় অন্যান্য বিষয়। পশ্চিমের সবখানে জোর করে দাঁড় করিয়ে দেয়া হয় আলখাল্লা-পরিহিত পয়সাঅলা সশস্ত্র আরবের ভাবমূর্তি। ফলে ইসলামের উপস্থিতির নয়া ঘোষণার বিষয়টিকে ১৯৭৩ সালের রমযানের যুদ্ধের সাথে সম্পর্কিত করা সহজ হয়। এ যুদ্ধে মিশরীয় বাহিনী দুর্দম বার-লেভ লাইন পর্যন্ত পার হয়ে আসে। কিন্তু ১৯৬৭ সালের মত আরবরা পিছিয়ে যায় না, দুর্দান্তভাবে লড়ে ওরা। এরপর ১৯৭৪ সালে জাতিসংঘে প্যালেস্টাইন লিবারেশন অর্গ্যানাইজেশনের (পিএলও) আবির্ভাব। ইয়েমেনী পরিণত হন কর্তৃত্ববাদী ব্যক্তিত্বে, কোনো কারণ ছাড়াই— কেবল এইটুকু বাদে যে তিনি মুসলমান এবং তেলসমৃদ্ধ সৌদী আরবের মানুষ। ইরানের শাহ্ হয়ে ওঠেন বিশ্বনেতাদের একজন। ১৯৭০-এর দশকের মাঝমাঝি থেকে যুক্তরাষ্ট্র আকস্মিকভাবে উপলব্ধি করে ইন্দোনেশিয়া, ফিলিপাইন, নাইজেরিয়া, তুরস্ক, পাকিস্তান ও উপসাগরীয় অঞ্চলের বিভিন্ন দেশ, আলজিরিয়া, মরক্কো তার জন্য সমস্যা সৃষ্টিতে সক্ষম। এই আকস্মিক উপলব্ধি যুক্তরাষ্ট্রকে মনে করিয়ে দেয় এদের অতীত ও পরিচয় সম্পর্কে আমাদের জ্ঞান কত সামান্য। এভাবে বহুসংখ্যক মুসলিম দেশ, সেই সব দেশের ব্যক্তিত্ব ও উপস্থিতি কেবল আবছা জানা অস্তিত্বের অবস্থান থেকে "সংবাদ" হয়ে ছড়িয়ে পড়ে গণমানসে।

এখানে একটা থেকে আরেকটায় প্রকৃত স্থানান্তর ঘটেনি। জনগণের বড় এক অংশ এই নয়া অবস্থাটা ব্যাখ্যা করার জন্য প্রস্তুত ছিলো না। তবে থুকার ও ময়নিহানের মত ব্যতিক্রম আছে; এরা এমন এক পরিকাঠামোর মধ্যে আবিশ্ব-ঐতিহাসিক সমাপ্তি টানছিলেন যাতে ইসলামের উপস্থিতি আছে, কিন্তু বিশেষ কোনো ছাড় নাই। আজকের জামানায় যে-ই ইসলামের মুখোমুখি হয় সে-ই দেখে এর সমকালীন বেপরোয়া ভাবমূর্তি। এ ছাড়া, নানারকম অনুচ্চারিত অনুমানও ছিলো। যেমন, "ইসলাম" একটা সাধারণ বিষয় এবং সাধারণভাবেই এর উল্লেখ করা যায়, যেভাবে "গণতন্ত্র" বা কোনো ব্যক্তি কিংবা ক্যাথলিক চার্চের কথা উল্লেখ করে মানুষ। ইসলামের সম্পর্কে এই নৈকট্য ও সরাসরি উপস্থিতির বোধ কাজ করতে শুরু করে, যেমন দেখা যায় *টাইমসের* প্রচ্ছদ কাহিনীতে। তারচেয়ে উদ্বেগজনক ব্যাপার হলো এই বোধ জায়গা করে নিতে থাকে মার্গীয় সাংস্কৃতিক বিতর্কে; গুরুত্বপূর্ণ উদারপন্থী জার্নালগুলোয় এমনভাবে আলোচিত হতে থাকে যেন বিষয়টি নিয়ে গভীর ও সিরিয়াস গবেষণা হয়ে গেছে। বুদ্ধিবৃত্তিক-ভূ-রাজনৈতিক চিন্তাভাবনায় যে পরিবর্তনের কথা বর্ণনা করেছি তার কারণেই ঐসব ব্যক্তিত্ব আর প্রচার মাধ্যমের মধ্যে পার্থক্য আছে।

একটা উল্লেখযোগ্য উদাহরণ হলো ১৯৭৯ সালের ডিসেম্বরের ৮ তারিখের *নিউ রিপাবলিকে* মিশেল ওয়ালজারের লেখা "ইসলাম বিস্ফোরণ"। ওখানে তিনি ফিলিপাইন,

www.pathagar.com

ইরান, ফিলিস্তিন ও অন্যান্য অঞ্চলে চলমান বিশ শতকের গুরুত্বপূর্ণ (তার কথায়) 'উন্মত্ত' ঘটনাবলী নিয়ে আলোচনা করেন; যদিও নিজেই স্বীকার করেন যে এধরনের লেখায় ব্যাপারে তিনি পেশাগতভাবে দক্ষ নন। ওয়ালজার মনে করেন বিভিন্ন অঞ্চলের এইসব ঘটনাবলীর তাফসীর করা যায় একই জিনিষের ভিন্ন ভিন্ন প্রকাশ হিসেবে, সে জিনিষটাই হলো ইসলাম। এইসব ঘটনার মধ্যে যেখানে যেখানে মিল দেখা যায় তার একটা হলো: প্রত্যেক দৃষ্টান্তই পরিষ্কার দেখায় যে, অদম্য একটা রাজনৈতিক শক্তি ধীরে ধীরে পশ্চিমের ওপর চড়াও হচ্ছে। দ্বিতীয়ত, এগুলো প্রধানত ভয়াবহ এক নৈতিক উত্তাপ থেকে উৎসারিত (যেমন ইসরাইলী উপনিবেশবাদ প্রতিরোধে ফিলিস্তিনীদের সংগ্রাম সম্পর্কে ওয়ালজার জোর দিয়ে বলেন এটি ধর্মীয় ব্যাপার, রাজনৈতিক বা মানবিক কাজ নয়)। তিন নম্বরে, এগুলো "গণতন্ত্র, অসাম্প্রদায়িকতা, সমাজতন্ত্র ও উদারতাবাদের" পাতলা, উপনিবেশী ছদ্ম আবরণ ভেঙ্গে গুঁড়া গুঁড়া করে ফেলেছে। এই তিনটা সাধারণ বৈশিষ্ট্যের মধ্যে যা উপলব্ধি করা যায় তা-ই হলো "ইসলাম"; এই ইসলাম এমন এক শক্তি যা এই তিন বৈশিষ্ট্যে বিদ্যমান সময় ও স্থানগত দূরত্ব মাড়িয়ে যায়; ইসলাম ছাড়া অন্যক্ষেত্রে হয়তো এগুলো আলাদা আলাদা হয়ে থাকতো। আরেকটা জিনিষ লক্ষ্য করার মতো, আবার সেই ওয়ালজারের মতে, ইসলামের ব্যাপারে কথা বলার সময় কথক স্বয়ংক্রিয়ভাবে মুছে ফেলছেন সমাজতন্ত্র, অসাম্প্রদায়িকতা বা গণতন্ত্র বিষয়ক জটিলতা; নৈতিক সংযমও থাকছে না।

নিবন্ধের শেষে ওয়ালজার নিজে অন্তত সন্তুষ্ট যে, যখন তিনি "ইসলাম" শব্দটি উচ্চারণ করেন তখন কথা বলেন ইসলাম নামের একটি বাস্তব বিষয় সম্পর্কে; তা এমন এক সমকালীন ও সংলগ্ন বিষয় যে এতে বাড়তি দোষগুণ লাগালে অতিরঞ্জন হবে। ইসলামের অঙ্গস্বরূপ এই সমকালীনতা বা লগ্নতার মধ্য দিয়েই ইসলামকে এমন এক বিষয়রূপে দেখার প্রবণতা গড়ে ওঠে যার নিজস্ব কোনো ইতিহাস নেই। যদি তার কোনো ইতিহাস মানতেই হয় তবে সেই ইতিহাসকে মনে হবে অপ্রাসঙ্গিক অথবা শতকের পর শতক ধরে সন্ত্রাস, উন্মত্ততা, স্বৈরতন্ত্রের পুনরাবৃত্তি মাত্র। এভাবেই ময়নিহান ও থুকারের মত রক্ষণশীলদের যুক্তি বামপন্থী উদারনৈতিকদের দ্বারা সমর্থিত হয়, সমৃদ্ধ হয় আরো খুঁটিনাটি সমর্থক তথ্যে। নয়া ভূ-রাজনৈতিক-বুদ্ধিবৃত্তিক বিন্যাসে গণমানসে ইসলামের ভাবমূর্তির আরেকটি দিক এই যে, প্রায় কোনো ব্যতিক্রম ছাড়াই ইসলামকে দেখা যায় প্রতিদিনের স্বাভাবিক পশ্চিমা "আমাদের" সাথে সংঘাতপূর্ণ অবস্থানে স্থাপিত। ওয়ালজার বা ওয়ালজার যাদের ওপর নির্ভর করেন সেই সব পণ্ডিতদের লেখা পড়লে এমনই মনে হবে। ১৯৭৯ সালে ডিসেম্বরের ২৮, ২৯, ৩০ ও ৩১ তারিখে *নিউইয়র্ক টাইমসে* "ইসলাম" ধারণাটি সম্পর্কে চারটি ধারাবাহিক নিবন্ধ লেখেন ফ্লোরা লুইস (এ সম্পর্কে আমি আলোচনা করবো দ্বিতীয় অধ্যায়ে)। "ইসলাম" শব্দটির মূলগত ধারণাই "আমাদের" জগতের প্রতি একরকম শত্রুতা নির্দেশক। ধারাবাহিক লেখাটার কারণ হলো ইসলাম (যে-সব ইরানী আমেরিকানদেরকে জিম্মি করে রেখেছে তারা) "আমাদের" বিরুদ্ধে। এ অনুভূতি আরো তীব্র হয় যখন লুইস

www.pathagar.com

একটি তালিকা তৈরি করে দেখান যে, ইসলাম স্বাভাবিকতা থেকে বিপথে সরে গেছে। স্বাভাবিকতা থেকে সরে যাওয়ার অর্থ হলো আরবী ভাষার অদ্ভুত প্রকৃতি, এর বিশ্বাসের অদ্ভুত ধরন, অনুগামীদের ওপর এর উদারনৈতিক সর্বনিয়ন্ত্রণবাদী আধিপত্য, ইত্যাদি। ইসলামের সমকালীনতার কারণে যদি একে সরাসরি উপলব্ধিযোগ্য বলে মনে হয়ে থাকে, তাহলে আমাদের পরিচিত বাস্তবতা থেকে এর বৈপরীত্য একে দাঁড় করিয়ে দিয়েছে আমাদের বিরুদ্ধে—সরাসরি, হুমকির মতো, কঠোর চেহারায়। এর মোট ফলাফল হলো "ইসলাম" পরিণত হয়েছে স্পর্শযোগ্য ও সনাক্তযোগ্য বাস্তবতায়; কোনো রকম সংযম ছাড়াই এ বাস্তব বিষয়ে যৌক্তিক কৌশল ও ভাষ্য প্রদান সম্ভব হয়, যার অধিকাংশই নৃ-রূপ কল্পনামূলক।

এ প্রবণতার চরম প্রকাশ ১৯৯৩ সালের গ্রীষ্মে *ফরেইন এ্যাফেয়ার্সে* স্যামুয়েল পি. হান্টিংটনের নিবন্ধ "দি ক্ল্যাশ অব সিভিলাইজেশন?"। এ নিবন্ধে স্নায়ুযুদ্ধোত্তর সংঘাত সম্পর্কে মতামত তুলে ধরেছেন প্রাক্তন স্নায়ুযোদ্ধা হান্টিংটন। তিনি আকর্ষণীয় কায়দায় বলেন, এটি সভ্যতার সংঘাতের চেয়ে কম কিছু নয়; এগুলোর নয়-দশটা আছে, যার মধ্যে পশ্চিমের জন্য সবচেয়ে বিপদজনক হলো ইসলাম (বরং বলা ভালো ইসলাম ও কনফুসিয়ানিজমের জোট; তিনি অবশ্য এমন জোটবদ্ধতার কোনো প্রমাণ দেন না)। মজার ব্যাপার হচ্ছে ইতিহাস ও সংস্কৃতির ওপর হান্টিংটনের অপেশাদারসুলভ হামলার শিরোনাম নেয়া হয়েছে বার্নার্ড লুইসের প্রবন্ধ "দি রুটস অব মুসলিম রেজ" থেকে। এ প্রবন্ধে লুইস তার অগভীর কিন্তু বেপরোয়া এ তত্ত্ব উপস্থিত করেন যে, ইসলাম আধুনিকতার ওপর ক্ষিপ্ত। ইসলাম বলতে ঠিক কি বোঝায় তা বলেননি লুইস। এই উদ্দেশ্যেমূলক অর্থহীন বক্তব্য থেকে হান্টিংটনের মত আরো বহু পাঠক এমন সর্তকতামূলক সিদ্ধান্তে পৌছেন যে, "আফ্রিকার উদ্গত অঞ্চল থেকে মধ্যএশিয়া পর্যন্ত বাঁকা চাঁদের আকারে ছড়ানো ইসলামের রয়েছে রক্তাক্ত সীমান্ত" (পৃ-৩৪)। এই তত্ত্ব ইসলাম সম্পর্কে ভয় বাড়ায়, জ্ঞান বাড়ায় না। হাজার বছরের দেয়া-নেয়ার শান্তিপূর্ণ ইতিহাস এবং ভবিষ্যত সংলাপের সম্ভাবনা থাকা সত্ত্বেও হান্টিংটন বলতে চান কতিপয় সভ্যতার সাথে পশ্চিমের সহাবস্থান একেবারেই অসম্ভব; ইসলাম যে-কোনো পশ্চিমা মানুষের এক নম্বর শত্রু; যেন প্রতিটি মুসলমান ও প্রতিটি পশ্চিমা মানুষ সভ্যতা-নির্ভর আত্ম-পরিচয়ের ছোটো ছোটো বায়ু-নিরোধী বাক্স বিশেষ, যেগুলো কেবল আত্মপুনরাবৃত্তিতে নিমগ্ন। এভাবে আপনি ইসলামকে যেকোনো মুসলমানের সমতুল্য মনে করতে পারেন। দৃষ্টান্তের জন্য সদাপ্রস্তুত প্রার্থী আছেন আয়াতুল্লাহ্ খোমেনি; তেমনি যখন মৌলবাদের তাৎক্ষণিক নমুনার প্রয়োজন হয় তখন করাচী, কায়রো বা ত্রিপলির উন্মত্ত মুসলিম জনতাও গুরুত্বপূর্ণ।

অতপর, আপনি যা কিছু অপছন্দ করেন তার সবকিছুকেই ইসলামের সাথে তুলনা করতে পারেন; যা বলছেন তা বাস্তব ঘটনা-নির্ভর কিনা তাও ভাববার দরকার নাই। এর একটা দৃষ্টান্ত ম্যানর বুকস থেকে প্রকাশিত পেপার ব্যাক *আয়াতুল্লহ্ খোমেনি'জ মেইন কাম্প*—খোমেনির লেখা *ইসলামী সরকার* বইয়ের অনুবাদ। জনৈক জর্জ

www.pathagar.com

কারপুজি জুনিয়রের একটি বিশ্লেষণ জুড়ে দেয়া হয়েছে অনুবাদে (কারপুজি *নিউইয়র্ক পোস্টের* সিনিয়র রিপোর্টার)। নিজস্ব যুক্তির ওপর দাঁড়িয়ে কারপুজি দাবী করেন খোমেনি একজন আরব এবং ইসলামের সূচনা খ্রি. পূ. পঞ্চম শতকে। কারপুজির বিশ্লেষণ শুরু হয়ে এমন সুমধুর ভাষায় :

> সেই আর যুগের এডলফ হিটলারের মত, আয়াতুল্লাহ রুহুল্লাহ্ খোমেনি একজন অত্যাচারী শাসক, ঘৃণাকারী, উত্যক্তকারী বিশ্ব শৃঙ্খলা ও শান্তির জন্য হুমকি। *মেইন কাম্পের* লেখক এবং ইসলামী *গভর্নমেন্টের* লেখকের মধ্যে পার্থক্য এই যে একজন ছিলেন নাস্তিক, অন্যজন নিজেকে আল্লাহ্র মানুষ বলে ভাণ করেন।[৪৩]

ইসলামের এই রকম প্রতিনিধিত্ব পৃথিবীতে আমেরিকাপন্থী ও আমেরিকা-বিরোধী (অথবা কমিউনিস্ট ও কমিউনিস্ট-বিরোধী) দুটো দলে ভাগ করার প্রবণতার নিয়মিত প্রমাণ দেয়; রাজনৈতিক প্রক্রিয়া, অপ্রাসঙ্গিক ও জাতিকেন্দ্রিক মূল্যবোধ ও বিন্যাস আরোপ, পুরোপুরি তথ্যবিভ্রান্তি, পুনরাবৃত্তি, খুঁটিনাটি বিবরণ এড়ানো এবং প্রকৃত পরিপ্রেক্ষিতের অনুপস্থিতির সাক্ষ্য দেয়। এইসব প্রবণতার মূল সনাক্ত করা যায় পশ্চিম ও ওখানকার প্রচার মাধ্যমের সামাজিক বৈশিষ্ট্যে, ইসলামে নয়; এরই প্রতিফলক ও আজ্ঞাবহ হলো "ইসলাম" ধারণাটি। এর ফলে আমরা পৃথিবীকে আবার প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য নামের দুই ভাগে ভাগ করছি; পুরোনো প্রাচ্যতাত্ত্বিক তত্ত্বের কোনো পরিবর্তন হয়নি; কেবল পৃথিবীর মধ্যেই নয়, আমাদের মধ্যে এবং তথাকথিত তৃতীয় বিশ্বের সাথে আমাদের প্রকৃত সম্পর্কের মধ্যে অন্ধ হয়ে থাকাও ভালো।

এর কিছু গুরুত্বপূর্ণ পরিণামও দেখা দিয়েছে। একটা হলো ইসলামের নির্দিষ্ট একটি ভাবমূর্তি সরবরাহ। আরেকটা হলো অব্যাহতভাবে এর অর্থ বা বক্তব্যের সীমা চিহ্নিত করা ও এর ছাঁচ তৈরি করা। তৃতীয় আরেকটা হচ্ছে "ইসলামের" বিপরীতে আমাদের দাঁড় করিয়ে দিয়ে সংঘাতমুখি রাজনৈতিক পরিস্থিতি সৃষ্টির প্রয়াস। চার নম্বরে, খোদ ইসলামী বিশ্বে ইসলামের এই সঙ্কোচনমুখি ভাবমূর্তির উল্লেখযোগ্য ফলাফল। পঞ্চমটি হলো প্রচার মাধ্যমের ইসলাম এবং এর ব্যাপারে আমাদের সাংস্কৃতিক মনোভাব—এ উভয়ই আমাদেরকে যেমন "ইসলাম" বহু কিছু বলে, তেমনি অনেক কিছু জানায় সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান, তথ্য ও জ্ঞানের রাজনীতি ও জাতীয় নীতি সম্পর্কেও।

এখন ইসলামের সামগ্রিক যে-ভাবমূর্তি প্রচলিত তার সম্পর্কে এই বিষয়ের তালিকা দেয়ার অর্থ এই নয় যে, ওখানে "ইসলাম" বলে বাস্তব কোনো একটি বিষয় রয়ে গেছে, যাকে উদ্দেশ্যমূলকভাবে বিকৃত করছে প্রচার মাধ্যম। আমার বক্তব্য মোটেও তা নয়। মুসলিম- অমুসলিম সবার জন্য ইসলাম একটি বিষয়মুখি আবার আত্মগত বাস্তব ব্যাপার। কারণ মানুষই তাদের বিশ্বাস, সমাজ ঐতিহ্য ও ইতিহাসে তৈরি করেছে এই বাস্তবতা। তেমনি বহিরাগত অ-মুসলিমরা একে স্থির করেছে, এর চেহারা দিয়েছে এবং নির্দিষ্ট করেছে এর পরিচয়; একেই আবার অনুভব করে একক ও যৌথভাবে তাদের বিরুদ্ধচারীরূপে। এর অর্থ হলো প্রচার মাধ্যমের ইসলাম, পশ্চিমা

www.pathagar.com

পণ্ডিতদের ইসলাম, পশ্চিমা রিপোর্টারদের ইসলাম, মুসলমানদের ইসলাম—সবই ইতিহাসে সংঘটিত বাসনা ও তাফসীরের কাজ; কাজেই একে বিচার করতে হবে তাফসীরের সৃষ্ট ইতিহাসের মধ্যে।

আমি ধর্মে বিশ্বাসী না, মুসলিম পটভূমিও নেই আমার। তবু কেউ যখন বলে আমি অমুক বিশ্বাসের অনুগামী তখন আমি তাকে বুঝতে পারি। কিন্তু আমি যে মনে করছি এই বিশ্বাস আলোচনা করা সম্ভব, তখন তার অর্থ হলো তা করা সম্ভব বিশ্বাসটির তাফসীর তৈরির মধ্য দিয়ে, যার প্রকাশ ঘটেছে মানব সমাজ ও ইতিহাসে সংঘটিত মানবীয় কর্মের মধ্যে। একটা দৃষ্টান্ত উল্লেখ করি: পাহলভী শাসনের পতন ঘটায় যে ইসলামী বিপ্লব সেই বিপ্লব সম্পর্কে, কিংবা ১৯৯০ সলের মিউনিসিপ্যাল নির্বাচনে সরকারকে হটিয়ে দেয়া ইসলামিক স্যালভেশন ফ্রন্ট (এফআইএস) সম্পর্কিত আলোচনায় আমাদের এই নিয়ে কথাবার্তা বলা উচিত নয় যে, বিপ্লবীরা বিশ্বাসের দিক থেকে মুসলিম কি না। আমরা বরং ইসলাম সম্পর্কে তাদের ধারণা নিয়ে আলোচনা চালাতে পারি, যে-ধারণা তাদেরকে সচেতনভাবে—কিংবা কথার কথা, ইসলামী উপায়ে— দাঁড় করিয়ে দিয়েছে (তাদের মতে) ইসলাম বিরোধী, দমনমুখি, অত্যাচারী শাসকের বিরুদ্ধে। অতপর ইসলাম বিষয়ে ওদের তাফসীরের সাথে তুলনা করতে পারি ইসলাম, ইরানী বিপ্লব ও আলজেরীয় ইসলামপন্থীদের সম্পর্কে *টাইমস* বা লো মঁদের বক্তব্যের।

অর্থাৎ আমরা এখানে একটা তাফসীরকারী সম্প্রদায়ের মোকাবিলা করছি। ওদের অনেকের অবস্থান পরস্পরের তুলনায় 'গাছে আর মাছে'; পরস্পরের বিরুদ্ধে আক্ষরিক অর্থেই যুদ্ধে নেমেছেন এমন দৃষ্টান্তও আছে। এদের প্রত্যেকেই আপন আপন বৈশিষ্ট্য হিসেবে নিজেদের ও তাদের তাফসীর সৃষ্টি করেন ও উন্মোচিত করেন। কেউ বাস্তবের প্রত্যক্ষ সংস্পর্শে বাস করে না। আমরা যে-জগতে বাস করি তা মানুষের সৃষ্টি। ওখানে 'জাতি', "খ্রিস্চিয়ানিটি" বা "ইসলাম" হলো ঐক্যমতের ভিত্তিতে গৃহীত প্রথা, ঐতিহাসিক প্রক্রিয়া, এবং সর্বোপরি এইসব ব্যাপারগুলোকে আমাদের সনাক্তযোগ্য পরিচয় দেয়ার জন্য নিবেদিত, ইচ্ছা-চালিত মানবীয় শ্রমের ফসল। এ কথার অর্থ এই নয় যে, এইসব সত্য ও বাস্তবতা প্রকৃতপক্ষে কোথাও নাই। এগুলোও আছে, আমরা বুঝতেও পারি যখন আমরা দেখি গাছপালা, প্রতিবেশীদের ঘরবাড়ি, কিংবা (দুর্ঘটনায়) হাড় ভেঙ্গে ফেলায় বা প্রিয় মানুষটির মৃত্যুতে বেদনাবোধ করি। কিন্তু আমরা খেয়াল করি না যে, বাস্তবতা সম্পর্কে আমাদের বোধের জন্য আমরা যেমন ব্যক্তিগত তাফসীরের ওপর নির্ভর করি, তেমনি নির্ভর করি (অন্যদের কাছ থেকে) গৃহীত তাফসীরের ওপরও। কারণ সমাজে বসবাসের একটা অঙ্গ হলো ঐ সব তাফসীর গ্রহণ করা। এই জিনিষটা পরিষ্কার ব্যাখ্যা করেছেন সি. রাইট মিলস:

> মানবীয় অবস্থা বোঝার প্রথম শর্ত-নীতি হলো মানুষ বাস করে একটি হস্তান্তরিত পৃথিবীতে। সে নিজে যতটা অভিজ্ঞতা অর্জন করে, তার চেয়ে অনেক বেশি কিছু সম্পর্কে সচেতন সে; তার নিজের অভিজ্ঞতা সবসময় পরোক্ষ। তার জীবনের মান নির্ধারিত হয় অন্যের নিকট থেকে গৃহীত

www.pathagar.com

অর্থের দ্বারা। প্রত্যেকে বাস করে এমন সব অর্থেরই একটা জগতে। নিরেট ঘটনাবলীর একটা পৃথিবীর মুখোমুখি দাঁড়িয়ে নেই কেউ; এমন কোনো পৃথিবী আসলে নেইও। কেবল উন্মাদনার সময় অথবা শৈশব অবস্থাতেই মানুষ সে পৃথিবীর সবচেয়ে কাছাকাছি যেতে পারে।

সে অবস্থায় অর্থহীন ঘটনাবলী ও বোধশূন্য সন্দেহের ভীতিকর দৃশ্যরাজির মধ্যে সে আক্রান্ত সম্পূর্ণ নিরাপত্তাহীনতার যন্ত্রণায়। কিন্তু প্রাত্যহিক জীবনযাপনের মানুষ নিরেট ঘটনার অভিজ্ঞতা লাভ করে না। তার অভিজ্ঞতা ছাঁচের অর্থের দ্বারা নির্বাচিত এবং আগে থেকে তৈরি তাফসীর দ্বারা আকারপ্রাপ্ত। তার মনে পৃথিবীর ও নিজের যে-ভাবমূর্তি আছে তার যোগান দিয়েছে এমন সব বিশাল এক জনতা, যাদের সাথে তার কখনো দেখা হয়নি, ভবিষ্যতেও দেখা হবে না। এ সত্ত্বেও অচেনা ও মৃত মানুষদের যোগান দেয়া এই ভাবমূর্তিই মানুষরূপী তার জীবনের আসল ভিটা।

মানুষের সচেতনতা তার বস্তুগত অস্তিত্ব নির্ধারণ করে না; তার সচেতনতাও তার বস্তুগত অস্তিত্বের দ্বারা নির্ধারিত হয় না। সচেতনতা ও অস্তিত্বের মাঝখানে আছে অর্থ ও নকশা, যা অন্য মানুষের দ্বারা সরবরাহকৃত— প্রথমে মুখের ভাষায়, পরে প্রতীক ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে। গৃহীত ও পরিচিত এইসব তাফসীর নিয়ামক প্রভাব ফেলে মানুষের অস্তিত্ব-সম্পর্কিত সচেতনতার ওপর। মানুষ যা দেখে, এর প্রতি যেভাবে প্রতিক্রিয়া করে, এর সম্পর্কে যা অনুভব করে এবং সেই অনুভবের প্রতি যে-প্রতিক্রিয়া করে তার মূল সূত্রটা ধরিয়ে দেয় ঐসব তাফসীর। প্রতীক ফুটিয়ে তোলে অভিজ্ঞতাকে, বহিরঙ্গের একমুহূর্তের অনুভবকে সঠিক দিক-নির্দেশনা দিয়ে অর্থ জ্ঞানকে সুসংগঠিত করে, যা হয়তো গোটা এক জীবনের আকাঙ্ক্ষার তুল্য।

সন্দেহ নেই যে, প্রতিটি মানুষই প্রকৃতিকে পর্যবেক্ষণ করে, সামাজিক ঘটনাবলী ও তার নিজকেও দেখে। কিন্তু সমাজ, প্রকৃতি ও নিজের সম্পর্কে সে যা কিছু বাস্তব বলে গ্রহণ করেছে তার বেশিরভাগই নিজে দেখেনি। মানুষ তার দেখা বিষয়ের তাফসীর তৈরি করে, আবার যা দেখেনি তারও তাফসীর করে। কিন্তু তাফসীরের শর্তগুলো তার নিজের নয়, সে নিজে ওগুলো বানায় নাই, পরীক্ষা করে দেখে নাই। প্রত্যেক মানুষই পর্যবেক্ষণ ও তাফসীরের ব্যাপারে কথা বলে অন্যদের সাথে। কিন্তু অন্যদের জানানোর ধরনটা তার নিজস্ব হওয়ার সম্ভাবনা খুবই ক্ষীণ; এগুলো বরং অন্য মানুষের কথা ও ভাবমূর্তি, যা সে নিজের বলে গ্রহণ করেছে। যাকে সে নিরেট বাস্তব ব্যাপার, সুষম তাফসীর, সুন্দর উপস্থাপন বলে অভিহিত করে, তার জন্য তাকে ক্রমেই বেশি করে নির্ভর করতে হচ্ছে পর্যবেক্ষণ স্থান, তাফসীর-কেন্দ্র, উপস্থাপন-স্থল ইত্যাদির ওপর; যা দিয়ে এগুলো গড়ে উঠেছে তাকে আমি বলতে যাচ্ছি 'সাংস্কৃতিক হাতিয়ার'।[৪৪]

www.pathagar.com

এই সাংস্কৃতিক হাতিয়ার গুচ্ছের যে শাখাটি অধিকাংশ আমেরিকানের (একইভাবে ইউরোপীয়র) নিকট ইসলামকে পরিবেশন করছে তা প্রধানত টেলিভিশন ও রেডিও নেটওয়ার্ক, দৈনিক পত্রিকা ও জনপ্রিয় ম্যাগাজিনের সমাহার। সিনেমারও একটা ভূমিকা আছে। কারণ ইতিহাস ও দূরবর্তী অঞ্চলসমূহের প্রত্যক্ষ-দৃশ্যনির্ভর বোধ আমাদেরকে নিজেদের বিষয়গুলোর ব্যাপারে আরো সচেতন করে, সচরাচর তা সিনেমার আকারেই আসে। গণমাধ্যমের এই শক্তিশালী মনোযোগ একত্রে সাম্প্রদায়িক তাফসীরের একটি গুচ্ছ গঠন করে; এটি সরবরাহ করে ইসলামের নির্দিষ্ট একটি ছবি, এবং,জোরদার স্বার্থের প্রতিফলন ঘটায় সংশ্লিষ্ট সমাজে। এ ছবি কেবল ছবি নয়, ছবিটির ব্যাপারে একগুচ্ছ অনুভবও, যা অন্যকে জানানো যায়। এ ছবির সাথে যায় তার পরিপ্রেক্ষিতও। পরিপ্রেক্ষিত বলে বোঝাচ্ছি এর বিন্যাস, বাস্তবে এর অবস্থান, এতে মিশে থাকা মূল্যবোধ, এটি যে মনোভঙ্গি তৈরি করে এর ধারক-বাহকদের মধ্যে, তার সবকিছুই। এভাবে, যদি শ্লোগানরত উন্মত্ত "ইসলামী" জনতার দল আর "আমেরিকা-বিরোধিতার" ভাষ্যসহ টেলিভিশন চিত্রের মাধ্যমে নিয়মিতভাবে ইরানী সঙ্কট উপস্থাপন করা হয়, তাহলে ঐ দৃশ্যের দূরবর্তিতা এবং অপরিচিতি ও হুমকিদায়ক প্রকৃতি ইসলামকে কেবল এইসব বৈশিষ্ট্যের মধ্যে সীমিত করে ফেলে। এটি আমাদের মধ্যে এমন অনুভূতির জন্ম দেয় যেন, মুখ্যত আকর্ষণহীন, নেতিবাচক কোনোকিছুর মুখোমুখি হয়েছি আমরা। যেহেতু "ঐখানে" ইসলাম আমাদের "বিরুদ্ধে", তাই এর প্রতি সংঘাতমুখি প্রতিক্রিয়া গ্রহণের ব্যাপারে কোনো সন্দেহ থাকে না।

তার উপর আমরা যদি দেখি ও শুনি একজন ওয়াল্টার কনক্রাইট তার রাতের অনুষ্ঠান শুরু করছেন "এটি এইরকমই" বলে, তাহলে আমরাও এই বলে সমাপ্তি টানবো যে, যে-দৃশ্য দেখছি তা টেলিভিশন কোম্পানীর বদৌলতে এখানে আসেনি, বরং মূল ব্যাপারটাই ঐরকম: প্রাকৃতিক, অপরিবর্তনীয়, "ভিনদেশি", "আমাদের" বিরুদ্ধে দাঁড়ানো। কাজেই আচানক কিছু নয় যে, ১৯৭৯ সালের ২৬শে নভেম্বর *লো নভেল অবজারভেটরের* জ্যাঁ ডানিয়েল বলতে পারেন "les Etats-Unis (sont) assieges par l'Islam". ১৯৯৬ সালেও তা কম জোরদার সত্য নয়।

ইসলামকে জানার জন্য মানুষ টেলিভিশন, রেডিও, ম্যাগাজিনের ওপর নির্ভর করলেও এগুলোই একমাত্র উৎস নয়। আছে বইপত্র, বিশেষ বিষয়ের জার্নাল, এবং নানা ধরনের বক্তৃতা। এগুলোর বক্তব্য গণমাধ্যমের সরবরাহকৃত টুকরো টুকরো ও তাৎক্ষণিক জিনিষগুলোর তুলনায় আরো জটিল।[৪৫]

আরেকটা বিষয়ের উল্লেখ জরুরী: পত্রপত্রিকা, টেলিভিশন ও রেডিওতে পারস্পরিক ভিন্নতা বোঝা যায়—এক ধাঁচের সম্পাদকীয়র সাথে ভিন্ন ধরনের সম্পাদকীয়র পার্থক্য কিংবা বিভিন্ন দৃষ্টিকোণের পারস্পরিক ফারাক অথবা প্রচলিত ভাবমূর্তির সাথে পাল্টা-সংস্কৃতির নির্মিত ভাবমূর্তির মধ্যে। অর্থাৎ আমরা কোনো কেন্দ্রীভূত অপ-প্রচারণা ব্যবস্থার করুণার ওপর নির্ভরশীল নই। প্রচার মাধ্যম এবং খ্যাতনামা পণ্ডিতও

www.pathagar.com

অপপ্রচারণা ফেনিয়ে তুলেন। তবু, বৈচিত্র্য ও পার্থক্য যতই থাকুক, আমরা ঠিক বিপরীতটাকে যতই সত্য বলে দাবী করি, প্রচার মাধ্যম যা প্রচার করে তা "স্বতঃস্ফূর্ত" নয়, "মুক্ত"ও নয় । সংবাদ ঠিক ঘটতে থাকে না, বাস্তবতা থেকে লাফিয়ে উঠে আমার চোখ ও মুখের সামনে চলে আসে না ছবি ও ধারণাগুলো। সত্য সরাসরি অর্জনযোগ্য নয়। অর্থাৎ আমাদের সামনে এমন কোনো বৈচিত্র্য নেই যা সম্পূর্ণ মুক্ত অবস্থায় বিকশিত হয়েছে। যোগাযোগের অন্যান্য মাধ্যমের মতই টেলিভিশন ও পত্র-পত্রিকা বিভিন্ন বিষয় বোধগম্যভাবে উপস্থাপনের ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট কিছু রেওয়াজ ও আইন মেনে চলে। প্রচার মাধ্যমে পরিবেশিত বিষয়বস্তুর আকার দেয়ার কাজে উপস্থাপিত বাস্তবতার চেয়ে ঐ রেওয়াজ ও আইনগুলোর ভূমিকাই বেশি। আলাপ-আলোচনা ছাড়াই পারস্পরিক উপলব্ধির ভিত্তিতে মেনে নেয়া ঐ আইন ও প্রথাগুলো খুবই দক্ষতার সাথে নিয়ন্ত্রণ-অযোগ্য বিশাল বাস্তবতাকে "সংবাদ" বা "প্রতিবেদনে" ছোটো করে আনে। তেমনি প্রচার মাধ্যমও ঐসব ভোক্তাদের কাছে পৌছানোর চেষ্টা করে যারা বাস্তবতার ব্যাপারে নির্দিষ্ট কিছু আন্দাজ দ্বারা শাসিত। এই দুই কারণে ইসলামের (এবং অন্য যে কোনো কিছুর) ছবিটা হয় একইরকম, কোনো কোনো ক্ষেত্রে সঙ্কুচিত এবং বর্ণহীন শেডে ঢাকা।

প্রচার মাধ্যম যে লাভের ধান্ধায় ছুটে তা বলার অপেক্ষা রাখে না। তাই অন্যগুলোর চেয়ে নির্দিষ্ট এক ধরনে বাস্তবতার ভাবমূর্তি উজ্জ্বল করতে আগ্রহ তাদের। এরা তা করে এক অসচেতন ভাবাদর্শের দ্বারা সক্রিয় ও কার্যকর হয়ে ওঠা রাজনৈতিক পরিপ্রেক্ষিতের মধ্যে থেকে। সিরিয়াস রক্ষণশীলতা বা বিরোধিতা ছাড়াই প্রচার মাধ্যম ছড়িয়ে দেয় অসচেতন ভাবাদর্শেরকেও।

এখন বেশ কিছু সমর্থক বক্তব্য তৈরি হয়ে আছে। শিল্পায়িত পশ্চিমা রাষ্ট্রগুলোকে দমনমুখি অপপ্রচারণা-শাসিত রাষ্ট্র বলা যাবে না; ওগুলো অবশ্যই তা নয়। যেমন যুক্তরাষ্ট্রে যে কোনো মতামত কোথাও না কোথাও প্রকাশ করা সম্ভব। তেমনি নয়া বা অপ্রচলিত ধরনের বা জনপ্রিয়তাহীন দৃষ্টিকোণ যাচাই করে দেখার ব্যাপারে ওখানকার জনসমাজ ও প্রচার মাধ্যমের আগ্রহ নজিরবিহীন। এ ছাড়াও খবরের কাগজ, ম্যাগাজিন, টেলিভিশন, রেডিও অনুষ্ঠানগুলো এত বিচিত্র যে, সহজ চরিত্র সৃষ্টি বা সরল বর্ণনার বিরুদ্ধে রীতিমত লড়াই শুরু হয়ে যায়। কাজেই, কি করে বলি যে এখানে সবকিছু একটা সাধারণ মতই তুলে ধরে?

কেউ তা বলতেও পারবে না; সে চেষ্টা আমিও করবো না। কিন্তু আমার মনে হয় অসামান্য বৈচিত্র্য সত্ত্বেও ঝোঁক রয়েছে নির্দিষ্ট কিছু মত ও বাস্তবতার নির্দিষ্ট কিছু প্রতিনিধিত্বের দিকে। আমি আগে যা বলেছি তার কিছু কিছু আবার স্মরণ করা যাক। এরপর দেখাবো এগুলো কি উপায়ে একত্রে সমন্বিত করে প্রচার মাধ্যমের কতিপয় দিক। আমরা প্রাকৃতিক জগতের বাসিন্দা নই; সংবাদপত্র, সংবাদ, মতামত ইত্যাদি প্রাকৃতিকভাবে সৃষ্টি হয় না। এগুলো নির্মিত; মানবীয় ইচ্ছার ফলাফল, ইতিহাস, সামাজিক পরিস্থিতি, প্রতিষ্ঠান এবং মানুষের পেশাগত রেওয়াজের দ্বারা সৃষ্ট।

www.pathagar.com

বিষয়ানুগত্য, ঘটনা-নির্ভরতা, বাস্তবধর্মী প্রতিবেদন, যাথার্থ্য—প্রচার মাধ্যমের এসব লক্ষ্য আসলে আপেক্ষিক পরিভাষা। এগুলো হয়তো ইচ্ছা বা উদ্দেশ্য বোঝায়, কিন্তু অর্জনযোগ্য লক্ষ্য বোঝায় না। তবে এমন মনে করা ঠিক হবে না যে, যেহেতু আমরা আমাদের পত্রপত্রিকাকে ঘটনা-নির্ভর ও বিশ্বাসযোগ্য এবং কমিউনিস্ট ও অ-পশ্চিমা দেশের পত্রপত্রিকাকে ভাবাদর্শে অনুগত ও অপপ্রচারণামুখি বলে ভাবতে অভ্যস্ত, কাজেই ওগুলোকেও স্বাভাবিক গতিধারার গতানুগতিক চিন্তা মনে করি। আসল ঘটনা হচ্ছে, যেমন হাবার্ট গান তার গুরুত্বপূর্ণ বই *ডিসাইডিং হোয়াট ইজ নিউজে* দেখিয়েছেন সাংবাদিক, নিউজ এজেন্সী, নেটওয়ার্কগুলো সচেতনভাবেই ঠিক করে নেয় কি দেখানো হবে, কিভাবে দেখানো হবে, ইত্যাদি।[৪৬] কাজেই সংবাদ যতটা নিষ্ক্রিয় উপস্থাপন, তারচেয়ে অনেক বেশি হচ্ছে ইচ্ছাকৃত যাচাই-বাছাই ও অভিব্যক্তির জটিল প্রক্রিয়ার ফলাফল।

পশ্চিমের প্রধান সংবাদ-সংগ্রাহক ও সংবাদ-প্রচারক যন্ত্রগুলো কিভাবে কাজ করে তার প্রচুর দৃষ্টান্ত পেয়েছি আমরা সাম্প্রতিককালে। *নিউইয়র্ক টাইমস* সম্পর্কে গে টেলেস ও হ্যারিসন স্যালিসবারির বই, ডেভিড হলবার্ট স্টামের "*দি পাওয়ার দ্যাট বি*", গাই টুচমানের "মেকিং নিউজ", যোগাযোগ শিল্পের ওপর হার্বার্ট শিলারের বিভিন্ন গবেষণা, মিশেল স্কাডসনের *ডিসকভারিং দি নিউজ*, আরামান্ড ম্যাটেলার্টের *মাল্টিন্যাশনাল করপোরেশন এন্ড দি কন্ট্রোল অব কালচার*[৪৭] ভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে সম্পাদিত পাঠগুলোর কয়েকটি। এগুলো দেখায় বৃহত্তর সমাজ পরিসরে সংবাদ ও মতামত গঠনের প্রক্রিয়াটি একটি নির্দিষ্ট পরিকাঠামোর মধ্যে প্রথা বা রীতির আকারে বিদ্যমান নিয়মের দ্বারা কতদূর নিয়ন্ত্রিত। এই প্রথাগুচ্ছ গোটা বিষয়টিকে প্রদান করে এক অবিস্মরণীয় সামগ্রিক পরিচিতি। আর সব মানুষের মতো রিপোর্টারও মনে করে কিছু কিছু জিনিষ স্বাভাবিক, কিছু মূল্যবোধ আত্মীকৃত, তাই সবসময় যাচাই করার দরকার নাই; যেমন নিজের সমাজের অভ্যাসগুলো সাধারণ বলেই গ্রহণ করা হয়। ভিনদেশি সমাজ ও সংস্কৃতি বর্ণনা করার সময় বর্ণনাকারী তার নিজ শিক্ষা, জাতিত্ব ও ধর্মের কথাও ভুলে যায় না। কি বলা হচ্ছে, কিভাবে বলা হচ্ছে, কার উদ্দেশ্যে বলা হচ্ছে বলে মনে হয়—এসবের সাথে জড়িত থাকে কিছু পেশাগত নৈতিক সংকেত এবং কাজটি সম্পাদনের ধরন। রবার্ট ডারন্টন "রাইটিং নিউজ এন্ড টেলিং স্টোরিজ " নিবন্ধে এত নিখুঁত ও চমৎকারভাবে এই বিষয়টা ব্যাখ্যা করেছেন যে, আমরা তা পড়লে রিপোর্টারের কর্মপরিবেশের ব্যাপারে স্পর্শকাতর হয়ে উঠি। তেমনি "রিপোর্টার ও তার উৎসের মধ্যে পারস্পরিক নির্ভরশীলতা ও বিরুদ্ধবাদিতার সম্পর্কে" এবং "মানসম্পন্ন ও ছাঁচের অনুরূপ করার" চাপের প্রতি সংবেদনশীল হই। আবার রিপোর্টার রিপোর্টকৃত-বিষয়টি থেকে ভোক্তাদেরকে দূরে সরিয়ে নিয়ে যাওয়ার বদলে আরো নৈকট্যে টেনে নিয়ে যান যে কৌশলে, সেই কৌশলের প্রতিও একরকম সংবেদনা বোধ করি।[৪৮]

বৃটিশ ও ফরাসি প্রচার মাধ্যম থেকে মার্কিন প্রচার মাধ্যম অন্য রকম; কারণ এদের সমাজ, ভোক্তাগোষ্ঠী, সংগঠন ও স্বার্থও অন্যরকম। প্রত্যেক মার্কিন রিপোর্টারের মাথায়

www.pathagar.com

একটা কথা সবসময় চালু থাকে যে, তার দেশ পৃথিবীর একমাত্র পরাশক্তি যার নির্দিষ্ট স্বার্থ রয়েছে এবং সেই স্বার্থ হাসিলের প্রচেষ্টাও আছে, অন্য দেশগুলোর তা নেই। তত্ত্বে বা চর্চায় সংবাদপত্রের স্বাধীনতা বরাবরই একটি প্রিয় বিষয়। কিন্তু প্রতিটি মার্কিন সাংবাদিকই বিশ্ব সম্পর্কে প্রতিবেদন করার সময় সচেতন থাকে যে, তার চাকরীদাতা করপোরেশনটিও মার্কিন ক্ষমতায় অংশগ্রহণকারী। কাজেই আমেরিকা যখন অন্যদেশের হুমকির সম্মুখীন তখন তার ঐ সচেতনতা সংবাদপত্রের স্বাধীনতার ওপরে স্থান করে দেয় সরল জাতীয় পরিচয় এবং আনুগত্য ও দেশপ্রেমের পরোক্ষ অভিব্যক্তিস্বরূপ বিষয়গুলোকে। এ কোনো বিস্ময়কর ব্যাপার নয়। বরং বিস্ময়কর ব্যাপার এই যে, সচরাচর মনে করা হয় স্বাধীন সংবাদপত্র পররাষ্ট্রনীতি নির্ধারণে অংশগ্রহণ করে না, বাস্তবে যদিও বিভিন্ন উপায়ে খুবই কার্যকর অংশগ্রহণ করে। বিভিন্ন দেশে অবস্থানরত মার্কিন সাংবাদিকদেরকে সিআইএ কর্তৃক ব্যবহারের কথা না হয় বাদ দিলাম, মার্কিন প্রচার মাধ্যম আবশ্যিকভাবেই তথ্য সংগ্রহ করে সরকারী নীতির দ্বারা নিয়ন্ত্রিত পরিকাঠামোর ভেতরে থেকে। প্রচার মাধ্যম কেবল তখনই স্বাধীন মত প্রকাশ করে যখন তার সংঘাত দেখা দেয় ঐ নীতির সাথে। কিন্তু তখনো উদ্দেশ্য থাকে সরকারী নীতির ওপর প্রভাব বিস্তারের, একেবারে পরিবর্তনের লক্ষ্য যদি না-ও থাকে। প্রচার মাধ্যমের লোকজনসহ সকল আমেরিকানের কাছেই এ ব্যাপারটি গুরুত্বপূর্ণ।

বিদেশে মার্কিন সাংবাদিকরা বোধগম্যভাবেই পিছিয়ে এসে আশ্রয় নেয় সেইসব বিষয়ে যেগুলো সম্পর্কে সবচেয়ে ভালো জানে সে। কাউকে যখন ভিন্ন সংস্কৃতির মধ্যে বসিয়ে দেয়া হয় তখন এই প্রবণতা সক্রিয় হয়ে ওঠে। তা আবার বিশেষভাবে সত্যি হয় যখন ঐ সাংবাদিক মনে করেন এখানে ঘটমান সবকিছু এমন এক ভাষায় রূপান্তরিত করার জন্য এসেছে সে, যে-ভাষা তার দেশবাসীরা (নীতিনির্ধারকেরা সহ) বুঝতে পারে। অন্যসব বিদেশী সাংবাদিকের সঙ্গও খুঁজে সে। কিন্তু মার্কিন দূতাবাসের সঙ্গে যোগাযোগ রাখে, প্রবাসী আমেরিকানদের সাথেও; আমেরিকানদের সাথে সুসম্পর্ক আছে এমন লোকদের সাথেও তার যোগাযোগ থাকে। আরেকটি দিক উপেক্ষা করা অনুচিত। তা হলো, সে কেবল তার জানা ও শেখা বিষয়ের ওপর নির্ভর করে না, মার্কিন প্রচার মাধ্যমের প্রতিনিধি হিসেবে তার যে সব বিষয় জানা, শেখা ও বলা উচিত সেগুলোর ওপরও নির্ভর করে। *নিউইয়র্ক টাইমসের* সাংবাদিক জানে *নিউইয়র্ক টাইমস* কি জিনিষ, একটি অস্তিত্ব হিসেবে করেপোরেট কায়দায় এ পত্রিকা নিজের সম্পর্কে কি ভাবে তাও তার জানা। *দি ন্যাশন* বা *ইন দিজ টাইমস*-এ নিবন্ধ প্রকাশ করতে চান যে-সাংবাদিক তিনি তেহরানে বা কায়রোয় গিয়ে যে ধরনের নিবন্ধ তৈরি করবেন তার সাথে উল্লেখযোগ্য, এমনকি নিয়ামক পার্থক্য থাকবে *টাইমসের* কায়রো বা তেহরান প্রতিনিধির প্রতিবেদনের। অর্থাৎ মাধ্যম নিজেও ব্যাপক চাপ সৃষ্টি করে। *টাইমস* ম্যাগাজিনের কায়রোর ব্যুরো চীফ হয়তো অনেক সময় নিয়ে একটি প্রতিবেদন তৈরি করলেন; অন্যদিকে, এনবিসি'র কায়রো প্রতিনিধি যখন রাতের সংবাদের জন্য কোনো ঘটনাস্থল কাভার করবেন তখন তার উপস্থাপনের ধরন হবে ভিন্ন। এরপর আছে বিদেশি

www.pathagar.com

প্রতিনিধিদের পাঠানো রিপোর্টের ওপর দেশে সম্পাদকের কাটছাঁট বা পুনর্বিন্যাস; এখানে সক্রিয় হয়ে ওঠে অন্য আরেক ধরনের অসচেতন রাজনৈতিক ও ভাবাদর্শিক চাপ।

মার্কিন প্রচার মাধ্যমগুলোর বিদেশ প্রতিবেদন কেবল নয়া স্বার্থের জায়গা তৈরিতেই ভূমিকা রাখে না, সংশ্লিষ্ট দেশে আমাদের বিদ্যমান স্বার্থের বোধ আরো তীব্র করে আমাদের মধ্যে। আমেরিকার জন্য নির্দিষ্ট কিছু বৈশিষ্ট্যের জোর দেয় প্রচার মাধ্যমের দৃষ্টিকোণ, রুশ ও ইতালীয়দের বেলায় গুরুত্ব দেয় অন্য আরেক গুচ্ছ বিষয়ের ওপর। এসব কিছু একটি সাধারণ বিন্দুতে বা ঐক্যমতে পৌছে মিলে যায়। সব প্রচার মাধ্যমই অনুভব করে এই সাধারণ বিন্দুটি—একীভূত মতটিকে হতে হবে সুবিন্যস্ত ও সুগঠিত। সবই সম্ভব প্রচার মাধ্যমের পক্ষে: তা সব ধরনের দৃষ্টিকোণ তুলে ধরে, কেন্দ্রাতিগ, অনাকাঙ্ক্ষিতরকম তরল, মৌলিক, এমনকি অস্বাভাবিক অনেক বিষয়ও উপস্থাপন করে। কিন্তু যেহেতু ওরা "আমেরিকা" এমনকি "পশ্চিমা" নামের করপোরেট আত্ম-পরিচয়ের পক্ষে কাজ করে এবং একে বিকশিত করে, তাই ওদের সবার মনে একই কেন্দ্রীয় ঐক্য। একটু পর আমরা ইরানের ঘটনা আলোচনায় দেখবো কোন উপায়ে এই মতৈক্য ঠিক করে দেয় কোনটি সংবাদ হয়ে উঠবে এবং কিভাবে। এর অর্থ এই নয় যে, এটি অনিচ্ছায় নির্ধারণ বা নির্দেশ করে কোনটি সংবাদ হিসেবে গণ্য হবে, এ কোনো ষড়ন্ত্রেরও ফল নয়, স্বৈরাচারী সিদ্ধান্তের ব্যাপারও নয়। এ হলো সংস্কৃতির ফলাফল, বরং বলা ভালো এ হচ্ছে সংস্কৃতি; এবং যুক্তরাষ্ট্রের ক্ষেত্রে এ হলো প্রচার মাধ্যম—সমকালীন ইতিহাসের এক প্রশংসাযোগ্য উপাদান। আমরা কি এবং কি চাই সে ব্যাপারে প্রচার মাধ্যম যদি সংবেদনশীল না হতো তা হলে এ বিষয়টির বিশ্লেষণ বা সমালোচনার যুক্তিই থাকতো না।[৪৯]

পূর্ব-নির্দেশক্রমে বা বিমূর্তভাবে মতৈক্যের ব্যাপারটি ঘটে না, বরং বাস্তবে ঘটে বললেই ভালো হয়। পরের অধ্যায়ে ইসলাম ও ইরান সম্পর্কিত প্রচারণার আলোচনায় সংশ্লিষ্ট বিশ্লেষণে যখন এই মতৈক্যের বিষয়টি দৃষ্টিগোচর হয়ে উঠবে তখন আমি একে নিজেই নিজের কথা বলতে দেবো। কেবল দুটো সমাপনী মন্তব্য করতে চাই আমি। প্রথম কথা হচ্ছে, যুক্তরাষ্ট্রের জটিল সমাজ বিকশিত হয়েছে পরস্পর অসঙ্গতিপূর্ণ বহু উপ-সংস্কৃতি নিয়ে। তাই একটি সর্বজনগ্রাহ্য সাধারণ সংস্কৃতির কথা তুলে ধরার ব্যাপারে জোর তাগাদা থাকে প্রচার মাধ্যমের তৎপরতায়। আমাদের কালে এটি খালি গণমাধ্যমের সাথে জড়িত ব্যাপার নয়, এর বংশলতিকা আমেরিকা প্রজাতন্ত্রের প্রতিষ্ঠালগ্ন পর্যন্তও ছড়ানো। পিউরিটান যুগে "বুনো প্রকৃতিতে ছড়ানো বার্তা" থেকে আরম্ভ করে এ দেশে বরাবরই ছিলো প্রাতিষ্ঠানিকৃত মতবাদগত আলঙ্কারিক এক ভাষা। এ ভাষা অভিব্যক্ত করে বিশেষভাবে আমেরিকান চেতনা, আত্মপরিচয়, গন্তব্য ও ভূমিকা। সকল যুগেই এর কাজ হলো আমেরিকার (সেই সঙ্গে পৃথিবীর) সকল বৈচিত্র্য আত্মস্থ করা এবং ওগুলোকে বিশেষভাবে আমেরিকান ধরনে রূপান্তরিত করে নেয়া। মার্কিন জীবনে এই অলঙ্কার-সর্বস্ব ভাষা ও তার প্রতিষ্ঠান-সদৃশ উপস্থিতি চমৎকারভাবে বিশ্লেষণ করেছেন অনেক পণ্ডিতই। এদেরই অন্তর্ভুক্ত হলেন পণ্ডিত

www.pathagar.com

পেরি মিলার, এবং এ কালের স্যাকভ্যান বারকোভিচ।[৫০] এর একটা ফল হচ্ছে মতৈক্যের বিভ্রম বা মতৈক্য সম্পর্কে অলীক বিশ্বাস, বাস্তব মতৈক্য যদি না-ই থাকে। আবশ্যিকভাবেই জাতীয়তাবাদী এই মতৈক্যের অংশ হিসেবে সমাজের পক্ষে তৎপর প্রচার মাধ্যম বিশ্বাস করে ঐ ঐক্য ঠিকঠাক কাজ করছে।

দ্বিতীয় কথা হলো কিভাবে কাজ করে এই মতৈক্য। সবচেয়ে সরল ও সঠিক জবাব হচ্ছে , এটি সীমানা নির্ধারণ করে দেয় এবং চাপ সৃষ্টি করে যায়।[৫১] এটি বিষয়বস্তু নির্ধারণ করে দেয় না, তেমনি যান্ত্রিকভাবে কোনো শ্রেণী বা অর্থনৈতিক গোষ্ঠীর স্বার্থের প্রতিফলনও ঘটায় না। ধরে নেয়া যায় এটি এমন এক অদৃশ্য সীমানা এঁকে দেয় যার বাইরে যাওয়ার প্রয়োজন বোধ করে না মার্কিন রিপোর্টাররা। কাজেই, মার্কিন সেনাবাহিনী যে খারাপ কিছু করতে পারে এমন ধারণা অসম্ভব; ঠিক যেমন এরূপ ধারণা স্বাভাবিক ও দায়বোধজনিত যে, পৃথিবীতে আমেরিকা হলো এক শুভ শক্তি। যেসব ভিনদেশি সমাজ বা সংস্কৃতি (যেমন ইসরাইল) অশুভ ব্যবহার বা বর্বরতার খপ্পর থেকে ভূখন্ড ছিনিয়ে আনার নয়া প্রাণশক্তি প্রদর্শন করে তাদের সাথে একাত্ম বোধ করে আমেরিকানরা[৫২]। ঐতিহ্যিক সংস্কৃতির প্রতি আস্থা বা উৎসাহ কোনোটাই নাই ওদের; এমনকি বৈপ্লবিক নবজন্মের বেদনার ভেতর দিয়ে বিকশিত সংস্কৃতির প্রতিও না। আমেরিকানরা মনে করে সোভিয়েত ইউনিয়নের প্রচারণাও একই রকম সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক নিয়ন্ত্রণ-জবরদস্তির মধ্য দিয়ে পরিচালিত। কিন্তু মার্কিন প্রচার মাধ্যম কখনো স্বীকার করে না যে, এভাবে সীমানা টেনে দেয়া হচ্ছে এবং অব্যাহত চাপ বজায় রাখা হচ্ছে[৫৩]; এমনকি এ ব্যাপারে অনেক সময় সচেতনও থাকে না ওরা। তেহরানে আমেরিকানদের জিম্মি করার পরপর মতৈক্য সক্রিয় হয়ে ওঠে, ডিক্রী জারি করে যে, মার্কিন জিম্মিদের নিয়ে যা চলছে তা-ই ইরান বিষয়ে একমাত্র গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার; বাকী দেশটা—এর রাজনৈতিক প্রক্রিয়া, দৈনন্দিন জীবন, বিভিন্ন ব্যক্তিত্ব, ভূগোল ও ইতিহাস উপেক্ষা করা খুবই মহৎ একটা কাজ। আমেরিকাপন্থী ও আমেরিকা-বিরোধী—এই দুই মানদণ্ডে সংজ্ঞায়িত হয় ইরানের মানুষ।

রিপোর্টিং করা ও তা প্রচারের মানদন্ড বিষয়ে যে জোর দেয়া হয় তার কয়েকটা দিক নিয়েই এত কথা। তাফসীররূপী সংবাদের সংখ্যাগত অবস্থা নিয়ে সরাসরিই বলা যায়। হাতেগোনা কয়েকটা প্রতিষ্ঠানের প্রচারই ব্যাপকভাবে বিস্তৃত। তাই এগুলোর প্রভাবও খুব শক্তিশালী। যেমন, দুই-তিনটা রেডিও-নেটওয়ার্ক, তিনটা টেলিভিশন নেটওয়ার্ক, সিএনএন, গোটা ছয়েক দৈনিক, দুই (হয়তো তিনটা) সাপ্তাহিক।[৫৪] এই কয়েকটার নাম উল্লেখ করলেই চলে: সিবিএস, *টাইমস, দি নিউইয়র্ক টাইমস, এপি*। ছোটো, কমপুঁজির সংবাদ-সংস্থাগুলোর তুলনায় এগুলো অনেক বেশি লোকের কাছে পৌঁছে ছাপ ফেলে অনেক গভীরভাবে, আর সংখ্যার দিক থেকে অনেক বেশি বিশেষায়িত সংবাদের সংস্পর্শে আসে। বিদেশের খবরের বেলায় এর অর্থ পরিষ্কার: ঘটনাস্থলে গিয়ে রিপোর্ট করার মত যথেষ্ট লোক এদের আছে— অন্যদের তুলনায় অনেক বেশি। তাই সংবাদের প্রথম ভিত্তিটা সরবরাহ করে এদের রিপোর্টাররাই।

www.pathagar.com

ওদের সরবরাহকৃত জিনিষগুলো ভোক্তাদের কাছে পৌঁছে দেয় অন্যান্য সংবাদপত্র, স্থানীয় টেলিভিশন ও রেডিও-ষ্টেশনগুলো। বিদেশের ওপর রিপোর্টের এই বিরাট স্তূপ ও তার ঘনত্বের সাধারণ অর্থ দাঁড়ায় বিরাট কর্তৃত্ব। কাজেই মানুষ এইসব রিপোর্ট থেকেই অধিক হারে ঘন ঘন উদ্ধৃতি দেবে। তাই রিপোর্টের উৎস, প্রাতিষ্ঠানিক মর্যাদা, ঘন ঘন (প্রতিদিন প্রতিঘণ্টায়) প্রচার, বিশেষজ্ঞতা ও অভিজ্ঞতার ভাব, প্রভৃতির বদৌলতে *নিউইয়র্ক টাইম* ও সিবিএস অর্জন করে বিশ্বাসযোগ্যতা। ছোটো ছোটো সংবাদ-সরবরাহকারী কোম্পানীগুলোর সুবিন্যস্ত বিরাট দলটি বড় বড় সংবাদ-সংস্থাগুলোর ছোটো দলটির ওপর কখনো কখনো নির্ভরশীল, অন্য সময় কাজ করে স্বাধীনভাবে। এ দুই দল মিলে বাস্তবতার এমন এক *আমেরিকান* ভাবমূর্তি তুলে ধরে যাতে থাকে গ্রহণযোগ্য সুসঙ্গতি।

এর একটা মারাত্মক ফল হলো আমেরিকানরা প্রায় কখনোই ইসলামী বিশ্বকে দেখতে পায় না; ওরা দেখে নিয়ন্ত্রিত, সঙ্কুচিত ও বিরোধী হিসেবে উপস্থাপিত ইসলামকে। এরই করুণ পরিণতিতে এদেশে এবং ইসলামী বিশ্বে ব্যাঙের পোনার মত দেখা দেয় পাল্টা-সঙ্কোচনের অসংখ্য দৃষ্টান্ত। পশ্চিম ও আমেরিকার মানুষের কাছে ইসলাম হচ্ছে পূর্ব-পুরুষদের স্বভাবের বারংবার পনুরুজ্জীবনের ব্যাপার; তা কেবল মধ্যযুগে ফিরে যাওয়ার হুমকিই নয়, পশ্চিমে যাকে বলে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা তা ধ্বংস করার হুমকিও। অন্যদিকে, বিপুল সংখ্যক মুসলমানের কাছে "ইসলাম" হচ্ছে পূর্বোক্ত হুমকিস্বরূপ ইসলামের বিপরীতে একরকম প্রতিরোধী-প্রতিক্রিয়া। তখন ইসলাম সম্পর্কে যা-ই বলা হয় তা বাধ্য হয়েই হয়ে ওঠে ইসলামের মানবতাবাদ, সভ্যতায় এর অবদান, উন্নয়ন ও নৈতিক যাথার্থ্যের ব্যাপারে মাফ-চাওয়া ধরনের বিবৃতি। এ ধরনের প্রতিক্রিয়ায় প্রকাশিত থাকে প্রতিক্রিয়ার বোকামীর দিকটাও : অর্থাৎ কোনো একটি ইসলামী দেশ বা ইসলামী কর্তৃপক্ষকে সমগ্র ইসলাম বলে ধরে নেয়ার ঝোঁক। যেমন সাদাত খোমেনিকে অভিহিত করেন উন্মাদ ও ইসলামের কলঙ্ক নামে, এর জবাব দেন খোমেনি নিজেও; এবং এই দুই ঘটনার দোষগুণ বিচারে লিপ্ত হয় যুক্তরাষ্ট্রের মানুষ। ইসলামী কোমিটাহ্ কর্তৃক সম্পাদিত দৈনিক হত্যাকাণ্ডের সংখ্যা উল্লেখ করলে, কিংবা ১৯৭৯ সালে ১৯শে সেপ্টেম্বর প্রচারিত রয়টারের রিপোর্টমতে খোমেনি যদি বলে থাকেন ইসলামী বিপ্লবের শত্রুদের সমূলে ধ্বংস করা হবে, তা হলে অপরাধ স্বীকারকারী একজন মুসলমানের আর কিই-বা বলার থাকে? আমার কথা হচ্ছে "ইসলামের" এই দুই সঙ্কুচিত অর্থের দুটোকেই একযোগে বাদ দিতে হবে। কারণ এগুলো জিইয়ে রাখে দ্বৈত-বিকল্প; অর্থাৎ এর কোনো একটি গ্রহণ করতেই হবে। এই দ্বৈত-বিকল্প কতটা ভয়াবহ হতে পারে তার নমুনা ইরানের ঘটনা। শাহ্র আধুনিকায়নের প্রতি যুক্তরাষ্ট্রের সমর্থনের কারণে ইরানীরা মনে করে সর্বশক্তি দিয়ে শাহ্র বিরোধিতা করতে হবে। শাসকদের পক্ষ থেকে এই মনোভাবের রাজনৈতিক তাফসীর হয় এমন যে, ইসলাম এখন প্রতিপক্ষে দাঁড়িয়ে। এভাবে ইসলামী বিপ্লবও যুক্তরাষ্ট্রের বিরোধিতা করার কাজটাকে তার লক্ষ্যের অন্তর্ভুক্ত করে নেয় শাহকে

www.pathagar.com

প্রতীকী অর্থে নিউইয়র্কে প্রতিষ্ঠিত করার মধ্য দিয়ে ইসলামী বিপ্লবের বিরোধিতা অব্যাহত রেখে এর জবাব দেয় যুক্তরাষ্ট্র। অতপর নাটকের মূলদৃশ্য উন্মোচিত হয়, যেন বা প্রাচ্যতাত্ত্বিক কর্মসূচী মেনেই : অর্থাৎ তথাকথিত পশ্চিমারা প্রাচ্যজনের ভবিষ্যত পদক্ষেপ সম্পর্কে যে রকম ফতোয়া দিয়েছিলো, এখন বাস্তবে তা-ই ঘটছে, প্রাচ্যের মানুষ এখন তা-ই করছে। প্রাচ্যের চোখে পশ্চিমের মানুষ যে শয়তানমাত্র, তাই যেন আবার নিশ্চিত করে নেয় পশ্চিমারা।[৫৫]

এখানেই শেষ না। ইসলামী বিশ্বের অধিকাংশ অঞ্চল এখন যুক্তরাষ্ট্রের টেলিভিশন অনুষ্ঠানে সয়লাব। তৃতীয় বিশ্বের অন্যান্য বাসিন্দাদের মতো মুসলমানরাও অল্প কয়েকটা সংবাদ-সংস্থার ওপর নির্ভরশীল। এইসব সংস্থার কাজ হলো সংবাদগুলো তৃতীয় বিশ্বে স্থানান্তরিত করা, এমনকি বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই দেখা যায় সংবাদগুলো তৃতীয় বিশ্বেরই কোনো একটা অঞ্চল সম্পর্কিত। অর্থাৎ তৃতীয় বিশ্ব, বিশেষ করে মুসলিম বিশ্ব খবরের উৎস হওয়ার পরিবর্তে পরিণত হয়েছে সংবাদ-ভোক্তায়। ইতিহাসে এই প্রথম (এই প্রথম—অর্থাৎ এমনই এক মাত্রায়) ইসলামী বিশ্ব তার নিজের সম্পর্কে জেনে নিচ্ছে পাশ্চাত্যের তৈরি বিভিন্ন ভাবমূর্তি, ইতিহাস ও তথ্যের আলোকে। এর প্রমাণ হলো উপসাগরীয় যুদ্ধের সময় অধিকাংশ আরব—গুজব শোনা যায় সাদ্দাম নিজেও নাকি—সিএনএন-এর অনুষ্ঠান দেখে খবরের প্রধান উৎস হিসেবে। এর সাথে যোগ করা যায় এইসব বাস্তবতা : ইসলামী বিশ্বের ছাত্র-ছাত্রী ও পণ্ডিতরা কথিত মধ্যপ্রাচ্য অধ্যয়নের ব্যাপারে ইউরোপ আমেরিকার গ্রন্থাগার ও প্রতিষ্ঠানের ওপর নির্ভরশীল (ভেবে দেখুন, কেবল আরবী ভাষার গ্রন্থাদি নিয়ে একটাও গ্রন্থাগার নাই তামাম মুসলিম বিশ্বে); ইংরেজী একটি বৈশ্বিক ভাষা, সে অর্থে আরবী, ফারসি, তুর্কি তা নয়; তেমনি শক্ত আর্থ-ভিত্তির ইসলামী দেশগুলো তাদের এলিট সমাজের প্রয়োজনে যে ব্যবস্থাপক শ্রেণীটি সৃষ্টি করছে তারা তাদের অর্থনীতি, প্রতিরক্ষা-প্রতিষ্ঠান, বহু রাজনৈতিক সুবিধাদির ব্যাপারে পশ্চিম কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত বিশ্ব-ভোক্তা বাজার ব্যবস্থার ওপর নির্ভরশীল। সংখ্যাল্প স্রষ্টাদের স্বার্থে নিয়োজিত প্রচার মাধ্যমে সংঘটিত বিপ্লব যে "ইসলাম"কে কি করেছে তার একটা পরিষ্কার ও বেদনাদায়ক চিত্র পাওয়া যায় এখান থেকে।[৫৬]

বর্ণিত প্রতিক্রিয়ামুখি প্রক্রিয়ার প্রভাব থেকে দূরে, স্বাধীনভাবে ইসলামী পুনরুজ্জীবনের চেষ্টা যে হচ্ছে না, তা নয়। তবে এ ব্যাপারে কথা বলা উচিত সংশ্লিষ্ট পার্থক্যগুলো কিছুটা বিবেচনায় রেখে। এখন "ইসলামী" শব্দটি ব্যবহারে কেউ স্বস্তি বোধ করে না; কেবল যথেষ্ট সংযম ও প্রচুর সমর্থক যুক্তি থাকলেই এগুলো ব্যবহার করা চলে। কারণ অনেক মুসলিম দেশে (এবং যুক্তরাষ্ট্রে অবশ্যই) "ইসলাম" কেবল ধর্ম-নির্দেশক নয়, অনেক রাজনৈতিক ব্যাপারও বোঝায়। তাহলে কিভাবে দায়িত্ববোধের সাথে "ইসলামের" মুসলিম তাফসীর ও তার বিকাশ সম্পর্কিত আলোচনা শুরু করবো?

প্রথমে ম্যাক্সিম রডিনসনের অনুসরণে কোরআনে বর্ণিত ইসলাম ধর্মের মৌলিক শিক্ষাগুলো আলাদা করা উচিত, যা খোদার কথা রূপে বিবেচিত।[৫৭] এ হচ্ছে ইসলামী

www.pathagar.com

বিশ্বাসের ভিত্তি-পরিচয়, *স্যাটানিক ভার্সেসে* সালমান রুশদি এগুলোতেই অনধিকার হস্তক্ষেপ করতে চেয়েছেন, যদিও তার ব্যাখ্যা ও প্রচারণার ধরন আমাদেরকে সাথে সাথে এর থেকে দূরে সরিয়ে দেয়। দ্বিতীয় স্তরে আছে কোরআনের বিভিন্ন তাফসীর যার ভিত্তিতে সংগঠিত হয়েছে বহু ইসলামী গোষ্ঠী, বিধি-বিধানভিত্তিক মতবাদ, ভাষাবৈজ্ঞানিক তত্ত্বাবলী, এইসব। কোরআন থেকে উৎপন্ন এই বিপুল বৈচিত্রের (যার অধিকাংশেরই আলাদা আলাদা প্রতিষ্ঠান এমনকি সমাজও বিকশিত হয়েছে) প্রধান প্রবণতা হচ্ছে, রডিনসনের ভাষায়, "মূলে ফেরা"। এ প্রবণতা নির্দেশ করে ইসলামী বিষয়গুলোকে পরিপূর্ণ প্রাণশক্তিসমেত পাওয়ার তাড়না। এ ব্যাপারটাকে রডিনসন বলেছেন "ইসলামে স্থায়ী বিপ্লবের মত"। তবে তিনি বলেন নাই যে, সকল একেশ্বরবাদী ধর্ম ও মতবাদভিত্তিক আন্দোলনের মধ্যেই এই তাড়না থাকে। এ ক্ষেত্রে ইসলাম অন্যগুলোর তুলনায় বেশি বিপ্লবাত্মক কিনা বলা কঠিন। যাহোক, "মূলে ফেরার" প্রবণতা থেকে বিকশিত হয় বিভিন্ন আন্দোলন (যেমন ওয়াহাবী আন্দোলন, কিংবা ইরানী বিপ্লবে সক্রিয় ধর্মীয় শক্তিসমূহ)। দেশকালের পটভূমিতে এইসব আন্দোলনের প্রভাব এক এক জায়গায় এক এক রকম। উনিশ শতকের সুদানে মাহদীবাদী আন্দোলন এবং আজকের সুদানের মাহদীবাদ এক জিনিষ নয়। তেমনি মিশরে ১৯৪০-৫০-এর দশকের ভ্রাতৃত্ব আন্দোলন অনেক বেশি শক্তিশালী ছিলো। আবার এই দুই আন্দোলনই সাংগঠনিক ও লক্ষ্য বিচারে কথিত সিরীয় ভ্রাতৃত্ব আন্দোলন থেকে ভিন্ন। ১৯৮২ সালে হাফেজ আল আসাদ নির্মম কায়দায় এই আন্দোলন দমনের চেষ্টা করেন : বলা হয়ে থাকে এ সময় ভ্রাতৃত্ব আন্দোলনের কয়েক হাজার সদস্যকে হত্যা করে তার সৈন্যরা।

আমরা এতক্ষণ এমন এক ইসলামের কথা বলছিলাম যা প্রধানত—বিশেষভাবে নয়—নীতিমালা ও মতবাদ ভিত্তিক; এরই মধ্যে আমরা ঢুকে গেছি ভিন্নতা ও দ্বন্দ্বের জগতে। সুতরাং এরই মধ্যে "ইসলাম" ও "ইসলামী" শব্দগুলো ব্যবহারের সময় কিছুটা আভাস দিতে হবে কোন ইসলাম (এবং কার ইসলামের কথা হচ্ছে)। পরিস্থিতি আরো জটিলতা ধারণ করবে যখন আমাদের বিশ্লেষণ তৃতীয় স্তরে পৌঁছবে, আবার সেই রডিনসনের অনুসরণে। এবার তাকে পুরোপুরি উদ্ধৃত করা যাক:

> ইসলামে তৃতীয় আরেকটা স্তর আছে; একে সযত্নে আলাদা করতে হবে আগের দুই স্তর থেকে। এই স্তরটি গঠিত বিভিন্ন মতবাদ কার্যকর থাকার উপায় এবং মতবাদগুলোর সাথে জড়িত চর্চার সমন্বয়ে। এইসব চর্চার দ্বারা মতবাদগুলো অনুপ্রাণিত নাও হয় যদি হয়, প্রভাবিত হয় নিঃসন্দেহে। ইসলাম বিভিন্ন পদ্ধতির মধ্যে দৃঢ়ভাবে আসীন হয় মধ্যযুগে। কিন্তু এই পদ্ধতিগুলোর প্রত্যেকটিই আবার বিস্তার লাভ করে ভিন্ন ভিন্ন পথে; এমনকি যে-বিন্দুতে ওগুলো বাইরের উল্লেখ ও গ্রন্থের বিচারে সাদৃশ্যপূর্ণ, সেখান থেকেও রূপান্তরিত হয়ে সরে যায়। এখানে গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার হচ্ছে এই পরিস্থিতিকে কিছুতেই একদিকে "বিপথগামী" প্রবণতা থেকে উদ্ভূত

www.pathagar.com

মতবাদ ও কেতাবগুচ্ছ, অন্যদিকে অধিকাংশ মুসলমানের "আদি" ইসলাম—এই দুই মেরুর বৈপরীত্যের মধ্যে সঙ্কুচিত করে আনা যাবে না। এখানে এবং সবখানেই মূলানুগামী ব্যবস্থায় পবিত্র গ্রন্থের একটি মাত্র বাক্যের নয়া তাফসীর জীবন যাপনে পরিবর্তন বা সমালোচনামুখি বিপ্লবী মনোভাব গ্রহণের জন্য যথেষ্ট। তা ব্যক্তিগত মনোভাবরূপে থাকতে পারে, আবার ছড়িয়ে পড়তে পারে অন্যদের মধ্যেও। বিপরীতক্রমে, যতই দিন যাচ্ছে ততই দেখা যাচ্ছে যে, বিপ্লবী বা উদ্ভাবনামুখি পরিবর্তনের অর্থ করা হচ্ছে রক্ষণশীল, মূলানুগ ও বিচ্ছিন্নতার দৃষ্টিকোণ থেকে। অনেক দৃষ্টান্ত আছে এ প্রক্রিয়ার, যাকে বলা যেতে পারে ভাবাদর্শের সাধারণ নীতি। এর মধ্যে ইসমাইলী সম্প্রদায়ের বিকাশ চিন্তায় দাগ কাটার মতো। মধ্যযুগে প্রচলিত ব্যবস্থা উচ্ছেদের জন্য ধর্ম শিক্ষা দিতো এরা। এখন মিলিয়নিয়ার আগা খানেরা এর নেতা, যাদের মূল কাজ হচ্ছে চলচ্চিত্র তারকা ও বিখ্যাত লোকদের সাথে Dolce Vita উপভোগ করা; কেলেঙ্কারীর অনিঃশেষ তালিকা আমাদেরকে তা-ই বলে।

শেষ কথা হচ্ছে পবিত্র গ্রন্থ কোনো প্রকাশ্য ঘোষণা দেয় না। আর সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য, হোক তা প্রকাশ্য রূপ বিশিষ্ট বা অথবা ঘোষণা, নীতিমালা বা গ্রন্থের আকারে, কিংবা প্রথমটির অনুপ্রেরণায় জাগ্রত মনোভাব—সবই বিস্তৃত বিচিত্র বৈশিষ্ট্যের কথাই তুলে ধরে। এর ফলেই সবচেয়ে পরস্পর-বিরোধী তত্ত্বগুলোকেও যৌক্তিক প্রমাণ করার সুযোগ তৈরি হয়।[৫৮]

এই স্তরটিই হলো তৃতীয় ধরনের তাফসীর, কিন্তু অন্য দুইটি ছাড়া এটি বিকশিত হতে পারে না। ইসলাম ছাড়া কোরআন থাকতে পারে না, তেমনি উল্টো দিক থেকে, মুসলমানদের পাঠ ও তাফসীর ছাড়া, সামাজিকভাবে এক ছড়িয়ে দেয়ার প্রচেষ্টা ছাড়া কোরআনও থাকতে পারে না।

যেখানে তাফসীরের ব্যাপারে খুব রক্ষণশীলতা রয়েছে, যেমন সুন্নী সম্প্রদায়ে—সুন্না অর্থই ঐক্যের ভিত্তিতে প্রচলিত মত—সেখানেও বিপ্লবী আলোড়ন ঘটে যাওয়া সম্ভব। মিশরে সাদত সরকারের সাথে তথাকথিত মৌলবাদী মুসলিম দলগুলোর সংঘাত হয় বিতর্কিত আদি ইসলামী রূপকে কেন্দ্র করে। সাদত ও তার অনুসারীরা নিজেদেরকে সুন্নার দলভুক্ত মনে করে, অন্যদিকে তার বিরোধীপক্ষ দাবী করে ওরাই সুন্নার প্রকৃত অনুসারী।

ইসলামের এই তিন স্তরের সাথে যদি মুসলমানদের উল্লেখযোগ্য সংখ্যক অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যত, "ইসলামের দুঃসাহসিক অভিযান"-এর ঐতিহাসিক দীর্ঘায়ু (সাত শতক থেকে), ইসলামী সমাজের ভৌগোলিক পরিবেশের বিস্ময়কর বৈচিত্র্য (চীন থেকে নাইজেরিয়া, স্পেন থেকে ইন্দোনেশিয়া, রাশিয়া ও আফগানিস্তান থেকে তিউনিসিয়া) যোগ করি তাহলে, আমার ধারণা, আমরা উপলব্ধি করতে শুরু করবো পশ্চিমা প্রচার মাধ্যমের দ্বারা এই বিপুল বিস্তৃতিকে "ইসলাম" শব্দটি দিয়ে নির্দেশ করার অর্থ কি। এবং আমরাও এও বুঝতে পারবো যে, ইসলামী ও পশ্চিমা পরিস্থিতির

www.pathagar.com

জবাব দেয়ার ইসলামী প্রয়াস বৈচিত্র্য ও দ্বন্দ্ব সত্ত্বেও কম রাজনৈতিক নয়; এবং এগুলোও সমান গুরুত্বের সাথে তাফসীরের কৌশল, লড়াই ও প্রক্রিয়ার আলোকে বিশ্লেষণযোগ্য।[৫৯]

এখন আমি দেখানোর চেষ্টা করবো এর সাথে জড়িয়ে আছে এক গুচ্ছ জটিল বিষয়; আমার অবশ্য প্রথমেই বলে রাখা উচিত ছিলো যে-সব বিষয় আমাদের যাচাই করতে হবে সেগুলো কখনো লিখিত প্রমাণভুক্ত হয়নি।

আমরা এখনো বলতে পারি না "ইসলামী ইতিহাস" বলে সত্যিই কিছু আছে কি না; নাকি ইসলামী বিশ্বকে পশ্চিম বা জাপান প্রভৃতি অঞ্চল থেকে আলাদাভাবে চিহ্নিত করার বিচ্ছিন্ন চেষ্টাই চোখে পড়ে কেবল। তা ছাড়া, স্থায়ী আবাসী ও যাযাবর জীবনের আন্তঃসম্পর্ক কিংবা পরিবেশগত ও আর্থ-সামাজিক কাঠামোর কারণে বিশেষ কোনো ভৌগোলিক এলাকায় ইসলামের শিকড়-গাড়া কি না সে ব্যাপারে ইসলামী ও পশ্চিমা পণ্ডিতরা একমত নন। ইসলামী ইতিহাসের কালের প্রসঙ্গে ঐ দুটো ব্যাপার এতই জটিল যে, তা এমনকি সরল "ইসলাম" চরিত্রায়ণের বিরুদ্ধেও দাড়ায়। আধুনিক ইসলামী রাষ্ট্রসমূহ এবং আলাওয়ি, অটোমান, সাফায়িদ, উজবেক ও মোগল সাম্রাজ্যগুলোর সাদৃশ্য কোন জায়গায়? বিশ শতকের পূর্ব পর্যন্ত নিকট প্রাচ্যে ও মধ্যপ্রাচ্যে ইসলামের ইতিহাসে বৃহৎ রাষ্ট্র কাঠামোর প্রতীক হলো ভারত ও তুরস্ক। ইসলামী অঞ্চলের তথাকথিত তুর্কো-ইরানী ও তুর্কো-আরব অংশগুলোর পার্থক্য (এমনকি উৎপত্তি) ব্যাখ্যা করবো কিভাবে? আলবার্ট হুরাইনি সুন্দর বলেছেন যে, ইসলামে সংজ্ঞায়ণ, তাফসীরকরণ ও বৈশিষ্ট্য নির্ধারণের সমস্যা এত বিশাল যে তা পশ্চিমা পণ্ডিতদেরকে থেমে যেতে বাধ্য করে (অ-পণ্ডিতদের কথা না-ই বা তুললাম):

> ইসলামী ইতিহাসের শব্দগুলো বিভিন্ন পরিপ্রেক্ষিতে একই জিনিষ বোঝায় না; তেমনি কোনো পরিপ্রেক্ষিতেই এইসব শব্দ সবকিছুর ব্যাখ্যা দিতে সক্ষম নয়। অন্যকথায়, "ইসলাম" ও এ থেকে উদ্ভূত অন্যান্য শব্দগুলো "আদর্শ নমুনা"। যদি এগুলোকে ঐতিহাসিক ব্যাখ্যায় ও নীতিগুচ্ছ হিসেবে কাজে লাগাতে হয় তাহলে এগুলো ব্যবহার করতে হবে অত্যন্ত সূক্ষ্মভাবে, বিশেষ সীমাবদ্ধতার সাথে, অর্থের খাপ-খাওয়ানোর মাধ্যমে এবং অন্যান্য আদর্শ নমুনার সাথে সম্পর্কিত করে। আমরা কি ধরনের ইতিহাস লিখছি তার ওপর নির্ভর করবে এগুলো কতদূর ব্যবহার করা যাবে। এগুলো অর্থনৈতিক ইতিহাসে কম প্রাসঙ্গিক; যেমন রডিন *ইসলাম এট ক্যাপিটালিজম*-এ দেখিয়েছেন যেসব সমাজে ইসলামের প্রাধান্য আছে সেখানেও অর্থনৈতিক জীবন ধর্মীয় বিশ্বাস বা বিধি-বিধান দ্বারা ব্যাখ্যেয় নয়। বাণিজ্যিক ফার্মের ওপর ইসলামী আইনের প্রাধান্য সত্ত্বেও অন্যান্য বিশ্লেষণে তা বেশি প্রাসঙ্গিক। যেমন কাহেন ও অন্যান্যরা দেখিয়েছেন ইসলামী ধারণাগুলোর তুলনায় "নিকট প্রাচ্য", "ভূমধ্যসাগরীয়", "মধ্যযুগীয়", প্রাক-শিল্পযুগের সমাজ" প্রভৃতি ধারণা বেশি কাজের জিনিষ।

www.pathagar.com

> সামাজিক রাজনৈতিক ইতিহাসের ক্ষেত্রে ইসলাম কেবল ব্যাখ্যার জন্য দরকারী কিছু উপাদান সরবারাহ করতে পারে, কোনো মতেই সব প্রয়োজনীয় উপাদান নয়। সবচেয়ে প্রবলভাবে "ইসলামী" রাষ্ট্রগুলোর প্রতিষ্ঠান ও নীতিমালা ব্যাখ্যা করা সম্ভব হয় না, যদি না এর ভৌগোলিক অবস্থান, আর্থ-প্রয়োজন এবং শাসক ও সাম্রাজ্যের স্বার্থও বিবেচনায় আনা হয়। এমনকি যে-সব প্রতিষ্ঠান কেবল ইসলামী বিধানের ওপর গড়ে উঠেছে সেগুলো কেবল ঐসব ধারণায় ব্যাখ্যা করা অসম্ভব। খুঁটিয়ে পরীক্ষা করলে দেখা যায় ইসলামী দাসপ্রথা'র মত ধারণাও অটুট থাকতে পারে না; যেমন মরক্কোর আমাল সাহিত্য বিষয়ে মিলিয়টের পর্যবেক্ষণ আমাদের দেখায় ইসলামী আইনে জায়গা করে নিয়েছে কিছু কিছু স্থানীয় প্রথাও, কারণ ঐ সময় প্রথাগুলো চর্চার মধ্যে ছিলো। ইসলামী পরিভাষায় কেবল আধুনিক কালের আগের কিছু বুদ্ধিবৃত্তিক ইতিহাস ব্যাখ্যা করা সম্ভব, যা ছিলো মূলত ইসলামী জগতে উৎপন্ন ধারণাগুলোর সাথে বাইরের কিছু কিছু ধারণার সমন্বয়ে স্ব-পরিচালিত ও স্ব-বিকশিত প্রক্রিয়ার নির্মাণ। এমনকি এখন *ফালাসিফা* (*falasifa*) আরব পোষাকে গ্রীক দার্শনিক দল মনে করা যাবে না, বরং ধরে নিতে হবে এরা মুসলিম, ইসলামী বিশ্বাসকে ব্যাখ্যা করার জন্য গ্রীক ধারণা ও পদ্ধতি ব্যবহার করেছে মাত্র।[৬০]

আরো এগিয়ে যদি প্রশ্ন করা যায় *হোমো ইসলামিকাস* নামে কোনো মানবগোষ্ঠী আছে কি না কিংবা এ জাতীয় পরিভাষার জ্ঞানতাত্ত্বিক ও বিশ্লেষণাত্মক মূল্য আছে কি না, তাহলে কোনো উত্তর পাওয়া যাবে না নৃ-বিজ্ঞানীদের নিকট থেকে। ইতিহাস ও ভূগোলে বিভিন্ন জায়গা জুড়ে ছড়িয়ে ছিলো ইসলামী সমাজ। এ কারণে ইসলামী সমাজে ক্ষমতা ও কর্তৃত্বের বণ্টন সম্পর্কে যতট জানা দরকার ততটা জানি না আমরা। এ কারণে ইসলামী আইনের সূত্রসমূহ এবং ওগুলো কার্যকর থাকার সম্পর্ক বোঝা যাবে না, বোঝা যাবে না বিধি-বিধানের সাথে সেগুলোর প্রয়োগ, রূপান্তর ও টিকে থাকার সম্পর্ক। যেমন আমরা এখনো ঠিক বলতে পারি না সব বা কোনো কোনো অথবা আদৌ কোনো ইসলামী সমাজ কর্তৃত্বের ভিত্তিস্বরূপ "ঐশ্বরিক"-এর ধারণা বদলে আইনী ভাবাদর্শের ধারণা গ্রহণ করেছে কি না। ভাষা, সৌন্দর্যতাত্ত্বিক কাঠামো, রুচির সমাজতত্ত্ব, আচারের সমস্যা, শহুরে পরিসর, জনসংখ্যার পরিবর্তন, বিপ্লবের অনুভূতি প্রভৃতি বিষয় নিয়ে মুসলিম বা অমুসলিম পণ্ডিতরা এখনো গবেষণা শুরুই করেননি বলা যায়; কিন্তু এগুলো পরিপ্রেক্ষিতের সাথে জড়িত। মুসলিম রাজনৈতিক আচরণ বলে কিছু আছে নাকি? মুসলিম সমাজে কিভাবে শ্রেণী গঠিত হয়, ইউরোপের এই প্রক্রিয়ার সাথে এর পার্থক্য কি? সাধারণ দৈনন্দিন মুসলিম জীবনের প্রকাশ চিহ্নিত করা সম্ভব কোন ধারণায়, গবেষণার কোন কৌশলে, কোন প্রাতিষ্ঠানিক পরি-কাঠামো ও দলিলপত্রের সাহায্যে। শেষে, "ইসলাম" ধারণাটি কি আদৌ উপকারী, নাকি তা যতটা বলে তার চেয়েও বেশি গোপন করে, বিকৃত ও বিপথগামী করে, পরিণত করে কেবলই এক ভাবাদর্শিক

www.pathagar.com

ব্যাপারে? ইরান, মিশর ও সৌদী আরবে এখনকার ধর্মতাত্ত্বিকদের জন্য এসব জিজ্ঞাসা উত্থাপন করা এবং দশ বছর আগে উত্থাপন করার মধ্যে পার্থক্য কি? তেমনি, একজন রুশ প্রাচ্যতাত্ত্বিক, কোয়েই দ্য ওরসের একজন ফরাসি আরববিদ, কিংবা শিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন নৃ-বিজ্ঞানী কর্তৃক জিজ্ঞাসিত প্রশ্নের সাথে এসব ভাষ্যের তুলনা হবে কিভাবে?

রাজনৈতিক অর্থে আদর্শ ইসলামী প্রতিক্রিয়ারূপে উদ্ভূত তৎপরতাও পশ্চিমের "ইসলামের" তুলনায় সমান অস্বাস্থ্যকর ও পুনরাবৃত্তিমুখি; এটিও বিপর্যক সংঘাতপূর্ণ বৈচিত্র্যকে একসাথে ধরার চেষ্টা চেষ্টামাত্র। লেবানন বাদে প্রত্যেক উদাহরণেই দেখা যায় কেন্দ্রীয় ইসলামী অঞ্চলের (উত্তর আফ্রিকা থেকে দক্ষিণএশিয়া পর্যন্ত) রাষ্ট্রগুলো সচেতনভাবেই নিজেদের প্রকাশ করে ইসলামী পরিভাষায়। এটি যেমন রাজনৈতিক, তেমনি সাংস্কৃতিক ব্যাপার; এ ব্যাপারটি পশ্চিমে কেবল অতি সম্প্রতি পরিচিত হতে শুরু করেছে।[৬১] যেমন সৌদী আরবে (এর নামটাও ইঙ্গিত করে) সউদ পরিবারের রাজকীয় রাষ্ট্র এ অঞ্চলের অন্যান্য প্রধান প্রধান উপজাতিগুলোর উপর এদের বিজয়ের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত। রাষ্ট্র ও ইসলামের নামে এ পরিবারটি যা বলে ও করে তা প্রকাশ করে এদের পারিবারিক ক্ষমতা; আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের সদস্য হিসেবে এ পরিবার যা অর্জন করেছে এবং গণমানুষের মধ্যে কর্তৃত্ব ও বৈধতার মাধ্যমে যা জমিয়েছে তারও বাইরে ঐ অর্জন। একই কথা বলা যায় জর্ডান, ইরাক, কুয়েত, সিরিয়া, প্রাক-বিপ্লব ইরান ও পাকিস্তানের ব্যাপারে; পার্থক্য কেবল এইটুকু যে সবগুলো রাষ্ট্র পারিবারিকভাবে শাসিত নয়। তবে এও সত্য প্রতিটি রাষ্ট্রেই একেবারে অল্প কিছু মানুষের ক্ষুদ্র একটি দল— ধর্মীয় বা এককদল, একটি পরিবার বা আঞ্চলিক দলাদলিতে যুক্ত কোনো গোষ্ঠী—ইসলাম ও রাষ্ট্রের নামে আধিপত্য করছে আর সবার ওপর। লেবানন ও ইসরাইল ব্যতিক্রম। দুটোই ইসলামী বিশ্বে : একটায় শাসন করছে সংখ্যালঘু খ্রিস্টানরা, অন্যটায় ইহুদিরা। তবে এরাও এদের আধিপত্যের খানিকটা প্রকাশ করে ধর্মীয় পরিভাষায়।

উল্লেখিত সবগুলো রাষ্ট্রই নিজ নিজ কায়দায় বিশেষভাবে অনুভব করে যে, ওরা বাইরের কোনো হুমকির ব্যাপারে প্রতিক্রিয়া করছে এবং ধর্ম, ঐতিহ্য ও জাতীয়তাবাদ থেকে শক্তি সঞ্চয় করছে। অথচ গুরুত্বপূর্ণ বাস্তব ব্যাপার হলো এগুলোর কোনোটাই বিশেষ কোনো দুরূহ ও অস্বাভাবিক দ্বৈত বিকল্পের সংকট থেকে মুক্ত নয়। একদিকে রাষ্ট্র কাঠামো ও তার আওতাধীন জাতীয়তাবাদ ধর্ম ও গোত্রের বহুত্ববাদী বৈশিষ্ট্যের প্রতি পুরোপুরি সংবেদনশীল নয়। এর ফলে সৌদী আরবে হয়তো বিভিন্ন গোত্র মনে করছে তারা এমন এক রাষ্ট্রের চাপে পড়ে আছে যে-রাষ্ট্রটি নিজের পরিচয় দেয় "সউদ গোত্রের আরব" নামে। এবং আজকের ইরানের রাষ্ট্র-কাঠামো খুব কার্যকরভাবেই আজারবাইজানীয়, বালুচ, কুর্দি, আরব ও অন্যান্যদের ঠেসে রেখেছে; ওরা অনুভব করছে এ অবস্থার কারণে মুছে গেছে ওদের জাতিগত পরিচয়। একই অসন্তুষ্টি আরো বিস্তৃত পরিসরে সক্রিয় সিরিয়া, জর্ডান, ইরাক, লেবানন ও ইসরাইলে। অন্যদিকে,

www.pathagar.com

এইসব রাষ্ট্রের প্রতিটির আধিপত্যশীল শক্তি তথাকথিত 'বাইরের হুমকি'র বিরুদ্ধে ঐক্য দেখানোর জন্য ব্যবহার করছে কোনো না কোন জাতিগত বা ধর্মীয় ভাবাদর্শ। এ অবস্থা দেখা যায় সৌদী আরবে। ওখানে সাধারণ মানুষের নির্ভরতা অর্জনের জন্য ইসলামী ভাবাদর্শ যথেষ্ট বিস্তৃত ও বৈধ। ১৯৮০'র দশক থেকে বাদশাহ্‌কে অভিহিত করা হয় "খাদিম আল হারামেইন" নামে (মক্কা ও মদীনা এ দুই স্থানের পবিত্র রক্ষক)। এটি আরো বেশি ইসলামী কায়দার, আরো বেশি সুবিধাজনক উপাধি। সৌদী আরব ও বিপ্লবোত্তর ইরানে জাতীয় নিরাপত্তার নানা স্তরের সমার্থক ধারণায় পরিণত হয় ইসলাম। এই ধারার রাজনীতি ইসলাম বিষয়ে পশ্চিমের সৃষ্ট ছাঁচটিকেই পূর্ণ করে এবং পরিণামে এদের ওপর ডেকে আনে বাইরের ও ভেতরের উভয় রকম চাপ।

কাজেই "ইসলামে প্রত্যাবর্তন" কোনো একীভূত ও সংসক্ত আন্দোলন তো নয়ই; বরং এটি নির্দেশ করে কিছু রাজনৈতিক বাস্তবতা। যুক্তরাষ্ট্রের বিবেচনায় এ হচ্ছে বিপর্যয়কর এক শক্তি যাকে কখনো উৎসাহিত, কখনো দমন করার প্রয়োজনীয়তা বোধ করে সে। আমরা সৌদী আরবের কমিউনিস্ট-বিরোধী মুসলমানদের কথা বলি, আফগানিস্তানের সাহসী মুসলমানদের কথা বলি কিংবা সাদতের মতো যুক্তিবাদী মুসলমান ও সৌদী রাজপরিবারের কথা টানি, অথবা উল্লেখ করি মোবারক ও জর্ডানের বাদশাহ হোসেনের কথা। আমরা খোমেনি ইসলামী জঙ্গী বা গাদ্দাফীর ইসলামী "তৃতীয়পথ"কে বিদ্রুপ করি। অথচ অসচেতন মর্ষকামী মোহের মধ্যে আমরা সবাই আসলে কর্তৃত্ব ব্যবস্থাপনার হাতিয়ার হিসেবে "ইসলামী শাস্তি" ব্যবস্থাকেই শক্তিশালী করি। মিশরে মুসলিম ভ্রাতৃত্ব আন্দোলন, সৌদী আরবে একবার মদীনা মসজিদ দখলকারী মুসলিম জঙ্গীদল, সিরিয়ায় বাথ-পার্টি বিরোধী ভ্রাতৃত্ব আন্দোলন, ইরানে ইসলামী মুজাহিদ এবং ফেদাইন ও উদারনৈতিকেরা; এগুলো হলো ঐসব জাতির মধ্যে চলমান বিরোধী স্রোতের ক্ষুদ্র একটা অংশ অথচ এগুলো সম্পর্কে প্রায় কিছু জানি না আমরা। এছাড়া আছে বিভিন্ন মুসলিম জাতিগত গোষ্ঠী প্রাক্তন উপনিবেশী রাষ্ট্রগুলোয় যাদের পরিচয় চাপিয়ে রাখা হয়েছে ইসলামী পরিচয়ের স্বার্থে। এ পরিস্থিতির তলে তলে চলছে আরেক ব্যাপার: মদ্রাসা, মসজিদ, সমিতি, ভ্রাতৃত্বসংঘ, পেশাদারী সংঘ, দল, বিশ্ববিদ্যালয়, আন্দোলন, গ্রামীণ ও শহুরে কেন্দ্রগুলোতে আরো বিচিত্র ইসলামের উত্থান ঘটছে, এদের অনেকে বলছে কেবল তারাই অনুগতদের নিয়ে যেতে পারে "আসল ইসলামের কাছে"।[৬২]

এই বিচিত্র মুসলিম শক্তির একটা ক্ষুদ্র অংশকে হাতের কাছে পায় পশ্চিমের প্রচার মাধ্যম ও সরকারী মুখপাত্ররা, এবং এই ক্ষুদ্র অংশটিকে জিজ্ঞাসার মাধ্যমে এরা স্থির করে "ইসলাম" কি? সবচেয়ে ভুল প্রতিনিধিত্ব হয় ইসলামী পুনরুজ্জীবন প্রসঙ্গে।[৬৩] এর অনুগামীদের কাছে ইসলাম বরাবরই পুনরুজ্জীবনমুখি, জীবন্ত অনুভূতি ও মানবীয় উপাদানে সমৃদ্ধ। এবং বিশ্বস্তদের চিন্তায় "ইসলামী দৃষ্টি" (মন্টোগোমারি ওয়াটের কার্যকর শব্দবন্ধ[৬৪]) তাদেরকে সবসময় জড়িয়ে রাখে সৃষ্টিশীল সঙ্কটে। ন্যায় বিচার কি? অশুভ কি? কখন রক্ষণশীলতা ও ঐতিহ্যের ওপর নির্ভর করতে হয়? কখন

www.pathagar.com

ইজতিহাদ (ব্যক্তির তাফসীর) কার্যকর ওয়ে ওঠে? এইসব প্রশ্ন বহুগুণে বাড়ে এবং কাজটাও হয়ে যায়— অথচ পশ্চিমে আমরা তার প্রায় কিছুই শুনি না। ইসলামী জীবনের অনেক কিছুই কিতাব বা কিছু সংখ্যক ব্যক্তি কিংবা "ইসলাম" ধারণাটি নির্মাণের জন্য প্রয়োজনীয় পরিপাটি বুননের মধ্যে সীমবদ্ধ নয়। আমরা যা উপলব্ধির চেষ্টা করছি "ইসলাম" তার এক বিশ্বাসঅযোগ্য সূচী মাত্র।

তবু "ইসলাম" ও "পশ্চিমের" সংঘাত খুবই বাস্তব এক ব্যাপার। কিছু কিছু জিনিষ মানুষ ভুলে যায়; যেমন প্রতিটি যুদ্ধেই দুই সারি পরিখা থাকে, দুই দিকে প্রতিরোধসজ্জা দুইটা সামরিক যন্ত্র। ইসলামের বিরুদ্ধে পশ্চিমের যুদ্ধ যেমন ইসলামের শক্তির বিপরীতে পশ্চিমকে ঐক্যবদ্ধ করেছে, তেমনি পশ্চিমের বিরুদ্ধে জোটবদ্ধ করেছে ইসলামী বিশ্বের বিভিন্ন শাখাগুলোকেও। কারণ যুক্তরাষ্ট্রে ইসলাম যেহেতু তুলনামূলকভাবে সাম্প্রতিক উপাদান তাই অনেক মুসলমানের কাছে যুক্তরাষ্ট্র হলো পশ্চিমের অংশ, তাই কয়েকযুগ ধরে বিভিন্ন ইসলামী বলয়ে ধীরেস্থিরে আরোপিত এক প্রপঞ্চ।

আমি মনে করি গত দুইশ বছরের ইসলামী চিন্তাভাবনার ওপর পশ্চিমের প্রভাবকে বাড়িয়ে দেখানোর প্রবণতা আছে ইসলামী সংস্কৃতি বিষয়ক পশ্চিমা পণ্ডিতদের অনেকের মধ্যে। এরা ভুলভাবে ধরে নিয়েছেন আটলান্টিক থেকে গালফ পর্যন্ত বিস্তৃত ইসলামী চৈতন্যের কেন্দ্র দখল করে আছে "পশ্চিম" ও "আধুনিকতা"। এ কথা মিথ্যা। কারণ অন্যান্য সমাজের মত ইসলামী জগতও কোনো একবার এক বিষয়ে ঝুঁকলে পরে আবার দৃষ্টি সরে যায় অন্য কোনো বিষয়ে। প্রকৃত সত্য হচ্ছে "পশ্চিম" ইসলামে যোগ করেছে বহু বিতর্ক, অনেক গবেষণাগ্রন্থ, তাফসীরভিত্তিক কৃতিত্ব, তেমনি সৃষ্টি করেছে বহু ব্যক্তিত্ব, দল, আন্দোলন; এগুলোর পরিকল্পনা ও দায়িত্ব ভিন্ন ভিন্ন[৬৫]। কিন্তু কেবল বাইরের একটা ব্যাপার নিয়ে ইসলামী জগত ব্যস্ত হয়ে ছিলো এমন ধারণা করা ভুলঃ এ ধারণা সঠিক জায়গা থেকে টেনে নিচে নামিয়ে আনে ইসলামকে।

এখানে একটা কথা মনে করে নেয়া জরুরী : ইসলামী সংস্কৃতির একটি উৎকর্ষ নির্দেশক চিহ্ন হলো তাফসীর করার এক সমৃদ্ধ ও বিপুল সৃষ্টিশীল সামর্থ্য আছে এর। এ সংস্কৃতি দর্শনযোগ্য শক্তিশালী নন্দনতাত্ত্বিক ঐতিহ্য তৈয়ার করতে পারে নাই, এ কথা হয়তো সত্য। কিন্তু এও আগ্রহব্যঞ্জক সত্য খুব কম সংস্কৃতিই ইসলামের মত এমন ব্যাপক মৌখিক তাফসীরের শিল্পকে উৎসাহিত করেছে। সব প্রতিষ্ঠান, গোটা ঐতিহ্য, চিন্তার সকল মতবাদ, গড়ে উঠেছে ভাষ্য-বিবৃতি, ভাষিক তত্ত্ব, অনুষ্ঠানাদি থেকে। অন্য ধর্মের ঐতিহ্যে যে এমন দৃষ্টান্ত নাই, তা নয়। কিন্তু মনে রাখা দরকার, অন্য ধর্মের তুলনায় ইসলামে মৌখিক ও শব্দগত অভিজ্ঞতা বেড়ে উঠার পরিবেশ অত রেষারেষির ছিলো না, অনুগামী সমাজের অংশগ্রহণ ছিলো বেশি। কাজেই ইরানের নয়া সংবিধান যে একজন ফকীহ্‌কে পথ দেখানেঅলা হিসেবে নিয়েছে তা আচানক কোনো ঘটনা না। পথদেখানেঅলা *ফকীহ্* কিন্তু দার্শনিক-রাজা না, প্রচার মাধ্যম যেমন মনে করে; তিনি হচ্ছেন ফিকাহ্'র পণ্ডিত, আইনবিদ্যার ওস্তাদ, কিংবা বলা যায় এগুলোর মহান, বিজ্ঞ পাঠক।

www.pathagar.com

প্রধানত প্রচার মাধ্যম নিয়ে গঠিত পশ্চিমা বা মার্কিন তাফসীরকারী গোষ্ঠী এবং ইসলামী তাফসীরকারী গোষ্ঠী এই দুই দলই দুঃখজনকভাবে তাদের শক্তির বেশিটা বাজী রেখেছে পারস্পরিক সংঘাতের সঙ্কীর্ণ জায়গাটায়। যে সব বিষয় সংঘাতের সাথে সম্পর্কিত না সেগুলোকে গোণায় ধরেনি ওরা। যেহেতু "শয়তান" আমেরিকা-বিরোধী মুসলমানদের ব্যাপারে আমরা এইসব বিশ্বাস করতে একপায়ে খাড়া. তাই একটু দেখে নেয়া দরকার আসলে কি ঘটছে। পশ্চিমে "খবর" ও "ভাবমূর্তি"র লাগাম মুসলমানের হাতে নাই সত্যি। তবে এও সত্যি যে, নির্ভরশীলতার কারণগুলো বুঝতে দেরি হওয়ার ফলেই মুসলমানরা এ ব্যাপারে কিছু করতে পারছে না। তেলে ধনী দেশগুলো বলতে পারবে না যে কিছু করার জন্য দরকারী সম্পদের অভাব আছে তাদের। অভাব হচ্ছে সাগ্রহে বিশ্বে ঢোকার ব্যাপারে ঐক্যবদ্ধ রাজনৈতিক সিদ্ধান্তের। এতে প্রমাণ হয় মুসলিম দেশগুলো এখনো রাজনৈতিকভাবে সক্রিয় বা এক না। প্রথমেই বিশেষ কিছু গুণের ব্যাপারে উৎসাহ দেয়া দরকার : এর মধ্যে সচেতন ও জোরদার একটা আত্ম-ভাবমূর্তি তৈয়ার করা ও চোখে পড়ার মত করে তুলে ধরার সামর্থ্য অর্জন গুরুত্বপূর্ণ কাজ। এর অর্থ হলো মুসলমানরা, বিভিন্ন ভাবে, যে-সব ইতিবাচক (কেবল প্রতিক্রিয়াশীল ও আত্মরক্ষামূলক নয়) মূল্যবোধের পক্ষে সেগুলোর আন্তরিক হিসাবনিকাশ দরকার। এ ব্যাপারে বিরাট বিতর্ক চলছে মুসলিম বিশ্বে, তুরাথ (বিশেষভাবে ইসলামী উত্তরাধিকার) আলোচনার মধ্য দিয়ে।[৬৬] এখন দরকার এই আলোচনার বিষয় ও সিদ্ধান্তগুলি বিশ্বের অন্যান্য অঞ্চলে ছড়িয়ে দেয়া। ইসলাম ও আরবের প্রতি "পশ্চিম"-এর শত্রুতার অজুহাত দেখিয়ে বিলাপ করা এবং ন্যায়পরায়ণতা নিয়ে বসে থাকার সুযোগ নাই আর। এই শত্রুতার পেছনের কারণগুলো এবং এতে মদদদায়ী পশ্চিমা বৈশিষ্ট্যগুলো নির্ভয়ে বিশ্লেষণ করলেই এই অবস্থা পরিবর্তনের জন্য গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ নেয়া হয়ে গেলো; কিন্তু এইটুকুই সব না। নয়া আরেকদফা ইসলাম-বিরোধী অপপ্রচারণা ঠেকাতে হলে আরেকটা কিছু রাখতে হবে এর জায়গায়। ইসলামের প্রচলিত আক্রমণাত্মক ভাবমূর্তি ঠিকঠাক *অনুসরণ করা* ও *পালন করার* মধ্যে আজকাল নিশ্চিত বিরাট বিপদ; এ যাবত কেবল কিছু মুসলমান, কিছু আরব ও অল্পকিছু কালো আফ্রিকানই সে কাজটা করে আসছে। কিন্তু এর ফলেই স্পষ্ট হবে আর কি কি করা জরুরী।

আমি মনে করি শিল্পায়ন, আধুনিকায়ন, ও উন্নয়নের দিকে বে-জান দৌড়ের সময় বহু মুসলিম দেশ কখনো কখনো ভোক্তাবাজার ব্যবস্থার প্রতি ঝোঁকার ব্যাপারে খুব নমনীয় হয়ে পড়ে। মুসলমান ও প্রচার মাধ্যমের উচিত প্রাচ্যতত্ত্বের অতিকথা ও ছাঁচগুলো দূর করার উদ্দেশ্যে পৃথিবীকে একটা সুযোগ দেয়া যেন মুসলমান ও প্রাচ্যজনরা সৃষ্টি করতে পারে ভিন্ন ধাঁচের ইতিহাস, নয়া সমাজতত্ত্ব ও নয়া একরকম সাংস্কৃতিক সচেতনতা, এবং এগুলো ছড়িয়েও দিতে পারে। অল্পকথায়, নয়া ধাঁচের ইতিহাস উদযাপনের ওপর জোর দিতে হবে মুসলমানদেরকে, মার্শাল হডসন যাকে বলেছেন ইসলামীকৃত বিশ্ব, তার ব্যাপারে এবং সব ভিন্ন ভিন্ন সমাজ সম্পর্কে এমনই জরুরীত্ব ও উদ্দেশ্য নিয়ে

www.pathagar.com

আরো তদন্ত করার ব্যাপারে; তার ফলাফল ছড়িয়ে দিতে হবে মুসলিম বিশ্বের বাইরেও।[৬৭] আলী শারিয়াতী নিশ্চিত এ ধারণাই পোষণ করেন ইরানের মুসলমানদের জন্য, যখন তিনি মক্কা থেকে মদীনায় মোহাম্মদের দেশান্তরকে (হেযিরা) সর্বজনীন রূপে উপস্থাপন করেন মানুষের পরিকল্পনা হিসেবে, "একটি পছন্দ, একটা লড়াই—অবিরাম হয়ে ওঠার লড়াই। মানুষ এক অনিঃশেষ দেশান্তর, নিজের মধ্যেই নিজের দেশান্তর—কাদামাটি থেকে খোদার দিকে; মানুষ তার আত্মায় প্রবাসী।[৬৮]

শারিয়াতীর ভাবনার অনুরূপ চিন্তাধারা সূচনাপর্বের ইরানী বিপ্লবে প্রেরণা দিয়েছে। মুসলমানরা প্রকৃত বিপ্লব ঘটাতে এবং স্বৈরাচার উচ্ছেদে মৌলিকভাবেই অক্ষম বলে যে অন্ধ ধারণা আছে, উপরোক্ত চিন্তাধারার মুখে তা চিরতরে বাতিল হয়ে যায়। এরচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার হলো, ইরানী বিপ্লবের সূচনায় সেই প্রবণতা প্রবল ছিলো শারিয়াতী যেমন বলতেন—মানুষের তেজোদ্দীপক অস্তিত্ববাদী চ্যালেঞ্জ হিসেবে ইসলামকে যাপন করতে হবে, মানবিক বা খোদায়ী কোন কর্তৃত্বের নিকট নিষ্ক্রিয় হাওলা করার মধ্য দিয়ে নয়। শারিয়াতীর মতে, "স্থির মানদণ্ড"বিহীন পৃথিবীতে এবং মানবীয় কাদামাটি থেকে খোদার দিকে "দেশান্তরের" হুকুমের মধ্যে নিজের পথ কেটে নিতে হবে মুসলমানকে। মানব সমাজ নিজেই "কেইনের মেরু থেকে" (শাসক, সম্রাট, অভিজাতগোষ্ঠী; এদের মধ্যে ঘনীভূত ক্ষমতা থেকে) "আবেলের মেরুতে" (জনতার শ্রেণী, কোরানে যাকে বলা হয়েছে *আল-নাস্*: গণতন্ত্র, প্রজাতন্ত্র, সম্প্রদায়-এ) একরকম স্থানান্তর অথবা আগু-পিছু করা[৬৯]। প্রথম দিকে আয়াতুল্লাহ্ খোমেনির নৈতিক শিক্ষা ছিলো এরকম বাধ্যতামূলক। শারিয়াতীর তুলনায় কম নমনীয় খোমেনীও কঠিন মুসলিম পরিস্থিতিকে বুঝতেন *হালাল* ও *হারামের* মধ্যে অবিরামের বাছাই প্রক্রিয়া হিসেবে। এজন্য তিনি ইসলামী প্রজাতন্ত্রের ডাক দেন; তার উদ্দেশ্য ছিলো এর মধ্য দিয়ে ন্যায়পরায়ণতার প্রাতিষ্ঠানীকরণ আর দুর্বিষহ অবস্থা থেকে *মোস্তাজাফিনের* (নিপীড়িত জনতার) উদ্ধার।

এ জাতীয় ভাবনা ব্যাপক গণজাগরণ সৃষ্টি করে ইরানে। কিন্তু পশ্চিমে তা তেমন মনোযোগ আকর্ষণ করেনি। এমনকি ইসলামী দেশগুলোতেও ইরানের অভিজ্ঞতাকে ভয় করা হয়: এর শক্তিমত্তা, এর আগুন, স্বর্ণযুগে প্রায়-বিশ্বাসী বিপর্যয়কর উৎসাহের ভয়। অথচ খোমেনী-উত্তর ইরানে যে এ নিয়ে বিরাট বিতর্ক চলছে, ওইদিকে কারো মনোযোগ নাই। কাজেই ইসলামী বিশ্বে একটা ফাটল দেখা যাচ্ছে: ইসলামী জীবন সম্পর্কে প্রথাগত প্রাতিষ্ঠানিক দৃষ্টিভঙ্গি আর বিভিন্ন ধরনে তার বিরোধিতায় পাল্টা-সাংস্কৃতিক ইসলামের মধ্যে; ইরানী বিপ্লব দ্বিতীয়োক্ত দৃষ্টিভঙ্গির একেবারে প্রথমদিকের প্রকাশ্য রূপ।[৭০] শ্লেষাত্মক ব্যাপার হলো ইসলাম সম্পর্কে পশ্চিমের দৃষ্টিভঙ্গি যে বিষয়গুলোকে ইসলামের অন্তর্ভুক্ত করে, বর্তমান দৃশ্যপটে বহু মুসলমান সেগুলোরই বিরোধিতা করে; যেমন- শাস্তি, স্বৈরাচার, মধ্যযুগীয় যুক্তিবোধ, মোল্লাতন্ত্র।

www.pathagar.com

পরিপ্রেক্ষিতে শাহজাদীর কাহিনী

আমাদের উদ্দেশ্য হাসিলের জন্য ইসলামের প্রতিনিধিত্ব করার যে ক্ষমতা আছে আমাদের সেই ক্ষমতার চাপে "ইসলাম" এখনো দুর্বল। আবার, আমাদের আচরণে সাড়া দিয়ে একটি রাষ্ট্র, সরকার ও গোষ্ঠীও একে সঙ্কুচিত করে রেখেছে। এ কারণে এই "ইসলাম" প্রকৃত ইসলাম থেকে অনেক দূরের জিনিষ। "আমাদের" ও "ওদের" মধ্যে চলমান সংঘাত কারোরই কৃতিত্ব নয়। এটি যা প্রচার করে তার মধ্যে যতটা প্রকাশ করে তার চেয়ে বেশি লুকায়। আমি যা বলছি তা পরিষ্কার বোঝা যাবে প্রথম দিকের একটি জঘন্য দৃষ্টান্ত বিশ্লেষণ করলে।

১৯৮০ সালের মে'র ১২ তারিখে পাবলিক ব্রডকাস্টিং সার্ভিস (পিবিএস) প্রচার করে বৃটিশ চলচ্চিত্র নির্মাতা এন্থনি থমাস কর্তৃক নির্মিত ছবি ডেথ অব প্রিন্সেস। এ ছবির কারণে সৌদী আরব ও বৃটেনের মধ্যে একটা কূটনৈতিক কুঘটনা ঘটে গেছে মাস খানেক আগে (যদিও তা দীর্ঘস্থায়ী হয় না), যার পরিণামে বৃটেন থেকে তার রাষ্টদূতকে প্রত্যাহার করে সৌদী আরব, ইংল্যান্ডে সৌদীদের অবকাশ যাপন নিষিদ্ধ হয়; আরও নিষেধাজ্ঞা আরোপের হুমকি দেয়া ইংল্যান্ডকে। কারণ, সৌদীদের মতে ছবিটি ইসলামকে হেয় করেছে, সামগ্রিকভাবে আরব সমাজ এবং বিশেষ করে সৌদী বিচারব্যবস্থার একটি ভুল চিত্র তুলে ধরেছে। সৌদী বাদশাহী পরিবারের এক তরুণী ও আমজনতা গোত্রের প্রেমিকের মৃত্যুদণ্ডের জানা ঘটনা নিয়ে ডকুড্রামা ফর্মে সিনেমাটি তৈরি হয়। উদ্দেশ্য ঘটনার আসল সত্য খুঁজে বের করা: একজন বৃটিশ সাংবাদিক জানার চেষ্টা করেন প্রেমিকযুগলের ভাগ্যে ঠিক কি ঘটেছিলো; এ উদ্দেশ্যে তিনি প্রথমে বৈরুত যান, ওখানকার লেবানীজ ও ফিলিস্তিনীদের সাথে কথা বলেন; এরপর যান সৌদী আরবে; ওখানে, অবশ্যই, অফিসিয়ালী নানা প্রতারণা করা হয় তার সাথে; এ প্রক্রিয়ায় তিনি শেষ পর্যন্ত বুঝতে পারেন যাদের সাথে কথা বলেছেন তারা আসলে তাদের নিজ নিজ রাজনৈতিক ও নৈতিক সঙ্কটের প্রতীকরূপে শাহজাদীর কাহিনীর তাফসীর করেছেন। ফিলিস্তিনীদের কাছে ঐ শাহজাদী তাদের মতই মুক্তি ও রাজনৈতিক মত প্রকাশের স্বাধীনতার খোঁজে নিজ-সমাজ থেকে পতিত। কিছু লেবানীজ মনে করেন ঐ নারী আরবদের আভ্যন্তরীণ সংঘাতকেই মূর্ত করেছে, যে সংঘাত ছিঁড়ে দুই টুকরা করেছে লেবাননকে। সৌদী প্রাতিষ্ঠানিকদের মতে সে আর কারো মাথাব্যথা নয়, কেবল সৌদী আরবের; রাজপরিবারকে হেয় করেছে বলেই পশ্চিমারা এই ঘটনার ব্যাপারে এত আগ্রহী। সবশেষে, স্থানীয় কিছু মানুষের মতে শাহজাদীর দুঃখ-যাতনা সৌদী শাসক পরিবারের ভণ্ডামির বিরুদ্ধে তীব্র অভিযোগের মত; ওরা ইসলামকে

www.pathagar.com

ব্যবহার করছে রাজপরিবারের কুকর্ম আড়াল করার জন্য। ছবিটি শেষ হয় কোনো সিদ্ধান্ত ছাড়াই, অর্থাৎ উন্মুক্ত সমাপ্তি। এসব ব্যাখার প্রত্যেকটিতেই রয়েছে আংশিক সত্য, কিন্তু যা ঘটেছে কোনো ব্যাখ্যাতেই তার পুরোটা ধরা পড়ে নাই।

সৌদী শাসক পরিবার ছবিটির প্রদর্শনের ব্যাপারে তার বিরোধিতার কথা জানিয়ে দেয়। এর ফলে দুটো জনসমর্থনহীন ঘটনা ঘটে: স্টেট ডিপার্টমেন্টের ওয়ারেন ক্রিস্টোফার সৌদী অসন্তুষ্টির বিষয়টি প্রকাশ্যে পিবিএস-কে জানান দেন; এবং প্রধান প্রধান দৈনিকে বিজ্ঞাপন দিয়ে পিবিএসকে তাদের সিদ্ধান্ত পুনর্বিবেচনার আহবান জানায় এক্সন। প্রদর্শন বাতিল হয়ে যায় অনেক শহরেই। ছবিটি প্রচারের পর পর ক্ষতিপূরণ হিসেবে একটি এক ঘণ্টার আলোচনার আয়োজন করে পিবিএস। ছবিটি সম্পর্কে কথা বলেন ছয়জন আলোচক ও একজন নিয়ন্ত্রক। আরব লীগের একজন প্রতিনিধি, হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে কর্মরত আইনের এক অধ্যাপক, বোস্টনের এক মৌলানা, এক তরুণ "আরববিদ" (তার জন্য অস্বাভাবিক একটা উপাধি, যেহেতু তিনি না পররাষ্ট্র বিষয়ক কর্মকর্তা, না প্রাতিষ্ঠানিক পণ্ডিত), এরপর আছে মধ্যপ্রাচ্যে ব্যবসায়িক ও সাংবাদিকতার কাজে অভিজ্ঞ জনৈক নারী, সবশেষে প্রকৃতই সৌদী ব্যবস্থার ঘোর-বিরোধী এক সাংবাদিক। এক ঘণ্টায় একটি সঙ্গতিপূর্ণ আলোচনা উপস্থাপন করেন এই ছয়জন মিলে। এদের মধ্যে যারা অঞ্চলটি সম্পর্কে কিছু জানেন তারা অবস্থানগত কারনেই অফিসিয়াল "মুসলিম লাইন" মেনে কথা বলতে বাধ্য হন; যারা খুবই কম জানেন তারা তাদের কথায় সেটি প্রকাশও করেন; অন্যদের আলোচনা পরিষ্কার অপ্রাসঙ্গিক।

ছবিটি প্রদর্শনের বিরুদ্ধে চলমান চাপের কারণে যথার্থই প্রথম সংশোধনের কথা ওঠে; আমি বিশ্বাস করি তা দেখানো উচিত ছিলো। (আমার বিবেচনায় সিনেমা শিল্প হিসেবে গতানুগতিক) ছবিটির ব্যাপারে এ ক'টি গুরুত্বপূর্ণ কথা বলা হয়নি: (ক) এটি কোনো মুসলমানের দ্বারা তৈয়ার হয় নাই, (খ) সাধারণ দর্শকরা মুসলমানদের সম্পর্কে যেমন সিনেমা দেখতে চায় সেই ধাঁচের ছবির মধ্যে এটি সবচেয়ে গভীরভাবে প্রভাব ফেলার মত, অথবা অন্তত এ মানের আরো কয়েকটি ছবির সমান প্রভাবসম্পাতী, (গ) পিবিএস ও অন্যান্য জায়গার আলোচনায় পরিপ্রেক্ষিত, ক্ষমতা ও প্রতিনিধিত্বের প্রসঙ্গটি আসে নাই বললেই চলে। থমাসের ছবিতে অবশ্যই হাতের কাছে তৈরি আকর্ষণীয় উপাদান ছিলো, যা সচরাচর অন্য দেশ—যেমন ইয়েমেন বিষয়ক একটি ছবিতে থাকার কথা না; তা হচ্ছে যৌন দৃশ্য ও "ইসলামী" শাস্তি (সেই ধরনের শাস্তি যা ইসলামের বর্বরতার ব্যাপারে আমাদের সন্দেহ নিশ্চিত করে)। এ বিষয়গুলো একটি আন্তরিক ডকুড্রামার সাজ পরলে প্রচুর দর্শক টানতে পারার কথা। ১৯৮০ সালের এপ্রিল সংখ্যায় ইকোনমিস্ট মন্তব্য করে: "অধিকাংশ পশ্চিমার নিকট ইসলামী আইন মানে ইসলামী শাস্তি, যা আসলে সরল এক অতিকথা। এই ছবি সেই অতিকথাটাকেই আরো বাড়িয়ে দেবে।" মানুষ যখন জানতে পারে সৌদী সরকার এর পেছনের রশি ধরে টানছে (এক্সনের মাধ্যমে), তখন স্বাভাবিকভাবেই বেড়ে যায় দর্শকের সংখ্যা। এইসব কিছুই নিশ্চিত করে যে, *ডেথ অব প্রিন্সেস* মুসলমানদের ছবি

www.pathagar.com

নয়; এটি এমন এক ছবি যে ব্যাপারে কেবল সীমিত, জনসমর্থনহীন ও বেকার কিছু বলার সুযোগ আছে মুসলমানদের।

ছবিটির নির্মাতা ও পিবিএস-এর উচিত ছিলো একটা বিষয়ে সচেতন থাকা যে, বিষযবস্তু যা-ই হোক, ছবিটির নির্মাণ ও দৃশ্য উপস্থাপনের আকারে প্রতিনিধিত্ব করার কাজটি আসলে একটি জুতসই অবস্থানগত সুবিধার ফল; অবস্থানগত এই সুবিধাকেই আমি অন্যত্র বলেছি সাংস্কৃতিক শক্তি—এখানে, পশ্চিমের সাংস্কৃতিক শক্তি।[৭১] সৌদীদের যে বেশি টাকা তা এখানে অপ্রসাঙ্গিক। খবর ও দৃশ্যের উৎপাদন ও বিস্তারণ টাকার চেয়ে বেশি শক্তিশালী। কারণ পশ্চিমে পুঁজির চেয়ে এসব ব্যবস্থার গুরুত্ব বেশি। এ পদ্ধতিতে উদ্ভূত পশ্চিমের প্রতিনিধিত্ব খারিজ করার জন্যই সৌদী আরবের অভিযোগ অর্থাৎ ইসলামকে হেয় করার অভিযোগের পেছনের প্রতিনিধিত্বকরণ পদ্ধতি খুবই দুর্বল। সে পদ্ধতিই হচ্ছে ইসলামের রক্ষক হিসেবে সৌদী শাসক পরিবারের নিজস্ব ভাবমূর্তি।

ঐ পদ্ধতিটির আরো বিজয় অর্জিত হয় পিবিএস এর আলোচনা অনুষ্ঠানে। একদিকে পিবিএস বলার সুযোগ পায় যে, সৌদী অসন্তোষের প্রতি সাড়া দিয়ে বিষয়টি নিয়ে একটি সংবেদনশীল আলোচনা প্রচার করা হয়েছে; অন্যদিকে, তুলনামূলকভাবে অপরিচিত "প্রতিনিধি" ব্যক্তিদের অস্পষ্ট, অসম মতামত নিয়ন্ত্রণ করার মধ্য দিয়ে পিবিএস মতামতের ভারসাম্য নিশ্চিত করে, যাতে এই ভারসাম্যপূর্ণ মতামত ভবিষ্যতের সম্ভাব্য তীব্র বা দীর্ঘায়িত আলোচনার ধার ভোঁতা করে দেয়। একটি আলোচনা সতর্ক বিশ্লেষণের স্থান দখল করে। এ ঘটনার আরেকটি সফলতা হলো কেউ-ই রাশোমন-স্টাইল কাঠামো সম্পর্কে মন্তব্য করেননি, তেমনি পিবিএস-এর অনুষ্ঠানে "ভারসাম্যপূর্ণ" আলোচকবৃন্দ যে মূল বিষয় অর্থাৎ ইসলামী সমাজ সম্পর্কিত বিচার-বিবেচনার সময় আলোচনাটি অসমাপ্ত রেখে দিলেন তা নিয়ে কেউ কোনো কথা বলেননি। আমরা জানি না (হয়তো জানতে চাই না) সৌদী পরিবারের এ তরুণী আসলে কি করেছিলো, তেমনি কেবল এইটুকু জানি না যে আলোচকবৃন্দ বলেছেন "এটা একটা বাজে ছবি" আবার এও বলেছেন "খুবই সৎ ও চমৎকার একটি ছবি এটি"। কিন্তু ছবি এবং আলোচনার তলে তলে যে বাস্তব স্বীকার করা হয়নি তা হচ্ছে: এ রকম একটি ছবি নির্মাণ ও প্রদর্শন সম্ভব হয় এবং তার প্রভাবও হয় তীব্র ও মারাত্মক; কিন্তু সৌদী আরবে বানানো কোনো ছবি খ্রিস্টান ধর্ম বা যুক্তরাষ্ট্র কিংবা প্রেসিডেন্ট কার্টারকে এমন নাড়া দিতে পারবে না।

ছবির প্রদর্শন বন্ধ করার চেষ্টা চালিয়ে যাওয়ার পাশাপাশি সৌদী আরব আরেকটি কাজ করে; পুরো ঘটনাটিকেই অস্বীকারের চেষ্টা করে, অথচ তা অস্বীকার করার সম্ভব নয়। আবার পাল্টা পদক্ষেপ হিসেবে ইসলামের অন্য কোনো ছবি তুলে ধরার ক্ষমতাও নেই সৌদী আরবের। একটু আগে আলোচিত দ্বৈত অবস্থানের কারণে ছবিটির ব্যাপারে সকল অভিযোগ ব্যর্থ হয়। কেউ একজন হয় বলবে এটি এরকম নয়, না হলে বলবে ব্যাপারটি আসলে *এই রকম*; কিন্তু এই কথা কার্যকরভাবে বলার বিশেষ কায়দা আছে,

www.pathagar.com

তেমনি নির্দিষ্ট একটা জায়গায়ও দরকার যেখানে অবস্থান নিয়ে তা বলতে হবে। সৌদী মুখপাত্রের এমন কায়দা বা জায়গা কোনোটা ছিলো না। তার সামনে ছিলো এমন একটা পথ যা সাংস্কৃতিকভাবে হেয় করে অর্থাৎ ছবিটির প্রদর্শন একেবারে বন্ধ করে দেয়া। সৌদী কর্মকর্তারা কোনোরকমে দেখানোর চেষ্টা করেছেন ইসলামে অনেক ভালো জিনিষ আছে, কিন্তু এসব কথা বিতর্কে বিশেষ কোনো অনুরণন সৃষ্টি করতে পারে নাই। আরেকটা খারাপ পরিস্থিতি হচ্ছে, আমেরিকায় সাংস্কৃতিকভাবে প্রভাবশালী এমন কোনো গোষ্ঠী নাই যারা দেখিয়ে দিবে যে, ছবিটি শিল্প হিসেবে যেমন, তেমনি মহৎ কোনো বিষয় তুলে ধরার রাজনীতির বিচারেও কার্যকারণ সম্পর্কবিহীন। দুর্ভাগ্যক্রমে, তখন যুক্তরাষ্ট্রে ও বৃটেনে ছবিটির বিরোধিতা করে সৌদী অর্থের ভৃত্য হিসেবে গণ্য হওয়ার চেয়ে খারাপ কিছু আর ছিলো না (প্রকাশ্য ঘৃণা নিয়ে এমনই ইঙ্গিত দেন জেবি কেলি, ১৯৮০ সালের মে ১৭ তারিখের *নিউ রিপাবলিকে*)। যারা বিরোধী তাদের কাছে নিজেদের বক্তব্য ছড়িয়ে দেয়ার এপারেটাসও নেই যে ছবিটিকে সমালোচনার মাধ্যমে প্রতিরোধ করবেন। মার্সেল ওফালসের *দি মেমরি অব জাস্টিস* কিংবা *হলোকাস্ট* কেন্দ্রিক বিতর্কের সাথে তুলনা করলে বোঝা সহজ এ বিতর্ক কত নীরস।

ডেথ অব প্রিন্সেসের প্রদর্শনী আমাদেরকে আরো কিছু বিষয়ে নজর ফেলতে সাহায্য করে। *প্রিন্সেস কাহিনী* কানে ওঠার আগেই মার্কিন বুদ্ধিবৃত্তিক ও সাংস্কৃতিক পরিবেশ প্রবল ইসলাম-বিরোধী ও আরব-বিরোধী নিন্দায় সৃজনোন্মুখ হয়ে ছিলো। অতীতে অন্তত দুটো উপলক্ষে, নিউইয়র্কের মেয়র সৌদী বাদশাহ্‌কে সম্মান জানাতে বা সামান্য ভদ্রতা দেখাতে অস্বীকার করার মাধ্যমে সরাসরি অপমানিত করেন। অধ্যবসায়ী গবেষণায় দেখা গেছে গুরুত্বপূর্ণ সময়ে প্রদর্শিত এমন টেলিভিশন প্রোগ্রাম খুবই কম যাতে বর্ণবিদ্বেষী ও অপমানজনক কায়দায় নির্মিত কেরিকেচারের কয়েকটি খণ্ড প্রচারিত হয় না; এগুলোর মধ্যে আছে নিঃশর্ত বর্গীয় ধারণায় প্রতিনিধিত্ব করার মানসিকতা: একজন মুসলমানকে দেখা হয় সকল মুসলিম ও ইসলামের সামগ্রিক রূপের নমুনা হিসেবে।[৭২] হাইস্কুলের টেক্সট বই, উপন্যাস, সিনেমা, বিজ্ঞাপন—এগুলোর কয়টা ইসলাম সম্পর্কে সঠিক তথসমৃদ্ধ, প্রশংসার কথা না হয় বাদই দিলাম? শিয়া ও সুন্নীদের ফারাক সম্পর্কে জ্ঞান সাধারণ মানুষের মধ্যে কতটা বিস্তৃত? এক ফোঁটাও না। আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর মানবিক বিভাগের কোর্সসূচীই দেখা যাক : প্রায় সবার পাঠ্যসূচীতেই মানবিক শাখা হলো হোমার ও এথেন্সের ট্র্যাজেডীকারদের থেকে শুরু করে বাইবেল, শেক্সপীয়ার, দান্তে, সার্ভেন্টিস হয়ে দস্তভয়স্কি ও টিএস এলিয়ট পর্যন্ত বিস্তৃত রেখার মাস্টারপীস পাঠ করা। এ রকম জাতিকেন্দ্রিক কর্মসূচীতে ইউরোপের পার্শ্ববর্তী মুসলিম সভ্যতা যে খাপ খাওয়াবে সেই জায়গা কই? *মিলিট্যান্ট ইসলাম, ডেগার অব ইসলাম, আয়াতুল্লাহ খোমেনিজ মেইনক্যাম্প* প্রভৃতি সাম্প্রতিক বই বাদ দিলে ইসলামী সভ্যতার ওপর লিখিত বইপত্র কোথায়, যেগুলো অনেক পঠিত বা তথ্যসূত্রে উল্লেখিত? এংলোফাইল, ফ্রাঙ্কোফাইল ইত্যাদি পরিভাষায় আমরা যা বোঝাই সেভাবে ইসলামোফাইল শব্দে কি কোনো জনগোষ্ঠীকে বোঝানো সম্ভব? ১৯৮০'র দশকে বর্ধিত হারের মুসলিম প্রবাসী

www.pathagar.com

ও ইসলামে ধর্মান্তরিত আফ্রিকান-আমেরিকানদের কারণে ইসলাম বেশ দৃশ্যমান হয় (যেমন লুই ফারাহ্ খান), আর সেজন্যই এখন আমেরিকায় 'মুসলিম ভোটারগোষ্ঠী' বা মুসলিম জনগোষ্ঠী কথাটি বলা সম্ভব হচ্ছে।

শাহজাদীর বিতর্ক নিভে আসার পর পর *আমেরিকান স্পেকটেটর* যখন "মোহাম্মদ'স স্লথ" শিরোনামে এরিখ হফারের লেখা নিবন্ধ "মোহাম্মদ, মেসেঞ্জার অব গুড" উপ-শিরোনামসহ প্রকাশ করে তখন, দুর্ভাগ্যক্রমে সৌদীরা এ সুযোগে আক্রমণ করতে ভুলে যায়।[৭৩] তারা ইসলামকে ভুল বোঝার তালিকায় এই ব্যাপারটাও স্মরণ করে না যে, পৃথিবীতে মাত্র তিনটি দেশের ভূখণ্ড দখল করে রেখেছে যুক্তরাষ্ট্রের এক মিত্র, এবং তিনটিই মুসলিম দেশ। কেবল রাজ-পরিবারের সুনাম হানি হলেও পাল্টা ব্যবস্থার হুমকি দেয় সৌদী আরব। এক দৃষ্টান্তে ইসলাম আহত হচ্ছে, অন্য ক্ষেত্রে হচ্ছে না, এ কেমন কথা? সৌদী আরব কেন ইসলামকে বোঝার ক্ষেত্রে আজতক কোনো সাহয়ক ভূমিকা পালন করেনি? শিক্ষাক্ষেত্রে এ যাবত তাদের সবচেয়ে বড় অবদান ক্যালিফোর্নিয়ার মিডলইস্ট স্টাডিজ প্রোগ্রাম, যা পরিচালিত হয় আরামকোর (ARAMCO) এক কর্মকর্তার দ্বারা।[৭৪]

ডেথ অব প্রিন্সেস অধ্যায়ের এই পূর্ণ পরিপ্রেক্ষিতটি অত্যন্ত জটিল। গত চার-পাঁচ বছর ধরে, উপসাগরীয় সঙ্কট ও ১৯৯০-৯১ সালের যুদ্ধেরও আগে থেকে, উপসাগরীয় অঞ্চলে যুক্তরাষ্ট্রের সামরিক হস্তক্ষেপ নিয়ে আলোচনা চলে আসছিলো। সেই ১৯৭৮ সালে ক্যাম্প ডেভিড শান্তি প্রক্রিয়ায় সৌদীরা যোগদান না করার পর থেকেই বিভিন্ন নিবন্ধ ছাপা হতে থাকে সৌদী শাসক পরিবারের নানা ত্রুটি-বিচ্যুতি ও দুর্বলতা সম্পর্কে। ১৯৮০ সালের জুলাইয়ের শেষ দিকে স্বীকার করা হয় এসব কাহিনীর পেছনে আছে সিআইএ: দেখুন ডেভিড লে'র *"ওয়াশিংটন লীক দ্যাট ওয়েন্ট রং: দি সিআইএ গ্যাফ দ্যাট শক্ড সৌদী অ্যারাবিয়া"* (*ওয়াশিংটন পোস্ট*, জুলাই ৩০, ১৯৮০)। এ যাবত ষোল বছরের প্রকাশনা জীবনে *নিউইয়র্ক রিভিউ অব বুকস* মোটামুটি উপক্ষো করে এসেছে পারস্য উপসাগরীয় অঞ্চলকে। কিন্তু ক্যাম্প ডেভিড চুক্তির পরের এক বছরে পত্রিকাটি বহু নিবন্ধ প্রকাশ করে উপসাগরীয় অঞ্চলের ওপর। সবগুলোর মূল কথা হচ্ছে বর্তমান সৌদী শাসন ব্যবস্থা খুবই ভঙ্গুর। সেই সঙ্গে দৈনিক পত্রিকাগুলো আবিষ্কার করে ইসলামের উত্থান এবং শান্তি, আইনী ব্যবস্থা এবং নারী সম্পর্কিত ধারণায় মধ্যযুগীয় বৈশিষ্ট্য। অথচ এর সাথে কেউ-ই উল্লেখ করেনি যে, ইসরাইলী রাব্বিরাও নারী, অ-ইহুদি, ব্যক্তিক পরিচ্ছন্নতা ও শান্তির ব্যাপারে একই রকম ধারণা পোষণ করে, কিংবা লেবাননের ধর্মগুরুরাও দৃষ্টিভঙ্গিতে একই রকম রক্তপিপাসু ও মধ্যযুগীয়। সৌদী আরবের ইসলামী শাসন ব্যবস্থার কিছু নির্বাচিত দিকের ওপর নজর দেয়ার কায়দা দেখে মনে হয় ইসলামী শাসন-ব্যবস্থার উন্মুক্ত ও অদ্ভুত কিছু বিষয় ঘিরে আক্রমণগুলো সজ্জিত; এর ফলে এই দৃষ্টিভঙ্গিটিও যথেষ্ট উন্মুক্ত ও অদ্ভুত চেহারা পেয়েছে। এর পেছনের ইচ্ছাটা এই রকম যে, যেহেতু সৌদী আরব যুক্তরাষ্ট্রের সাথে দ্বন্দ্বে লিপ্ত হয়েছে তাই তাকে এখন "সৎ" রিপোর্টিং-এর

www.pathagar.com

মজাটা ভোগ করতে হবে, তেমনি সৌদী সেন্সরশীপ বাতিলের দাবী মেনে নিতে হবে (অথচ ইসরাইলের প্রতিটি সংবাদ আইটেমকে যে সেনাবাহিনীর মিলিটারী সেন্সর মেনে চলতে হয় সে ব্যাপারে কারো কোনো অভিযোগ নেই)। সৌদী আরবের প্রচার মাধ্যমের যে স্বাধীনতা নেই সেই ব্যাপারেও নিয়মিত ক্ষোভ প্রকাশ পায় চারদিকে। (পশ্চিম তীরের স্কুল, বিশ্ববিদ্যালয় ও আরব সংবাদপত্রগুলোর ওপর ইসরাইলী নিয়ন্ত্রণের বিরুদ্ধে কয়বার ক্ষোভ দেখানো হয়েছে?) সৌদী আরব হঠাৎ এক গীতে উদারনৈতিক ও ইহুদিবাদীদের নিন্দার অনন্য লক্ষ্যে পরিণত হয়, আবার উল্টা গীতে হয়ে ওঠে প্রবীণ প্রতিষ্ঠানিক ব্যক্তিত্ব ও রক্ষণশীল ফাইন্যান্সারদের প্রশংসা ও আদরের বিষয়। সৌদী আরবের এই পুর্নপদাবনতিকে মনে হয় গ্রহণঅযোগ্য এবং বুদ্ধিবৃত্তিকভাবে অসম্ভব, কেবল এইটুকু ছাড়া যে, এ দেশকে পরিণত করা হয় "ইসলামী" বিশ্বের সব কিছুর সুবিধাজনক প্রতীকে।

এর একদিকের পরিণামে *প্রিন্সেস* সিনেমার ঘটনাটা চলাকালে "ওদের" ভণ্ডামি ও দুর্নীতির জন্য উচ্চস্বরে দুঃখ করেছি "আমরা", প্রতিক্রিয়া স্বরূপ "ওরা" আমাদের ক্ষমতা ও সংবেদনহীনতার প্রতি ক্ষোভ প্রকাশ করেছে। এই পরিস্থিতি ক্রমে "ওদের" ও "আমাদের" মধ্যে প্রকৃত আলোচনা, বিশ্লেষণ ও আদান-প্রদানের জন্ম দেয়। "পশ্চিমা সভ্যতা" নামে প্রতিনিধিত্বকারী আদিম জোটটির সাথে দ্বন্দ্বে পরাজয় আরো শক্তিশালী করে মুসলিম আত্ম-পরিচয়কে। তা টের পেয়ে মধ্যযুীয় ধর্মোন্মাদনা ও নিষ্ঠুর নির্যাতক শাসকের বিরুদ্ধে জোরেসোরে নিন্দা শুরু করে পশ্চিমের নিজস্ব নেতৃবৃন্দের দল। ইসলামী আত্মপরিচয় প্রতিটি মুসলমানের কাছে হয়ে ওঠে আত্মরক্ষায় দরকারী জিনিষ ও ঐশ্বরিক সংগ্রামের শামিল। মনে হয় অত্যন্ত যৌক্তিক পরিণাম হচ্ছে যুদ্ধ; এখান হতেই সভ্যতার সংঘাতের জন্য হান্টিংটনের মারাত্মক পরামর্শের আবেদন।

এর একটি সূচির কাজ হলো পনর বছর পর পিবিএস-এ প্রচারিত আরেকটি "ইসলামী" সিনেমা *জিহাদ ইন আমেরিকার* (১৯৯৫) সাথে *ডেথ অব প্রিন্সেসের* বৈপরীত্য দেখানো। *প্রিন্সেস* তুলে ধরে দূরবর্তী, রোমাঞ্চকর এক জগতকে। আর পরের ছবিটি জোর দিয়ে বলতে চায় যে এখন যুক্তরাষ্ট্রই যুদ্ধক্ষেত্র, সব উন্মাদ মুসলমান সন্ত্রাস ও ভয়াবহ যুদ্ধের পরিকল্পনা করছে আমাদের মাঝখানে বসেই। এর প্রযোজক জনৈক স্টিভেন এন্ডারসন। মধ্যপ্রাচ্যের রাজনীতি, ইতিহাস, সংস্কৃতি বা ধর্ম সম্পর্কে তার কোনো অভিজ্ঞতা নাই। ছবির শুরুতে বেশ অহংকারের সাথে তার পরিচয় উল্লেখ করা হয় এই বলে যে, তিনি ইসলামী সন্ত্রাস বিষয়ে রিপোর্টিং করেছেন। এইরকম সন্দেহজনক বিশেষজ্ঞের গোটা একটা ক্যাডার গজিয়ে উঠেছে গত কয়েক যুগে। উদ্বিগ্ন গণমানুষের নিকট এদের আবেদন সংবেদনশীলতার খোঁজে ঘুরে বেড়ানো প্রচার মাধ্যমে বেশ গুরুত্ব পায়। মানুষের উদ্বেগের কারণটাও পরিষ্কার, ওয়ার্ল্ড ট্রেড সেন্টারে বোমা বিস্ফোরণ ছিলো ভয়াবহ এক ব্যাপার; তাতে জড়িত ছিলো ক্ষুদ্র একদল সন্ত্রাসী মুসলমান। কিন্তু তাদের নেতা শেখ ওমর আবদেল রহমানের কথা সরাসরি বলেননি এমারসন। এই আবদুর রহমান যুক্তরাষ্ট্রের মদদে আফগানিস্তান যুদ্ধে অংশগ্রহণ

www.pathagar.com

করে। যুক্তরাষ্ট্রের পরিকল্পনা ছিলো এদের মাধ্যমে পাল্টা-সন্ত্রাস, সন্ত্রাসে বিশেষজ্ঞতা, ইসলামী হুমকি সম্পর্কে জ্ঞানার্জন, ইত্যাদি নামে আফগানিস্তানে সোভিয়েত-বিরোধী চরমপন্থী যোদ্ধাবাহিনী সৃষ্টি। *জিহাদ ইন আমেরিকা* কিছুটা দায়িত্ববোধের পরিচয় দেয়, ইসলাম সম্পর্কে কথা বলার সময় সূক্ষ্ম বৈষম্য প্রদর্শনের ব্যাপারটির প্রতি ইঙ্গিত করে, এবং এমন কিছু কথাও জুড়ে দেয় যে মুসলমানরা শান্তিপ্রিয়—"আমাদের মতই"। কিন্তু ছবিটির উদ্দেশ্য নিষ্ঠুর, খুনি, ষড়যন্ত্রকারী, কামুক সন্ত্রাসী মুসলমানের আঁতুরঘর ইসলামের বিরুদ্ধে উস্কানি প্রদান। দৃশ্যের পর দৃশে দেখা যায় ক্ষোভে তপ্ত দাড়িঅলা ইমামরা পশ্চিম ও ইহুদিদের বিরুদ্ধে ক্রোধোন্মত্ত, গণহত্যা ও অনিঃশেষ যুদ্ধের হুমকি দিচ্ছে পশ্চিমকে। ছবির শেষে দর্শকরা সত্যিই বিশ্বাস করে যে, যুক্তরাষ্ট্র অনেক গুপ্ত-আশ্রয়স্থল, ষড়যন্ত্রকেন্দ্র আর বোমা কারখানার আখড়া; এর সবই সন্দেহহীন, নির্দোষ নাগরিকদের বিরুদ্ধে ব্যবহারের জন্য।

একটা মজার কাণ্ড ঘটেছিলো এমারসনকে নিয়ে। ওকলাহোমা সিটিতে বোমা-বিস্ফোরণের পর প্রচার মাধ্যম এমারসনকে ডাকে বিশেষজ্ঞ হিসেবে। এমারসন কোনো দ্বিধাদ্বন্দ্ব ছাড়াই ঘোষণা করেন এটি মধ্যপ্রাচ্যের লোকদের কাজ। তার কথার উস্কানিতে বেশ কিছুদিন ধরে কালোচামড়ার মুসলিম-চেহারার অপরাধীদের খোঁজ করা হয়। পরে জানা যায় বাড়িতে-গজানো শাদা ও প্রটেষ্ট্যান্ট খ্রিস্টান সন্ত্রাসীরাই বোমা বিস্ফোরণ ঘটিয়েছে। তখন আর এমারসনের চেহারা দেখা যায় না।

জিহাদ ছবিটিতে ইসলামী সন্ত্রাসীদের সাথে স্থানীয় মিলিশিয়া দল, উনাবম্বার, ইত্যাদি চরমপন্থীদের সংখ্যা ও ব্যাপ্তির তুলনা করেননি এমারসন; অথচ দেশটাকে দোজখ বানিয়ে রেখেছে এরা। ছবির শেষ অর্ধেকটা খুবই ঘনীভূত: লাফিয়ে চলে যায় দৃশ্য থেকে দৃশ্যে, একটি প্রমাণহীন ঘোষণা থেকে আরেক প্রমাণহীন ঘোষণায়। ঘোষণার বক্তব্য হচ্ছে মুসলমানরা যুক্তরাষ্ট্রকে ধ্বংসের চেষ্টা করছে। ঘটনা, সভা ইত্যাদির পুনঃপুনিকতার হারও অনুল্লিখিত। পরিশেষে এমারসন দর্শকদেরকে এই ধারণা ইসলাম সমান জিহাদ সমান সন্ত্রাস; এর ফলে আরো জোরদার হয় মুসলিম ও ইসলাম বিরোধী সাংস্কৃতিক ভীতিবোধ ও ঘৃণা।

এমারসনের ছবিটির ক্ষমতা ও কৌশলময় চাতুর্য সম্ভব হয়েছে, কারণ যুক্তরাষ্ট্রের প্রচার মাধ্যমে ইসলাম সম্পর্কে পাল্টা-দৃষ্টিভঙ্গি না থাকার কারণে, বিপুল সংখ্যক মুসলমানদেরকে যে অল্প কিছু সংখ্যক চরমপন্থীর সাথে মিলানো উচিত নয় সেই সামান্য বোধটুকুও নেই। "ইসলামের" এমারসনকৃত প্রতিনিধিত্ব যে বিদ্বেষ ছড়িয়ে দেয় তার অনেকটা এসেছে এর অনুমিত এন্টি-সেমেটিজম ও ইসরাইলের প্রতি ঘৃণার কারণে। ইসরাইলে আত্মঘাতী বোমা বিস্ফোরণের পর ব্যাপক ধ্বংসযজ্ঞের অনেকগুলো দেখানো হয় ছবিতে। উল্লেখ করা হয় বুয়েনেস আয়ার্সের ইহুদি সাংস্কৃতিক কেন্দ্রে বোমা বিস্ফোরণের কথাও, যার জন্য কোনো মুসলিম অপরাধী ধরা পড়েনি। কাজেই একটা ব্যাপার পরিষ্কার যে, ইসলামী সন্ত্রাসকে ছবিতে মূর্ত করার উদ্দেশ্য হলো আমেরিকায় ইহুদি সমর্থকদের মধ্যে রাগ ও অসন্তোষ সৃষ্টি; তাদের কাছে ইসরাইল নিষ্পাপ, অকারণ

www.pathagar.com

সেমিটিক-বিরোধী ইসলামী সন্ত্রাসের শিকার। এটি অবশ্যই ইসরাইলের অফিসিয়াল দৃষ্টিভঙ্গির লাইন, যা যুক্তরাষ্ট্রের সহায়তায় অস্পষ্ট করে তোলে ইসরাইলী অপকর্মগুলো : যেমন- দখলীকৃত পশ্চিম তীর, গাজা, পুব জেরুজালেম, গোলান হাইট ও দক্ষিণ লেবাননে স্কুল, হাসপাতাল, এতিমখানা, সাধারণ আবাসিক এলাকায় কয়েকযুগ ধরে নির্বিচার বোমা বর্ষণ। এর সব কিছুই সতর্কতার সাথে বাদ রাখা হয় এমারসনের ছবি থেকে। বুঝি ইসলাম সম্পর্কে মার্কিন দর্শকদের ঘৃণা ও ভয় সকল মুসলমানের বিরুদ্ধে সরাসরি লেলিয়ে দিতে পারলেই ভালো হতো; কারণ "আমরা" কেবল গণতন্ত্র ও স্বাধীনতাকেই ভালোবাসি, এ ছাড়া আমরা সম্পূর্ণ নিরপরাধ।

এখানে এবং ইসলামী বিশ্বে যে "পশ্চিম" ও "ইসলাম" প্রভৃতি দমনকারক আখ্যাগুলোর সীমাবদ্ধ আবিষ্কার করবে, তেমন আশা করা বাড়াবাড়ি। তেমনি এ আশাও অতিরঞ্জন যে, যে এইসব লেবেল ও তার সমর্থক পরিকাঠামোগুলো সময়ে আপনাআপনি তাদের রুদ্ধ করার ক্ষমতা হারাবে। কিন্তু এমন সম্ভব যে, "ইসলামকে" আর অতটা আদিম ও ভীতিকর মনে হবে না। এবং হয়তো তখন আরো পরিষ্কার হবে যে, এই "ইসলাম" আমাদের রাজনৈতিক উদ্দেশ্য সাধন ও উদ্বেগ মূর্ত করার লক্ষ্যে সৃষ্ট তাফসীরের পরিণাম মাত্র। আমরা যদি চূড়ান্ত পর্যায়ে তাফসীরের শক্তি ও আত্মমুখি উপাদানগুলোকে বুঝতে পারি, এবং যদি চিনতে পারি যে আমরা স্বীকার না করলেও অনেক জিনিষই মূলত *আমাদের*, তাহলেই আমরা অনেক বদ বিশ্বাস, অতিকথা বর্জনের পথে অনেকটা এগিয়ে যাবো, যেসব বাজে বিশ্বাস আমরা ধরে রেখেছি আমাদের ও গোটা পৃথিবী সম্পর্কে। তাই এমনকি "খবর" জিনিষটাকে বুঝতে হলেও আমাদের জানতে হবে আমরা কি, আমরা যে সমাজে বাস করি কিভাবে তার একটা অংশ সক্রিয়। কেবল তাহলেই আমাদের "ইসলাম" ও মুসলমানদের ইসলাম সম্পর্কে জানার লক্ষ্যে এগুতে পারবো আমরা।

এখন বিশ্লেষণ করে দেখা যাক "ইসলাম" ও "আমাদের" মধ্যে সবচেয়ে সঙ্কটময় অধ্যায়টি: ইরানের জিম্মি সঙ্কট, এখনো, এই ১৯৯০-এর দশকেও ইরান ও যুক্তরাষ্ট্রের সম্পর্কের অচলাবস্থার মধ্যে শোনা যায় তার প্রতিধ্বনি। এ অধ্যায়টিতে অনেক কিছু দেখার আছে, অনেক রাজনৈতিক সন্দেহ দূর করার ব্যাপার আছে। তার একটা কারণ এ ঘটনা আমাদের জন্য খুবই বেদনায়ক গাঢ় একটা ব্যাপার; দ্বিতীয়ত, এ ঘটনা অনেক কিছুই বলে মুসলিম বিশ্বের অন্যান্য অঞ্চলে সম্প্রতি সূচিত প্রক্রিয়াগুলো সম্পর্কে। ইরান দিয়ে শুরু করলে পরে আমরা পৌঁছতে পারবো সর্বশেষ পর্যায়ে পশ্চিম ও ইসলামের সংযোজক বিষয়গুলোর আলোচনায়।

www.pathagar.com

দ্বিতীয় অধ্যায়

ইরান কাহিনী

www.pathagar.com

www.pathagar.com

পবিত্র যুদ্ধ

১৯৭৯ সালের ৪ঠা নভেম্বর একদল ইরানী ছাত্র সম্পূর্ণ বে-আইনী ও অপমানজনকভাবে দখল করে নেয় তেহরানের মার্কিন দূতাবাস। অবিশ্বাস্য খুঁটিনাটিসহ এ ঘটনাটিকে তুলে ধরে প্রচার মাধ্যম এবং এভাবে ইরানকে মানবেতর এক দৈত্যে হিসেবে চিত্রিত করার চেষ্টা চালিয়ে যায় পরবর্তী কয়েক বছর ধরে। এসব কারণে, ইরান অব্যাহতভাবে উস্কে দিতে থাকে আমেরিকানদের তপ্ত আবেগ। দেশের কূটনীতিকরা কোনো দেশে জিম্মি হয়ে আছে এবং আমেরিকা তাদেরকে ছাড়িয়ে আনতে পারছে না—এ খবরটা জানা এক কথা, কিন্তু রাতের পর রাত টেলিভিশনে সে ঘটনা সংঘটিত হতে দেখা আরেক জিনিষ।

এখন আমরা একটা পর্যায়ে এসে পৌঁছেছি যেখানে দাঁড়িয়ে ঠিক করে জানা দরকার ইরান কাহিনীটা আসলে কি। আবেগহীন যুক্তির আলোকে বুঝে নেয়া দরকার মার্কিন চৈতন্যে এর জায়গা কোথায়। ইরান সম্পর্কে আমেরিকানদের জ্ঞানের শতকরা নব্বই ভাগ এসেছে রেডিও, টেলিভিশন ও সংবাদপত্রের মাধ্যমে। আমেরিকানদের জিম্মি করার কারণে ফুঁসে ওঠা ক্ষোভ ও আঘাত দূর করা অসম্ভব। তেমনি সম্ভব নয় ইসলামী বিশ্বের আভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্বে গজানো সন্দেহও।

তবে আমি মনে করি, একটা মাত্র ব্যতিক্রম বাদে আমেরিকা যে ইরানের বিরুদ্ধে সামরিক শক্তি খাটায়নি সেজন্য আমাদের কৃতজ্ঞ থাকা উচিত। যাইহোক, ইসলামী বিশ্বের সাথে পশ্চিমের সম্পর্ক কি এবং যুক্তরাষ্ট্রের সাধারণ পরিপ্রেক্ষিতে আমেরিকানদের কাছে ইরান মূলত কি তার একটা বিবরণ ও মূল্যায়ন আমাদের নিতে হবে : অর্থাৎ প্রচার মাধ্যম ইরানকে দিনের পর দিন কোন দৃষ্টিতে দেখেছে, কি উপায়ে একে আমেরিকানদের কাছে উপস্থাপন ও পুনঃউপস্থাপন করেছে— এই সব।

দূতাবাস দখলের পর রাতের সংবাদ কর্মসূচীর প্রায় সবটাই কব্জা করে নেয় ইরান। এবিসি টেলিভিশন রাতের অনুষ্ঠানে বহুমাস ধরে দেখায় "আমেরিকা হেল্ড হোস্টেজ", পিবিএস টেলিভিশন ম্যাকনেইল/লেহরার রিপোর্ট প্রচার করে বহুদিন ধরে প্রায় অসংখ্যবার, কয়েক মাস ধরে "দ্যাটস দ্য ওয়ে ইট ইজ" মনে করিয়ে দিতো জিম্মি সংকট কতদিন অতিক্রম করলো : দুই শ' সাততম দিন, ইত্যাদি। জিম্মি সংকট শুরু হওয়ার পর এবিসির টেড কোপেলের *নাইট লাইন* আরেকটি সফল অনুষ্ঠান। স্টেট ডিপার্টমেন্টের মুখপাত্র হডিং তো প্রথম সপ্তাহেই স্টার বনে যান। অন্যদিকে, ১৯৮০ সালে এপ্রিলের ব্যর্থ উদ্ধার অভিযানের আগ পর্যন্ত সেক্রেটারি সাইরাস ভ্যান্স কিংবা জিভ্গনিউ ব্রেঝেনস্কি এই দুইজনের কাউকেই খুব একটা দেখা যায়নি। আবুল বনি

www.pathagar.com

সদরের সাথে সাদেক ঘোতবজাদেহর কথোপকথন, জিম্মিদের বাবা-মার সাক্ষাৎকার আর ইরানীদের বিক্ষোভ, ইসলামের ইতিহাস বিষয়ে তিন মিনিটের পরিচিতিমূলক প্রচারণা, দুঃখী গম্ভীর মুখের ভাষ্যকার ও বিশেষজ্ঞদের বিশ্লেষণ, প্রতিফলন, বিতর্ক, বাখোয়াজী ও আগাম তত্ত্ব, তৎপরতার ধারা, ঘটনাবলীর ভবিষ্যৎ ভাষ্য সম্পর্কে আন্দাজী বক্তব্য, মনস্তত্ত্ব, সোভিয়েত ইউনিয়নের তৎপরতা এবং মুসলমানদের প্রতিক্রিয়া, ঘুরে ফিরে এইসব প্রচার হতে থাকে। এবং তখনো অবরুদ্ধ হয়ে পঞ্চাশ জনেরও বেশি আমেরিকান।

এই সঙ্কটকালে ইরানীরা যে প্রচার মাধ্যমকে ব্যবহার করেছে তার প্রকাশ্য প্রমাণ পাওয়া যায়। ওরা মনে করা এই ব্যবহার ছিলো তাদের সুবিধার্থে; এবং এই মনে করার ব্যাপারটাও নেটওয়ার্কে হারিয়ে যায়নি। যুক্তরাষ্ট্রের স্যাটেলাইট ডেডলাইন ও রাতের খবর মোকাবেলার জন্য প্রায়ই বিভিন্ন "ঘটনার" দিনক্ষণ স্থির করা হতো। আর ইরানী কর্মকর্তারা সময় সময় বলতো যে, তাদের উদ্দেশ্য এই ঘটনার মধ্য দিয়ে মার্কিন জনগণকে মার্কিন সরকারের পররাষ্ট্রনীরিত বিরুদ্ধে ক্ষেপিয়ে তোলা। শুরুতে তা ছিলো বাজে ও ভুল একটা হিসাব। পরে দেখা যায় এই নীতি অনুসরণের ফলে কিছুটা উদ্ভট কিন্তু অযাচিত নয় এমন একটা পরিস্থিতি তৈয়ার হয় : আন্তরিকভাবে আরো অনুসন্ধিৎসু দৃষ্টিভঙ্গির সূচনা হয় প্রচার মাধ্যমে। কিন্তু আমি এখানে দেখাতে চাই সঙ্কটের ঠিক জটিল সময়টায় আমেরিকানদের দৃষ্টিতে কিভাবে দেখা হয় ইরানকে। সঙ্কটের অন্যদিকটা কম গুরুত্ববহ বলে আলোচনায় আসবে পরে।

প্রথম অধ্যায়ে আমি বলেছি গত এক যুগে ইরানসহ আরব-ইসরাইল সংঘাত, তেল ও আফগানিস্তান বিষয়ে যাবতীয় খবর—সচরাচর খারাপ খবর—ছিলো আসলে "ইসলাম" বিষয়ক খবর। এর সবচেয়ে খোলামেলা চেহারা দেখা যায় ইরান-সঙ্কটের সময়। তখন মার্কিন সংবাদ-ভোক্তাদেরকে একটি জনগোষ্ঠী, সংস্কৃতি ও ধর্ম সম্পর্কে এমন তথ্যাদি দেয়া হয় যা একেবারেই নিম্নমানের বিবরণ, ভুল-উপলব্ধি থেকে উদ্ভূত বিমূর্ত ধারণারাশি মাত্র; ইরানের ক্ষেত্রে সেই জনগোষ্ঠী, সংস্কৃতি ও ধর্মকে দেখানো হয় জঙ্গী, বিপদজনক ও আমেরিকা-বিরোধী চেহারায়।

যে কারণে ইরান-সঙ্কট প্রচার মাধ্যমের তৎপরতা পরীক্ষার চমৎকার উপলক্ষ হয়ে ওঠে, সেই একই কারণে তা আমেরিকানদের উদ্বেগের বিষয়ে পরিণত হয়। তা হলো এর দীর্ঘস্থায়িত্ব এবং ইরানকে গোটা মুসলিম জাহানের সাথে আমেরিকার সম্পর্কের একরকম প্রতীক রূপে দেখার ঘটনা। প্রথম দুইতিন মাসে প্রচার মাধ্যমের একটা প্রবণতা পরিষ্কার ধরা পড়ে; তেমনি এ মনোভাবকে দীর্ঘদিন জিইয়ে রাখার জন্য তাদের পরিকল্পিত কাজকর্ম থেকেও এর গুরুত্ব বোঝা যায়। অথচ এদিকে তখন নয়া চ্যালেঞ্জের সূচনা হচ্ছে, এমন সব রাজনৈতিক পরিবর্তন ও সঙ্কট তৈয়ার হচ্ছে, এখন থেকে পশ্চিমকে যেগুলো মোকাবেলা করতে হবে। এই দিকে চোখ পড়ে নাই প্রচার মাধ্যমের। সময়ে প্রচার মাধ্যমের কাভারেজে পরিবর্তন দেখা দেয়, কিন্তু সব মিলিয়ে শুরুর অবস্থার তুলনায় সামান্য আশাব্যঞ্জক পরিবর্তন আসে মাত্র।

www.pathagar.com

তেহরানস্থ মার্কিন দূতাবাস দখলের ঘটনায় উদ্ভূত অসংখ্য ঘটনা থেকে কয়েকটি ছেঁকে তোলার অর্থ হলো নির্দিষ্ট কয়েকটি ব্যাপার আলোচনার আওতায় এনে একটা সীমানা দাগ আঁকা। এক নম্বরে হচ্ছে, "আমাদের" অবস্থান একেবারে আলাদা, আমাদের মধ্যে আছে সবকিছুর স্বাভাবিক, গণতান্ত্রিক, যৌক্তিক শৃঙ্খলা। আর, ওইখানে নিজেরই উন্মত্ততায় মোচড়াচ্ছে ইসলাম—যার বর্তমান প্রকাশ হলো বিরক্তিকর, মাথাখারাপ ইরান। নভেম্বরের ২৬ তারিখের *টাইমসে* ইরানের শিয়াদের সম্পর্কে বক্স করা একটা লেখার শিরোনাম দেয়া হয়: "শাহাদাতের মতবাদ"। একই দিনে *নিউজ উইক* তার একপাতার একটা লেখার নাম দেয় "শহীদ হওয়ার ব্যাপারে ইরানের মনস্তাত্ত্বিক জটিলতা", যেন *টাইমসের* অনুকরণ।

এর জন্য প্রচুর প্রমাণ যেন হাতের কাছে মজুদ। ইরান ও পারস্য উপসাগরীয় অঞ্চল সম্পর্কে অনুষ্ঠিত একটা ওয়ার্কশপের কার্যবিবরণী ছাপা হয় নভেম্বরের ৭ তারিখের *সেন্ট লুইস পোস্ট ডিসপ্যাচ*-এ। ওখানে জনৈক বিশেষজ্ঞের বরাত দিয়ে বলা হয় "ইসলামী কায়দার সরকার ব্যবস্থার কাছে ইরানকে হারিয়ে ফেলার ঘটনা সাম্প্রতিক বছরগুলোয় যুক্তরাষ্ট্রের সবচেয়ে বড় পশ্চাদপদতার নমুনা।" সুতরাং বলা যায় ইসলাম যুক্তরাষ্ট্রের স্বার্থবিরোধী। নভেম্বরের ২০ তারিখ *ওয়াল্ডস্ট্রীট জার্নাল* তার সম্পাদকীয়তে লেখে, "একদা যে পশ্চিম এইসব সভ্য ধারণা ছড়িয়ে দিয়েছিলো তার নিজেরই এখন অবনতির কাল"। বুঝি পশ্চিমা না হওয়ার কারণে ইসলামসহ তৃতীয় বিশ্বের মানুষদের মধ্যে যেন সভ্যতার ধারণা থাকার কথা নয়। এরপর আছে কলাম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক জে. সি. হারউইৎজ। নভেম্বরের ২১ তারিখে এক সাক্ষাৎকারে এবিসির রিপোর্টার যখন তাকে জিজ্ঞেস করেন শিয়া মুসলিম মানেই কি আমেরিকা-বিরোধী, তখন হ্যাঁ-সূচক ভঙ্গি করে জবাব দেন হারউইৎজ।

সব টিভি ভাষ্যকারই "এ দেশের প্রতি মুসলমানদের বিদ্বেষের" কিংবা আরো কাব্যিক ভাষায় "সঙ্কটের চাঁদ", বা "প্রান্তরের ওপর দিয়ে বয়ে যাওয়া তুফান"-এর কথা বলেন নিয়মিতভাবে (রেনল্ড, এবিসি, নভেম্বর ২১)। ডিসেম্বরের ৭ তারিখে রেনল্ড "আল্লাহু আকবর" শ্লোগানরত একদল মানুষের পটভূমিতে মন্তব্য করে : ভিড় করে আসা মানুষদের মূল অনুভূতি আমেরিকার প্রতি ঘৃণা। এ অনুষ্ঠানেই একটু পরে আমাদের জানানো হয় নবী মোহাম্মদ "একজন স্ব-ঘোষিত নবী (কিন্তু কোন নবীই বা স্ব-ঘোষিত নন?) এবং "আয়াতুল্লাহ্"ও "বিশ শতকের স্ব-গৃহীত উপাধি" যার অর্থ আল্লাহর প্রতিফলন (দুঃখজনক ব্যাপার যে, এর কোনোটাই পুরা সঠিক নয়)। ইসলাম বিষয়ে এবিসির সংক্ষিপ্ত (তিন মিনিটের) কোর্সে ছবির ডানে থাকে ছোট্টো শিরোনাম। এর বক্তব্যও এক : ইসলামের জবাব হলো ক্ষোভ, সন্দেহ, ঘৃণা। আর ইসলাম হলো মোহামেডানিজম, মক্কা, পরদা, চাদর, সুন্নী, শিয়া (সাথে থাকে আত্মপীড়নরত যুবকদের ছবি), মোল্লা, আয়াতুল্লাহ্ খোমেনী, ইরান। এইসব ছবি দেখানোর পরপরই অনুষ্ঠান চলে যায় উইসকনসনের জেনসভাইলে। ওখানে দেখা যায় চমৎকার শিশুর দল—কোনো পর্দা নেই, আত্মপীড়নের ব্যাপার নেই, মোল্লা নেই—দেশপ্রেমে আকুল হয়ে "ইউনিটি ডে" পালনের প্রস্তুতি নিচ্ছে।

www.pathagar.com

১৯৮০ সালের জানুয়ারীর ৬ তারিখে *নিউইয়র্ক টাইম সানডে ম্যাগাজিন* লিখে "ঐতিহাসিক ঘূর্ণিঝড়: জঙ্গী ইসলাম"; ডিসেম্বরের ৮ তারিখের *নিউ রিপাবলিকে* মিশেল ওয়ালজার লিখেছিলেন "ইসলাম বিস্ফোরণ" আরও অনেক লেখার মতো এ দুটো নিবন্ধেরও উদ্দেশ্য হচ্ছে প্রায় ৪০টি জাতি ও (এশিয়া, আফ্রিকা, ইউরোপ, নর্থ আমেরিকা, চীন ও সোভিয়েত ইউনিয়নের বাসন্দা) ৮০ কোটি মুসলমানের বিচিত্র ইতিহাস, ভূগোল, সমাজ-কাঠামো ও সংস্কৃতি পাশ কাটিয়ে 'ইসলাম'কে যে একীভূতভাবে বুঝে ফেলা সম্ভব এবং তা যে অপরিবর্তনীয় একটা ব্যাপার, তার প্রমাণ দেয়া। শুধু তাই নয়, এরা—বিশেষ করে ওয়ালজার—প্রমাণ করতে চান যেখানেই ভয়ংকর খুনাখুনি, যুদ্ধ, দীর্ঘমেয়াদী সংঘর্ষ সেখানেই কোনো না কোনোভাবে "পরিষ্কার গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা আছে ইসলামের"। সাক্ষ্য-প্রমাণ উপস্থাপনের প্রচলিত নিয়ম এখানে মানা হয় না; এ ছাড়াও, লেখকরা তাদের আলোচ্য বিষয়ের মূল ভাষা ও সমাজগুলোকেও জানেন না; তেমনি যখনই "ইসলাম" আলোচিত হয় তখনই তাদের সাধারণ বোধবুদ্ধিও নিষ্ক্রিয় হয়ে থাকে—এ সকল ত্রুটি যেন ধর্তব্যের মধ্যে পড়ে না। *নিউ রিপাবলিক*-এর সম্পাদকীয়তে ইরানকে সঙ্কুচিত করে আনা হয় "রুদ্ধ ধর্মীয় আবেগ" ও "ইসলামী উন্মাদনায়", শরীয়াহ্ বা "পবিত্র ইসলামী আইন" গোয়েন্দাগিরি, নিজের আচরণ ইত্যাদি বিষয়ে কি বলে সে ব্যাপারে পণ্ডিতি কায়দায় আলোচনা চলে। এসকল কিছু একটা কথাকেই জোরদার করে যে, ইসলাম যদি আমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত হয় তা হলে যুদ্ধ করা উচিত চোখ খোলা রেখে।

ইসলামকে হেয় করার জন্য *নিউ রিপাবলিকের* কৌশলের তুলনায় আরো সূক্ষ্ম কায়দায়ও আছে। যেমন, কোনো বিশেষজ্ঞকে জনগণের মুখোমুখি করে তাকে দিয়ে বলিয়ে নেয়া যে, সত্যি বলতে খোমেনি ইরানের "মোল্লাদের প্রতিনিধিত্ব করেন না, (এ বক্তব্য মধ্যপ্রাচ্য ইনস্টিটিউটের সভাপতি, জর্ডানে যুক্তরাষ্ট্রের প্রাক্তন রাষ্ট্রদূত এবং লেবাননে এককালের বিশেষ দূত এল ডীন ব্রাউনের, নভেম্বরের ১৬ তারিখের ম্যাকনেইল/লেহরার রিপোর্টে এ কথা বলেন), লৌহমানব খোমেনি হলেন মধ্যযুগের (কাজেই আরো রক্ষণশীল) ইসলামে নিমজ্জিত"। তেহরানের মত্ত জনতা তাকে স্মরণ করিয়ে দেয় নুরেমবার্গের কথা; ঠিক যেমন রাস্তায় রাস্তায় অবিরাম বিক্ষোভ হচ্ছে বিনোদনের একটা বড় উপায় হিসেবে স্বৈরাচারী শাসকদের দ্বারা লালিত সার্কাসের প্রতীক।

আরেকটি কৌশল হলো অদৃশ্য সংযোগ রেখায় মধ্যপ্রাচ্যের বিভিন্ন বৈশিষ্ট্যসমূহকে ইরানী ইসলামের সাথে জড়ানো, অতপর একসাথে উভয়ের নিন্দা করা—আলোচ্য বিষয়ের চরিত্র অনুযায়ী সরাসরি বা ঘুরিয়ে ফিরিয়ে। প্রাক্তন সিনেটর অ্যাবরজ্যাক যখন তেহরান সফরে যান তখন সিবিএস ও এবিসি টেলিভিশনের ঘোষণায় মনে করিয়ে দেয়া হয় "অ্যাবরজ্যাক লেবানিজ বংশোদ্ভূত"। কিন্তু অনুল্লেখ থেকে যায় প্রতিনিধি জর্জ হ্যানসন ডেনিশ কিংবা রামসে ক্লার্কের ডব্লিউএএসপি উত্তরাধিকারের বিষয়টি। অ্যাবরজ্যাকের অতীতের ওপর অস্পষ্ট ইসলামী ছাপের উল্লেখও কোনোভাবে গুরুত্বপূর্ণ মনে হয়, যদিও তিনি লেবানীজ খ্রিস্টান বংশোদ্ভূত (এমন আরেকটা দৃষ্টান্ত হলো অ্যাবসক্যাম ঘটনায় ফাঁদ হিসেবে ভূয়া আরব "শেখদের" ব্যবহার)।

www.pathagar.com

এইসব বাজারগরম করা আন্দাজের সূচনা নভেম্বরের ৮ তারিখের *আটলান্টা কনস্টিটিউশন*-এ ড্যানিয়েল বি. দ্রুজের ছোটো একটি লেখায়। দূতাবাস দখলে পিএলও জড়িত ছিলো বলে অভিযোগ তুলেন দ্রুজ। তার তথ্যের উৎস "কূটনৈতিক এবং ইউরোপীয় গোয়েন্দা কর্তৃপক্ষ"। ডিসেম্বরের ৯ তারিখের *ওয়াশিংটন পোস্টে* জর্জ বল লেখেন "এমন বিশ্বাস করার সঙ্গত কারণ আছে যে পুরো অপারেশনটি অত্যন্ত প্রশিক্ষিত মার্ক্সিস্টদের কাজ"; ডিসেম্বরের ১০ তারিখে এনবিসি টেলিভিশনের *টুডে শো*-তে এমাস পারলেমুটার ও হাসি কারমেলের সাক্ষাৎকার প্রচারিত হয়। এদের পরিচয় প্রসঙ্গে বলা হয় প্রথমজন "একটি মার্কিন বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপক", দ্বিতীয়জন প্যারিসের *লা এক্সপ্রেসের* প্রতিনিধি। প্রকৃত তথ্য হচ্ছে দুজনই ইহুদি। রবার্ট অ্যাবারনেথি তাদের কাছে জানতে চান ঠিক কি কারণে তারা সন্দেহ করছেন যে, এ ঘটনায় সোভিয়েত ইউনিয়ন, পিএলও ও ইরানের "মৌলবাদী" মুসলমানের "স্বার্থ এক বিন্দুতে মিলেছে"; সত্যিই কি উল্লেখিত তিন দল দূতাবাস দখলে জড়িত? ওরা উত্তর করেন, না ঠিক তা না, কিন্তু তিন শক্তির স্বার্থই যে এখানে জড়িত তা সত্যি। অ্যাবারনেথি যখন ভদ্রভাবে মন্তব্য করেন তাদের বক্তব্যে মনে হচ্ছে এ সন্দেহ যেন "পিএলও'র ভাবমূর্তি ক্ষুন্ন করার ইসরাইলী চেষ্টা", তখন অধ্যাপক ভদ্রলোক রেগে গিয়ে প্রতিবাদ শুরু করেন এবং দাবী করেন তার বক্তব্যের ভিত্তি বুদ্ধিবৃত্তিক সততার চেয়ে কমকিছু নয়।

এই প্রতিযোগিতায় যাতে পিছিয়ে পড়তে না হয়, যেন সে জন্যই সিবিএস তাদের রাতের সংবাদে নিয়ে আসেন স্টেট ডিপার্টমেন্টের মারভিন কাবকে। কাবও সেই একমাস পূর্বে দ্রুজের উল্লেখিত (নামহীন) "কূটনৈতিক ও গোয়েন্দা" সূত্রের বরাত দিয়ে মন্তব্য করেন দূতাবাস দখলে সোভিয়েত ইউনিয়ন, ইসলামী মৌলবাদী ও পিএলও জড়িত। কাব জানান কম্পাউন্ডে মাইন পুঁতেছে পিএলও, তা বোঝা সম্ভব হয়েছে দূতাবাসের ভেতরে "আরবী শব্দ" শোনার ফলে। (কাবের পুরো গল্পটা ছাপা হয় পরের দিনের *লস এঞ্জেলেস টাইমসে)*। এরপর একই কথার পুনরাবৃত্তি করেন হাডসন ইনস্টিটিউটের চেয়ারম্যানের মতো গুরুত্বপূর্ণ পদের মানুষ কন্সটান্টিন মেনজেস, প্রথমে ১৫ই ডিসেম্বরের *নিউ রিপাবলিকে*, পরে ম্যাকনেইল/লেহরার রিপোর্টে আরও দুইবার। সোভিয়েত ইউনিয়নের শয়তানীর সাথে নারকীয় পিএলও ও দুর্জন মুসলমানদের জোটবাঁধার প্রসঙ্গ ছাড়া আর কোনো প্রমাণ দেয়া হয় না। (এখানে কারো মনে এমন প্রশ্ন জাগতে পারে যে, সোভিয়েত ইউনিয়নের আফগানিস্তান দখল এবং এ কারণে ইরান কর্তৃক সোভিয়েত ইউনিয়নের সমালোচনার ব্যাপারে মতামত জানানোর জন্য মেনজেসকে কেন দাওয়াত করেনি ম্যাকনেইল ও লেহরার)।

২৯শে নভেম্বরের *আটলান্টা জার্নাল-কনস্টিটিউশন*-এ ডানিয়েল বি. দ্রুজ লিখেন, "যেখানেই শিয়া সেখানেই সমস্যা"। তবে সে মাসের ১৮ তারিখের *নিউইয়র্ক টাইমস* কথাটাকে আরো বিচক্ষণতার সাথে উপস্থাপন করে ছোটো এই শিরোনামে: "শাহ্‌র প্রতি ক্রোধ এবং শিয়াদের অনুমোদন এ দুটো ব্যাপারই দূতাবাস দখলের ঘটনায়

www.pathagar.com

সম্পর্কিত"। নভেম্বরের ৪ তারিখে দূতাবাস দখল হওয়ার পরের এক সপ্তাহের মধ্যে দেখা যায় আয়াতুল্লাহ খোমেনির ভ্রূকটিকরা ছবি ঘন ঘন ও পরিবর্তনহীনভাবে প্রদর্শিত হতে থাকে; যেন উন্মত্ত, বিশালসংখ্যক ইরানী জনতার ছবির মধ্য দিয়ে প্রচার মাধ্যম যা বলতে চায়, এও তা-ই। ক্ষেপে ওঠা আমেরিকানদের দ্বারা ইরানী পতাকা পোড়ানো (ও কেনা) নিয়মিত দৃশ্যে পরিণত হয়; এ ধরনের দেশপ্রেম সম্পর্কে প্রচার মাধ্যম রিপোর্ট করে অতীব বিশ্বস্ততার সাথে। নিয়মিত সংবাদ থাকে ইরানী ও আরবদের মধ্যে আমজনতা পর্যায়ের পারস্পরিক সন্দেহ নিয়েও। যেমন নভেম্বরের ১০ তারিখের *বোস্টন গ্লোব-এ* দেখা যায় ক্রুদ্ধ জনতা চিৎকার করছে, "আরবরা, নিজের দেশে যাও"! শিয়াদের সম্পর্কে বিশেষ প্রতিবেদনে সয়লাব হয়ে যায় চারদিক। অথচ আধুনিক ইরানের ইতিহাস অথবা উনিশ শতকের শেষ থেকে বিদেশী হস্তক্ষেপ ও রাজকীয় শাসনের বিরুদ্ধে এককভাবে ইরানী মোল্লারা কত গুরুত্বপূর্ণ প্রতিরোধ গড়ে তুলেছিলো, কিংবা কিছু রেডিও ক্যাসেট ও নিরস্ত্র জনতাকে সম্বল করে কিভাবে খোমেনি শাহ ও তার অপরাজেয় সেনাবাহিনীর পতন ঘটান—এই সব বিষয় ক্বচিৎ কিছু লেখা হয়।

ওল্টার কন্‌ক্রাইট যে নামগুলোও ঠিকমতো উচ্চারণ করতে পারেন না এর মনে হয় একটা প্রতীকী গুরুত্ব আছে। প্রতিবারই ঘোতবজাদেহ নামটা বলা হয়েছে "গাবুজাদেহ"র কাছাকাছি কিছু একটা (২৮শে নভেম্বর সিবিএস টেলিভিশনে "বেহেশতি"কে বলা হয় "বশতি"; এবিসির কথাও উল্লেখ করা দরকার : ডিসেম্বরের ৭ তারিখে ওরা মনতাজারিকে বলে "মন্টেসরি"। ইসলামের ইতিহাসের ওপর প্রস্তুত প্রায় প্রতিটি ক্যাপসুল (সদৃশ অনুষ্ঠান) এত সন্দেহপূর্ণ যে, হয় বোধবুদ্ধিহীন অথবা ভয়াবহ লাগে। যেমন নভেম্বরের ২১ তারিখের সিবিএস *নাইটলি শো*তে র‍্যান্ডি ড্যানিয়েল বলেন মহরমের সময় শিয়ারা "বিশ্বের প্রতি মোহম্মদের চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দেয়ার" স্মৃতি উদযাপন করে; মন্তব্যটি এত বড় ভুল যে, খুবই বাজে মনে হয়। মহরম হলো একটি ইসলামী মাস; এর প্রথম দশ দিন ধরে শিয়ারা হোসেনের শাহাদাত বরণের ঘটনার স্মৃতিতে শোক করে; পরে আমাদের বলা হয় হত্যাকাণ্ডের প্রতি শিয়াদের একটা মানসিক আগ্রহ আছে, কাজেই "অবাক হওয়ার কিছু নাই যে, ওরা একজন খোমেনি সৃষ্টি করেছে"। খোমেনি সামগ্রিক ইসলামের প্রতিনিধিত্ব করেন না—এমন বলার অর্থ ঐ ব্যাপারটাকেই নিশ্চিত করা; তেমনি এ বক্তব্য ভুল ধারণাও দেয় আমাদেরকে। একই অনুষ্ঠানে আমার সাক্ষাৎকারও নেয়া হয়, আমার জ্ঞানের জন্য; ওতে ভুলভাবে বলা হয় আমি ইসলামী অধ্যয়ন বিষয়ের অধ্যাপক। নভেম্বরের ২৭ তারিখে সিবিএস-এর একজন রিপোর্টার আমাদের জানান এখন "বিপ্লবোত্তর হ্যাঙওভার-এ" ভুগছে গোটা ইরান; কথার ধরন দেখে মনে হয় ইরান বুঝি বদ্ধ মাতাল একটা মানবীয় অস্তিত্ব।

তবে বনেদী *নিউইয়র্ক টাইমস* তার কর্তৃত্বের পুরোটা নিয়ে ইসলামের ওপর প্রভাব বিস্তার করার পরই কেবল "আমেরিকান জিম্মি" কথাটির মধ্যে জড়ো হওয়া শক্তির

www.pathagar.com

হতাশাব্যঞ্জক দিকটা সামনে চলে আসে। *টাইমস* আসলে যা তার সাথেই *টাইমস* -এর "ইসলাম" বেশি সম্পর্কিত। *টাইমস* কেবল আমেরিকার নেতৃস্থানীয় পত্রিকাই নয়, এর গোঁড়া চরিত্র, দক্ষ রিপোর্টিং, দায়িত্ববোধ, সর্বোপরি জাতীয় নিরাপত্তার দৃষ্টিকোণ থেকে বিশ্বাসযোগ্যতার সাথে লেখার ক্ষমতা—এইসব মিলিয়ে একে এনে দিয়েছে আলাদা গুরুত্বের অনন্য শক্তি। এর অর্থ হলো, কোনো একটা বিষয়ে কর্তৃত্বের সাথে বলতে পারে *টাইমস*, আবার সেই বিষয়টিকে প্রাসঙ্গিক করে তুলতে পারে গোটা জাতির কাছে; এবং তা করে স্বেচ্ছায়, সফলভাবে। যেমন হ্যালিসন স্যালিসবারি আমাদের মনে করিয়ে দিতে পারেন ১৯৬১ সালের বসন্তে *টাইমসের* টার্নার ক্যাটলেজের সাথে সাক্ষাৎকারে প্রেসিডেন্ট কেনেডি বলেছিলেন এ পত্রিকাটি যদি আসন্ন 'বে অব পিগ' দখলাভিযান সম্পর্কে আরো খুঁটিনাটি রিপোর্ট ছাপতো তা হলে, "আপনারা আমাদেরকে বড় রকম একটা ভুল থেকে বাঁচিয়ে দিতে পারতেন।"[১] স্যালিসবারি বলেন, বে অব পিগ-এর পর, *টাইমস* বা 'বিশ্ব' কেউ-ই বুঝেনি ট্যাড সুজালকের রিপোর্ট অসাধারণ কোনো ব্যাপার নয়, তাই *টাইমসের* অর্জনও অসাধারণ নয়; এ কেবল নিয়মিত দায়িত্বের অংশ। *টাইমস* পরিণত হয়েছে এক অসাধারণ শক্তিশালী প্রতিষ্ঠানে, কাজ করছে এমন এক ক্ষমতা হিসেবে যা জাতির সমবয়সী :

> এখন *টাইমস* পৌঁছে গেছে সমালোচনামুখি জনতার কাছাকাছি। জনতা অর্থ বিপুল সংখ্যক পাঠক ও বিজ্ঞাপনদাতা নয়, যদিও এর সাথে সম্পর্ক আছে, তেমনি বিপুলসংখ্যক রিপোর্টিং ও দক্ষতার হিসেবও নয়। এ পত্রিকা এখন গোটা পৃথিবী কাভার করে নিজস্ব নারী-পুরুষদের দ্বারা, যারা মোটেও পর্যটক রিপোর্টার নয়। এরা হলো সম্ভাব্য সবচেয়ে ভালো রিপোর্টার ও সম্পাদকের দল। এরা আর্থিক সুবিধার জন্য *টাইমস*-এ এসে জড়ো হয়নি; এর বেতন স্কেল ভালো, কিন্তু নজরকাড়ার না। এদের জড়ো হওয়ার কারণ প্রতিবেদন তৈরি এবং সম্পাদনার একটা দৃষ্টান্তহীন সুযোগ করে রেখেছে *টাইমস*। পেশাজীবীতার এমন উন্নত মান আর কোথাও অর্জিত হয়নি। রিপোর্টারদের সংখ্যা ও দক্ষতা এখন (বে অব পিগের পর) এমন পর্যায়ে পৌঁছেছে যে, ওরা এখন কাজ করতে পারে সচেতন নির্দেশনা ছাড়াই। সারা পৃথিবীতে ছড়িয়ে আছে *টাইমসের* লোকজন, সংবাদ গ্রাহক এন্টেনার মত কাজ করছে, ঘটনার ভেতরে প্রবেশ করছে, খুঁজে দেখছে, প্রয়োজনের সময় প্রশ্নও করছে।[২]

এভাবে পত্রিকাটির নিয়ামক লক্ষ্য হয়ে উঠে নিয়ন্ত্রক ক্ষমতা অর্জন, এবং রিপোর্টাররা কাজ করে "সচেতন নির্দেশনা ছাড়াই", বলা যায় অভ্যাসবশত। ১৯৭১ সালে *টাইমস* পেন্টাগন পেপারস প্রকাশ করতে শুরু করে। এরও আগে এ পত্রিকা প্রাসঙ্গিক সরকারী দলিলপত্র প্রকাশ করে দিয়ে টামানি হলে ক্ষমতাচ্যুত করেছিলো বস ট্রুইড ক্লিককে। মাঝখানে একশ' বছর পার হয়ে গেছে। স্যালিসবারির মতে এখানেও দেখা যাচ্ছে এ পত্রিকা জাতীয় স্বার্থে কাজ করে এর অসাধারণ নৈতিক ভবিষ্যৎ-বিশ্লেষণের সাহায্যে

www.pathagar.com

মাড়িয়ে যাচ্ছে আইনের সীমানা।[৩] দেখিয়ে দিচ্ছে সত্য প্রকাশের ও সরকারকে নাড়িয়ে দেয়ার ক্ষমতা। *টাইমসের* অতি-সাম্প্রতিক ব্যবস্থাপনা সম্পাদক এম. এম. রোজেনথালের পরিচালনায় এর আর্থিক সাফল্য যে দৈনিক সংস্করণের "হোম", "লিভিং" ইত্যাদি বিভাগের বিভিন্ন নিবন্ধের ফল তা সত্যি; তবে বাড়তি আয় বাড়িয়ে দিয়েছে বিদেশ সম্পর্কে রিপোর্ট করার ক্ষমতা :

> বার্তা বিভাগ এ পত্রিকাটিকে এমন এক শক্ত আর্থিক ভিত্তি দিয়েছে যে, এটি এখন আক্রমণেরও উর্ধ্বে; এবং তা সম্ভব হয়েছে এমন এক সময় যখন *নিউজ* ও *পোস্ট* নানাভাবে নাকানি চোবানি খাচ্ছে। *টাইমস* এখন ইরানের ঘটনা কাভার করার জন্য বেতন ও কর্মচারীদের হিসাব আলাদা রেখেই মাসে তিরিশ থেকে পঞ্চাশ হাজার ডলার খরচ করার ক্ষমতা রাখে এবং খরচ করেও; টাকা মজুদ আছে, এ নিয়ে বাড়তি কোনো চাপ নেই। এ অবস্থার সাথে দেশের অন্য কোনো পত্রিকার তুলনা নাই।[৪]

যে বছর ইরানের "পতন" হয় তার শেষ দিকে *টাইমস* অবশেষে ইসলামের দিকে মুখ করে দাঁড়ায়। ডিসেম্বরের ১১ তারিখে পুরা দুটি পৃষ্ঠা ব্যবহার করা হয় "দি এক্সপ্লোশন ইন দি মোসলেম ওয়ার্ল্ড" শীর্ষক সিমপোজিয়ামের জন্য। সাতজন অংশগ্রহণকারীর তিনজন মুসলিম বিশ্বের মানুষ, এখন যুক্তরাষ্ট্রে কাজ করেন। অন্যরা ইসলামের আধুনিক ইতিহাস, সমাজ ও সংস্কৃতি ক্ষেত্রে বিশেষজ্ঞ হিসেবে খ্যাতিমান। ওদেরকে জিজ্ঞাসা করা প্রতিটি প্রশ্ন ছিলো রাজনৈতিক; ওগুলো কোনো না কোনোভাবে ছুঁয়ে গেছে মার্কিন স্বার্থের প্রতি ইসলামের হুমকির প্রসঙ্গটি। এলোমেলো ভাবে যে-সব আলোচনা করেছেন বিশেষজ্ঞরা, তাতে মনে হয় ইসলামের রয়েছে ভিন্ন অতীত, ভিন্ন রাজনৈতিক প্রক্রিয়া, অন্যরকম মুসলমান। কিন্তু তাদের এই প্রয়াস চাপা পড়ে যায় এ জাতীয় প্রশ্নের জোরে: "যদি মুসলমানরা আমাদেরকে শয়তানের বংশধরই মনে করে তাহলে যেসব দেশের সাথে আমাদের সম্পর্ক আছে বলে মনে করি, সেসব দেশের নেতৃবৃন্দ, বিভিন্ন শক্তি ও সরকারের সাথে আমাদের আচরণ কেমন হবে"? বাজেরগান ব্রেজেনস্কির সাথে হাত মিলালেন। এবং শেষ হয়ে গেলেন। বনি সদর বললেন তিনি নিউইয়র্কে আসতে চান; এ একটা কথাই ধ্বংস করলো তাকে। অন্য সরকারগুলোর সাথে আমাদের সম্পর্ক কি হবে সে বিষয়ে কি শিক্ষণীয় কিছু আছে এতে? এখানে কি সংযত হওয়ার ইঙ্গিত আছে, কিংবা আর কিছুর?

টাইমস নিঃসন্দেহে বুঝতে পারছিলো সঠিক উৎসের দিকেই যাচ্ছে সে : যদি মুসলমানরা ইসলামের দ্বারা শাসিত হয়ে থাকে তবে সরাসরি প্রশ্ন করতে হবে ইসলামকেই। মজার ব্যাপার হচ্ছে পণ্ডিতেরা যেখানে ইসলামকে বিভিন্ন উপাদানে বিভক্ত করার চেষ্টা করেন, *টাইমস* সেখানে এসব উপাদানকে মাপে ক্ষমতার একক দিয়ে : আমেরিকার স্বার্থের প্রশ্নে হয় "বন্ধুভাবাপন্ন" না হয় "শত্রু"। সিমপোজিয়ামের নীট ফলাফল খুবই হতাশাব্যঞ্জক। *টাইমসের* শেষ কিস্তির প্রশ্নেই পরিষ্কার হয়ে যায় যে, যুক্তি ও দরবার-কারবারে কাজ হবে না, কাজেই শেষ উপায় হতে পারে শক্তি প্রয়োগ।

www.pathagar.com

১৯৭৯ সালের শেষ চারদিনে ফ্লোরা লুইসের চারটি ধারাবাহিক লেখা প্রকাশ করে *টাইমস* ("আপসার্জ ইন ইসলাম", ২৮, ২৯, ৩০ ও ৩১শে ডিসেম্বর)। ইসলামকে "আমরা" কিভাবে দেখবো সে ব্যাপারে যাবতীয় সন্দেহ পরিষ্কার করে ফেলা হয় ঐ চার নিবন্ধে। ইসলাম নিয়ে সিরিয়াস চিন্তাভাবনার ছাপ আছে লেখাগুলোয়। তার লেখার কিছু চমৎকার দিক আছে : যেমন, বিষয়টির জটিলতা ও বৈচিত্র্য সুন্দরভাবে চিহ্নিত করতে সক্ষম হয়েছেন তিনি। মারাত্মক কিছু দুর্বলতাও রয়ে গেছে। এগুলোর বেশিরভাগই চোখে পড়ে ইসলাম সম্পর্কে প্রচলিত সাম্প্রতিক মতামতেও। মধ্যপ্রাচ্যে ইসলামকে একেবারেই বিচ্ছিন্ন করে দেখেন লুইস (তাই ইহুদিবাদ এবং মিশরীয় ও লেবানীজ খ্রিস্টানদের উত্থান সম্পর্কে প্রায় কিছুই বলেন না)। তৃতীয় নিবন্ধে আরবী ভাষা সম্পর্কে মন্তব্য করেন তিনি (বিশেষজ্ঞের মত উদ্ধৃত করে লিখেন আরবী কবিতা "বাগাড়ম্বরপূর্ণ, অতিনাটুকে, অন্তরঙ্গতাহীন, ব্যক্তিক অনুভূতি-ঘনিষ্ট নয়) এবং ইসলামী মন সম্পর্কে ভাষ্য প্রদান করেন (পর্যায়ক্রমিক চিন্তায় অভ্যস্ত নয় ইসলামী মন)। অন্য কোনো ভাষা, ধর্ম বা জাতিগত মানবগোষ্ঠী সম্পর্কে এ ধরনের মন্তব্য নিসন্দেহে বর্ণবাদী অথবা বোধবুদ্ধিহীন কথা বলে বিবেচিত হতো। একযুগ পর ক্রিস হেজেসের নিবন্ধ "এ ল্যাঙ্গুয়েজ ডিভাইডেড এগেইনস্ট ইটসেলফ" প্রকাশিত হয় এই *টাইমসেই*। নিবন্ধটি দেখানোর চেষ্টা করে যে, ঘৃণার ভাষা ও সরলপন্থী ফর্মুলা ও ধর্মীয় উত্তেজনা সৃষ্টির জন্য মৌলবাদীরা কিভাবে আরবী ভাষার বাড়তি সুবিধাগুলো ব্যবহার করে; অথচ তার আগেই এ ভাষা জাতীয়তাবাদের দ্বারা একদফা দূষিত হয়েছে। তিনি এই বলে সিদ্ধান্ত টানেন "রাজনৈতিক সংলাপকে অশিষ্ট করে তোলার কারণে খুব কম আরব ব্যক্তিত্বই পরস্পর আলোচনা করতে পারেন"।

লুইস এমন সব প্রাচ্যতাত্ত্বিকদের উদ্ধৃত করেন যারা নিজ নিজ সামগ্রিক মতামতের জন্য এরই মধ্যে পরিচিত হয়ে উঠেছেন। যেমন এলি খেদৌরি: ইনি মার্কসবাদ-লেনিনবাদের সাথে সাদৃশ্য দেখানোর জন্য ইসলামী বিপ্লব নিয়ে গবেষণা করেন ১৯৭৯ সালে।[৫] লুইস তাকে উদ্ধৃত করে লিখেন যে, "খেদৌরি বলেন, প্রাচ্যের বিশৃঙ্খলা গভীর ও সর্বব্যাপী"; বার্নার্ড লুইস (ফ্লোরা লুইসের সাথে সম্পর্কিত নয়) মন্তব্য করেন যে, সম্ভবত ধর্ম হিসেবে ইসলামের "নিশ্চল", তেমনি "নিয়তিবাদী, আনুষ্ঠানিক ও কর্তৃত্বপরায়ণ" স্বভাবের কারণে মুসলিম বিশ্বে "স্বাধীন ভবিষ্যৎবাণী ও গবেষণার অবসান ঘটেছে"। প্রবীণ প্রাচ্যতাত্ত্বিক হিসেবে নিজ কর্তৃত্ব ও মর্যাদা ব্যবহার করে বার্নার্ড লুইস ইসলামের ওপর অবিরাম উদ্দেশ্যপূর্ণ ও সামগ্রিক আক্রমণ চালিয়ে যান ১৯৮০ ও ৯০-এর দশক জুড়ে। ফ্লোরা লুইস (বা বার্নার্ড লুইস) পড়ে কেউ যে ইসলাম সম্পর্কে সামগ্রিক ধারণা অর্জন করবেন এমন আশায় গুড়ে বালি। নিজের লেখার বিষয়ের সাথেই ফ্লোরা লুইস তেমন পরিচিত নন; তেমনি অতি দ্রুত বিভিন্ন জনকে উল্লেখ করার প্রবণতা আছে তার। এসব কারণে ইসলাম বিষয়ে নয়া পাঠকদের মনে হবে তারা বুঝি পরভোজী প্রাণীর মতো এদিক-সেদিক পরিত্যক্ত জিনিষ ঠুকরে খাচ্ছেন। কিভাবে কোনো পাঠক বহুকোটি মানুষকে সম্পর্কে সামগ্রিক উপলব্ধি অর্জন করবেন, যাদের ভাষা, "বাস্তবের বর্ণনা নয়,

www.pathagar.com

কামনার অভিব্যক্তি মাত্র"? (এর সাথে তুলনা করুন নভেম্বরের ১৯ তারিখের *আটলান্টিক কনস্টিটিউশনের* মন্তব্য; "ফারসী ভাষার সূক্ষ্ম ও বিভ্রমসৃজক প্রকৃতি")। যাইহোক, ইসলাম সম্পর্কে চূড়ান্ত বক্তব্য দেয়া হয়ে যায়: এমনকি যদিও "তা" (ইসলাম) পরিষ্কার নয়, কিন্তু তার প্রতি আমাদের মনোভাব (কিংবা এতে যে-মনোভাব জড়িয়ে দেয়ার অধিকার আছে আমাদের, তা) পরিষ্কার।

১৯৮০ সালের মে মাসে *ইস্কোয়ারে* প্রদত্ত এক সাক্ষাৎকারে অনিচ্ছাকৃতভাবে উন্মোচক কিছু কথা বলে ফেলেন ফ্লোরা লুইস। ওখানে তিনি তার পূর্ব-আন্দাজগুলো বর্ণনা করেন, যার মধ্য থেকে গজানো কাজই হলো পূর্বোক্ত চারটি নিবন্ধ। জোড়াতালি মার্কা রিপোর্টিং ও এলোমেলো কায়দা ইঙ্গিত করে এই দিয়েই চলে যেতে পারে *টাইমস*। কারণ ইসলাম হলো ইসলাম, কিন্তু *টাইমস* হচ্ছে *দি টাইমস*। তিনি যা বলেন তা এই (লক্ষ্য করুন "কেউ জানে না ইসলামের ভেতরে হচ্ছেটা কি" কথাটার মধ্যে কেমন একটা হেলাফেলার ভাব):

> যেমন কয়েক মাস আগে আমি এমন একটা প্রকল্পে জড়িত ছিলাম যার ব্যাপ্তি সত্যিই বিস্ময়কর। ইসলামী বিশ্বে জেগে ওঠা উত্তেজনা বিষয়ে এই বিশেষ দায়িত্বটা মাত্র দেয়া হয়েছে আমাকে। নিউইয়র্কে একটা মিটিং করে ওরা। কেউ একজন বলে ওঠে "হায় যিশু! কেউ জানে না ইসলামের ভেতরে হচ্ছেটা কি। আমরা বরং ফ্লোরাকেই পাঠাই।" তো ওরা আমাকে ডাকে এবং আমি যাই। এ আসলে কিছুটা পাগলামীই; এমনকি জড়ো করা জিনিষগুলো কিভাবে কাজে লাগাবো সে বিষয়েও নিশ্চিত ছিলাম না।
>
> পাগলের মত সব জোগাড়যন্ত্র করতে হলো, যাতে লোকজনের সঙ্গে দেখার করার ব্যাপারে আগেই নিশ্চিত হতে পারি। কোথাও যাওয়ারও সময় নেই, টানা তিনদিন বসতে হলো।
>
> প্যারিসে ও লন্ডনে থেমে কায়রোয় গেলাম। কারণ ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়টা ওখানেই আছে; আলজিয়ার্স ও তিউনিসেও গেলাম। ফিরে এলাম বিশটা নোটবই আর পাউন্ড দশেক ওজনের কাগজপত্র নিয়ে। অতপর লিখতে বসে গেলাম।
>
> এর ফলে সুবিধাও হয়েছে, কিছু জানতে পেরেছি আমি। Formation Permanentes (চিরকালীন ছাত্রত্ব) নিয়ে কথা বলুন, *নিউইয়র্ক টাইমস* একের পর এক বৃত্তি দিয়ে দেবে আপনাকে।
>
> যখন সবকিছু এক সাথেও করতে পারছি না সময়-স্বল্পতার চাপে, তখন আবার গোটা রিপোর্টটা নিজের হাতে করার ব্যতিক্রম। যেমন ইসলাম প্রকল্পে আমার দরকার ছিলো ফিলিপাইনের ওপর বিস্তৃত তথ্য-উপাত্ত। এদিকে অবস্থা এমন যে, এশিয়া বুরোও এ কাজে কাউকে ছাড়তে পারছে না; ওরা কম্বোডিয়ার যুদ্ধ, দক্ষিণ কোরিয়ার সমস্যা আর জাপানের রাজনৈতিক সঙ্কট নিয়ে ব্যস্ত। কাজেই আমার জন্য নিউইয়র্কের বাইরে যাওয়ার একটা প্যাকেজের ব্যবস্থা করতো হতো কাউকে।

www.pathagar.com

ইসলাম সম্পর্কে *নিউইয়র্ক টাইমসের* প্রতিবেদন ও *লো মঁদের* প্রতিবেদনের মধ্যে আলোকদায়ী তুলনামূলক আলোচনা করা যায়। *টাইমস* অতি দ্রুততার সাথে তার ব্যবস্থা করে ফেলে ফ্লোরা লুইসকে দিয়ে; ইসলামী বিশ্বের সর্বত্র চলমান ধর্মতাত্ত্বিক ও নৈতিক ভিত্তি সম্পর্কে কিছুই বলেন না তিনি (*ইজতিহাদ* অর্থাৎ ব্যক্তি-নির্ভর তাফসীর ও *তাকলীদ* অর্থাৎ কোরআন নির্ভর তাফসীরের ধরনে পণ্ডিতি কর্তৃত্বের তাফসীরের অনুসারীদের মধ্যে চলমান দ্বন্দ্ব বিষয়ে একবারও উল্লেখ না করে আজকের জামানায় কি করে ইসলাম বিষয়ক আলোচনা সম্ভব?) তেমনি, যে-উত্তেজনা নিয়ে তার প্রতিবেদন তার পেছনে সক্রিয় বিভিন্ন ইসলামী মতবাদের ইতিহাস ও গঠন নিয়ে কিছুই বলেন না। এমনকি, ইসলাম কি করে দরিদ্র ও উন্মূলদের আশ্রয়ে পরিণত হলো সে বিষয়েও কোনো কথা নাই। বরং তিনি নির্ভর করেন বিচিত্র জনের রচনা থেকে এলোমেলোভাবে বাছাইকৃত উদ্ধৃতির ওপর। বিশ্লেষণের জন্য ব্যবহার করেন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র উপকাহিনী; ইসলামী জীবন বাস্তবে কেমন—মতবাদ-শাসিত, আধ্যাত্মিক, রাজনৈতিক কিংবা অর্থনৈতিক জীবন কি না সে বিষয়ে রিপোর্ট একেবারেই কম।

এখানে বনেদী মার্কিন পত্রিকার সাথে বনেদী ফরাসি পত্রিকার তুলনা কাজে লাগবে। ঠিক এক বছর আগে (১৯৭৮ সালের ৬. ৭ ও ৮ই ডিসেম্বর) *লো মঁদ* একই বিষয়ে লেখার জন্য নিয়োগ করে (লুইসও যাকে উদ্ধৃত করেন, সেই গুরুত্বপূর্ণ ফরাসি প্রাচ্যতাত্ত্বিক) ম্যাক্সিম রডিনসনকে।[৬] এর চেয়ে বেশি পার্থক্য আর হতে পারে না। বিষয়টি রডিনসনের পুরোপুরি আয়ত্তে। তিনি ভাষাটা জানেন, ঐ ধর্ম ও রাজনীতিটা বোঝেন। তার লেখায় উপকাহিনী নেই, স্পর্শকাতর উদ্ধৃতি নেই। ইসলামমুখি ও ইসলাম-বিরোধী বিশেষজ্ঞদের ওপর নির্ভরশীলতার "ভারসাম্য" রক্ষার চেষ্টা নেই। তিনি বলার চেষ্টা করেছেন বর্তমান সঙ্কট সৃষ্টিতে ইসলামী সমাজ ও ইতিহাসের কোন কোন শক্তি চলমান রাজনৈতিক বিন্যাসের সাথে সহযোগিতা করেছে। ফলে তার লেখায় ওঠে আসে সাম্রাজ্যবাদ, শ্রেণীসংঘাত, ধর্মীয় বিরোধ ও সামাজিক নৈতিকতার সংসক্ত অভিজ্ঞতার বোধ; তা কেবল সন্দেহ-আক্রান্ত, সন্ত্রস্ত পাঠকের স্বার্থে কতিপয় মনোভাব প্রদর্শন নয়।

www.pathagar.com

হারানো ইরান!

ইরান সম্পর্কে যে-সব বানোয়াট, লাগামহীন কথাবার্তার প্রতিবেদন প্রচারিত হয়েছে সেগুলোয় সিক্ত যে-কেউ রেহাই পাওয়া এবং প্রকৃত অন্তর্দৃষ্টি লাভের আশায় নজর ফেরাতে পারেন পিবিএস-এর রাতের অনুষ্ঠান *ম্যাকনেইল/লেহরার রিপোর্টের* দিকে। মুদ্রণ সাংবাদিকতায় *নিউ ইয়র্ক টাইমস* যেমন, তেমনি সম্প্রচার সাংবাদিকতায় *রিপোর্ট* বনেদী অনুষ্ঠানরূপে পরিচিত। এই ম্যাকনেইল/লেহরার রিপোর্ট আমার কাছে কখনো সন্তোষজনক লাগে নাই। অনুষ্ঠানটির রক্ষণশীল বিন্যাস আর আলোচক ও আলোচ্য সূচি বাছাইয়ের বিশেষ ধরনের কারণে। প্রথমে ধরা যাক সাজ-বিন্যাসের কথা। ইরানের মত একটি অপরিচিত দেশ সম্পর্কে নতুন ধরনের একটি প্রতিবেদন দেখার সময় দর্শকরা অনেকটা বাধ্য হয়েই ঐ দেশের "উন্মত্ত জনতা" আর সাবধানে বেছে আনা, পরিপাটি পোষাকে সজ্জিত আলোচকদের মধ্যে বিরাট ফারাক অনুভব করবে। বিশেষজ্ঞতাই হলো এইসব আলোচকের যোগ্যতা, অন্তর্দৃষ্টি বা উপলব্ধির ক্ষমতা নয়। অনুষ্ঠানটি দেখলে মনে হয় তা পরিস্থিতি বোঝার চেষ্টা করে যুক্তির আলোকে; এতে দোষের কিছু নাই। কিন্তু আলোচকদের কাছে যেসব প্রশ্ন করা হয় তাতে মনে হয় ম্যাকনেইল ও লেহরার বুঝি চলমান জাতীয় মনোভাবের সমর্থন খুঁজে বেড়াচ্ছেন। সেই মনোভাবে আছে ইরানের প্রতি প্রচণ্ড রাগ, ইরান নিয়ে ইতিহাস-বিচ্ছিন্ন বিশ্লেষণ, স্নায়ুযুদ্ধোত্তর বা সঙ্কট মোকাবিলার ধরনের সাথে তালমিলানোর মত আলোচনার চেষ্টা। এর চমৎকার উন্মোচক দৃষ্টান্ত ২৮শে ডিসেম্বর ও ৪ঠা জানুয়ারীর অনুষ্ঠান। ওখানে তেহরান-ফেরত একদল যাজককে আমন্ত্রণ জানানো হয়। যাজকরা বলেন পঁচিশ বছর ধরে শাহ্‌র স্বৈরাচারী শাসনে নিপীড়িত ইরানী জনগণের অনুভূতির প্রতি তারা সহানুভূতিশীল। লেহরার তাদের মন্তব্যে খোলাখুলিভাবেই সন্দেহ প্রকাশ করেন। (নভেম্বরের ২৩ ও ২৯ তারিখে) তৎকালীন ইরানী পররাষ্ট্রমন্ত্রী বনি-সদর ও তার উত্তরসূরী সাদেগ ঘোতবজাদেহ্‌র সাক্ষাৎকারের সময় প্রশ্নের ধরন পাল্টে গিয়ে একেবারে যুক্তরাষ্ট্রের সরকারী লাইনের কাছ ঘেঁষে দাঁড়ায়। যেমন, জিম্মিদের কবে মুক্তি দেয়া হবে; কিন্তু শাহ্‌র অপকর্ম তদন্ত করা বা তাকে ফিরিয়ে দেয়ার ব্যাপারে কোনো কথা নাই। শ্লেষাত্মক ব্যাপার হচ্ছে এই প্রথমবারের মত শাহ্‌কে ফিরিয়ে দেয়ার দাবীর ওপর তেমন জোর দেন না বনি-সদর। বরং সঙ্কট শেষ করার একটা সমাধানসূত্র প্রস্তাব করেন যা সূচিত হবে জাতিসংঘ কমিশনের দ্বারা; এই কমিশন ইরানে যায় বেশ কয়েক মাস পরে। আর স্বভাব অনুযায়ী, অনুষ্ঠানে বনি-সদরের প্রস্তাবের প্রসঙ্গটি এড়িয়ে যান ম্যাকনেইল ও লেহরার।

www.pathagar.com

১৯৭৯ সালের নভেম্বরের ১০ তারিখ থেকে ১৯৮০ সালের জানুয়ারীর মাঝামাঝি পর্যন্ত অনুষ্ঠানে দাওয়াতী আলোচকদের ফর্দটার বিশেষ কোনো বৈশিষ্ট্য নাই : ইরানীদের আনা হয় পাঁচবার, যুদ্ধ-বিরোধী মতামতের প্রকাশ্য সমর্থক একবাল আহমেদ ও রিচার্ড ফককে একবার করে; আলোচকদের আর সকলেই পত্রিকার লোক, সরকারী কর্মকর্তা, মধ্যপ্রাচ্য বিশেষজ্ঞ; ইরানী বিপ্লবের বিরোধিতার কারণে এদের সবাই সুপরিচিত। একই রকম ভারসাম্যহীনতা দেখা যায় ১৯৯০ সালের উপসাগরীয় সঙ্কটের সময়। নির্দিষ্ট কিছু লোককে যেভাবে বারবার দাওয়াত করা হয় তাতে সন্দেহেরও জায়গা থাকে না। হাডসন বিশ্ববিদ্যালয়ের মেনজেসকে দুইবার, আফগানিস্তানে প্রাক্তন মার্কিন রাষ্ট্রদূত রবার্ট নিউম্যান ও এল ডীন ব্রাউনের প্রত্যেককে দুইবার করে। ফলাফল হচ্ছে ইরান যা করেছে এবং বলেছে তার সবকিছুই নৈতিকতার বাইরে ঠেলে দেয়া হয়। অবস্থা আমাদের ক্ষোভের আগুনে ঘি ঢালে বটে, কিন্তু খবরগুলো বুঝতে সাহায্য করে না। আমি খুব অবাক হই যে, ম্যাকনেইল বা লেহরার দুজনের কেউ বুঝতে চেষ্টাও করলেন না বনি সদরের কথাটা আসলে কি। যেমন যখন বনি-সদর বললেন "জগতের নিপীড়িতরা" এবং মন্তব্য করলেন যে, ওদের দাবী মিটানোর ব্যাপারটি শাহ্‌কে ফিরিয়ে দেয়ার দাবীর ওপর জোর দেয় না (অর্থাৎ বিষয়টি অত সরল নয় যে, যুক্তরাষ্ট্র শাহ্‌র ওপর থেকে সমর্থন প্রত্যাহার করে নিলেই হলো), বরং চায় যুক্তরাষ্ট্র স্বীকার করুক জগতের নিপীড়িত মানুষদেরও যন্ত্রণা ও যথার্থ অভিযোগের বৈধ কারণ থাকতে পারে।

অতএব ম্যাকনেইল/লেহরার রিপোর্টের তদন্তের ধরন দেখেই মনে হয় ওরা যেন ইচ্ছামত বাছাই করছেন, মানব জীবনের অভিজ্ঞতার বড় জায়গাগুলো এড়িয়ে চলছেন, যা বিরোধীপক্ষ বা কথকদের কাছে গুরুত্বপূর্ণ মনে হবে। নিবিড়ভাবে সংগঠিত দাওয়াতী আলোচকরা টেবিলের চারদিক ঘিরে বসে আছেন, আর তাদের ওপর মাতবরী করছেন এক জোড়া আমন্ত্রক, দৃষ্টিকোণ সামগ্রিকভাবে ভারসাম্যপূর্ণ। এই অবস্থার মধ্যে আলোচকরা দূরের অঞ্চলের সেই সব মানুষদের অন্যরকম কথাটা ঠিকমতো উপস্থাপন করতে পারেন না, যাদের জীবনে পঁচিশ বছর ধরে চলেছে মার্কিন অথবা স্থানীয় স্বৈর-শাসনের হস্তক্ষেপ। সঙ্কট মোকাবিলার প্রশ্নটিই সবসময় বড় হয়ে দেখা দেয়; অ-শ্বেতাঙ্গ ও অ-ইউরোপীয় পৃথিবীর সবখানে যে নতুন পরিসর খুলে যাচ্ছে সে ব্যাপারটা বোঝার কোনো চেষ্টাই নাই। ভূ-রাজনীতি, গোষ্ঠীগত অস্থিরতা, ইসলামী পুনরুজ্জীবন, শক্তির ভারসাম্য—ইত্যাদি বিষয়ে কামাই করা জ্ঞানের জগতে ঢুকে পড়ার এক রকম মৌলিক তাড়নাই প্রবল হয়ে দেখা দেয়। এই সব বাধ্যবাধকতার মধ্যে কাজ করেন ম্যাকনেইল ও লেহরার। খারাপ ভালো যা-ই হোক, ওরা নিজেরাই পরিণত হন আরেক রকম বাধ্যবাধ্যকতায়, যার সীমানার ভেতরে কাজ করতে হয় খোদ সরকারকেও।

ইরানের ব্যাপারে বানোয়াট সঙ্গতি ও অতিসাবধানতায় বিপর্যস্ত সাংবাদিকতার দ্বারা তৈরি পরিপ্রেক্ষিতের মধ্যে আই. এফ. স্টোনের লেখা "এ শাহ্ লবি নেক্সট?"-এ

www.pathagar.com

প্রতিফলিত বিস্ময়কর দূরদর্শিতার প্রশংসা করবো আমরা। এটি লেখা হয় ১৯৭৯ সালের জানুয়ারির ১৭ তারিখে, আর *নিউইয়র্ক রিভিউ অব বুকস*-এ ছাপা হয় ফেব্রুয়ারির ২২ তারিখে। ওখানে তিনি ভবিষ্যৎবাণী করেন কিভাবে শাহ "ঐক্যবদ্ধ করবেন তার এইসব দুর্দান্ত বন্ধুদের : চেজ ম্যানহাটন ব্যাংক থেকে অস্ত্র শিল্প, সিআইএ ও "ভূখা প্রতিষ্ঠানের জগত"—সবখান থেকে। কিন্তু এখানে "রক্তমাংসের শাহ্‌র উপস্থিতিতে" বিভিন্ন সম্ভাবনা দেখা দেয়ার সমূহ আশঙ্কা আছে; "যদিও ইরানের আভ্যন্তরীণ রাজনীতি থেকে দূরে থাকার শিক্ষা নেয়ার প্রয়োজনীয়তা সত্ত্বেও আমরা শিক্ষা নিইনি; এখন তার সমান্তরালে আরেকটা শিক্ষা নিতে পারি ইরানের রাজনীতিকে আমাদের রাজনীতি মনে করার বাস্তবতা থেকে"। কেন? কারণ, স্টোনের ভয়াবহ পূর্বানুরাগ অব্যাহত থাকে, "যদি ইরানের নয়া শাসক দল তাদের নিজেদের দাবী নিয়ে এগিয়ে আসে তাহলে কি ঘটবে... যদি বিদেশী ব্যাংক ও অন্যান্য আর্থিক প্রতিষ্ঠানে শাহ্ ও পাহলভি ফাউন্ডেশনের হিসাব হস্তান্তরের দাবী করে? যদি ওরা দেশ লুটের অভিযোগে শাহ্‌র বিচার করার জন্য শাহ্‌কে ফিরিয়ে দেয়ার দাবী করে তাহলে কি হবে? সাভাক (SAVAK)-এর হাতে নির্যাতন ও মৃত্যুর তথাকথিত কাহিনীর পুরো দায়িত্ব তৎকালীন ইরানের পরম ক্ষমতাশালী শাহ্‌র ওপর চাপিয়ে দিয়ে তার বিরুদ্ধে অভিযোগ তুলে, তা হলে কি হবে?

স্টোনকে আমি এ জন্য উদ্ধৃত করিনি যে, ঘটনাক্রমে তিনি তার বক্তব্যে একেবারে সঠিক, বরং উদ্ধৃত করার একটা কারণ হলো তিনি তা নন। এ ভদ্রলোক কখনো ইরান বিশেষজ্ঞ হওয়ার ভান করেননি, ইসলামের প্রতি তার সহানুভূতি আছে বলেও জানা যায় না। তার নিবন্ধটি পড়লে কোথাও ইসলামী মনোভাবের ছাপ পাবেন না। কিংবা খুঁজে পাওয়া যাবে না 'শাহাদাতের প্রতি শিয়াদের আগ্রহ' কিংবা এ ধারার অন্যসব নির্বোধসুলভ কথাবার্তা। অথচ এখন ইরানের ব্যাপারে এগুলোই প্রাসঙ্গিক তথ্য হিসেবে চোখের সামনে প্যারেড করে যায়। তিনি রাজনীতি বুঝেন, বুঝেন এ সমাজ ও অন্য সমাজের কোন জিনিষটা নারী-পুরুষকে জেগে উঠতে বাধ্য করে। তার সন্দেহ নেই ইরানীরা মার্কিন বা ইউরোপীয় না হলেও, তাদেরও থাকতে পারে নিজস্ব অভিযোগ, আশা ও উচ্চাকাঙ্ক্ষা। এগুলো অস্বীকার করা পশ্চিমাদের বোকামী। স্টোন যদিও ফারসি জানেন না , কিন্তু তার মধ্যে সুভাষণে রাখঢাকের চেষ্টা নেই। তিনি ধামাচাপা দেয়ার উদ্দেশ্যে সাধারণীকরণের বিলাসিতায় গা ভাসিয়ে "ফারসি ভাষার সূক্ষ্ম ও অস্পষ্টতার স্বভাব" নিয়ে কথা বলেন না।

নভেম্বরের ১১ তারিখের *ওয়াশিংটন পোস্টে* জোসেফ ক্র্যাফট ঘটনাটি সম্পর্কে তার স্বভাবগত কঠোর মনোভাব তুলে ধরেন "টাইম ফর এ শো অব পাওয়ার" শিরোনামে। ওখানে তিনি আমাদের দূতাবাসের সাধুতা সম্পর্কে মন্তব্য করেন এবং কূটনৈতিক নিরাপত্তা সম্পর্কে যা বলা শোভন তার চেয়ে অনেক বেশি বলেন। ক্র্যাফটের মন্তব্য খানিকটা আলো ফেলে আমাদের প্রচার মাধ্যমের তৎপরতার পেছনে সক্রিয়—হয়তো অবচেতন— মূলনীতিগুলোর ওপর। ক্র্যাফট লেখেন "শাহ্‌র পতন মার্কিন স্বার্থের

www.pathagar.com

জন্য এক দুর্যোগ"। শাহ কেবল নিয়মিত তেল সরবরাহই করতেন না, " রাজকীয় ডাঁটপাটের" মধ্য দিয়ে শৃঙ্খলা বজায় রাখতেন ইরানী উপত্যকায়; তা ছিলো আমেরিকার জন্য মঙ্গলজনক। এর ফলে তেল প্রবাহিত হতে থাকে, গোটা অঞ্চল ও দমিত জাতীয়তাবাদীরা অবস্থান করে সীমার মধ্যে; আর সে কারণে আমরা আবির্ভূত হই শক্তিশালী চেহারায়। ক্র্যাফট অতপর সুপারিশ করেন "আয়াতুল্লাহ্‌র দ্বারা বিপর্যস্ত শাহ্-প্রশাসনের পক্ষে আমেরিকার শক্তি জাহির করার একটা বিস্ময়কর, নির্ভুল উপলক্ষ খোঁজার জন্য", যা হবে "ইরানে মার্কিন নীতি পুনর্গঠনেরই" অংশ। এ ছাড়া আর কিভাবে তা করা সম্ভব?

> [তা] হতে পারে, ইরানে আঞ্চলিক কোন্দল খুঁচিয়ে দেয়ার ব্যাপারে ইরাককে সাহায্য করা। অথবা তেমন সুযোগ বের করে কাজে লাগানোর জন্য তুরস্ককে সামরিক সাহায্য প্রদান, সেজন্য ওয়াশিংটনে গুরুত্বপূর্ণ আভ্যন্তরীণ পরিবর্তন দরকার। মেরিন সেনা পাঠানো ও বোমাবর্ষণের বাইরেও কিছু করার সামর্থ্য দরকার যুক্তরাষ্ট্রের। কিছুদিন আগে যে-ক্ষমতা নিজেই ধ্বংস হয়ে গেছে, এখন তারই পুনর্গঠন দরকার আমেরিকার : অর্থাৎ পরোক্ষ হস্তক্ষেপের ক্ষমতা।

ক্র্যাফটের লেখায় যা পরিষ্কার তা হচ্ছে, প্রথমে- তিনি মানতেই রাজী নন ইরানে বিপ্লব বলে কিছু একটা হয়েছে। কাজেই এর সাথে অন্যসব অর্থাৎ আয়াতুল্লাহ্, ইসলাম, ইরানী জনগণ—সবই বিপথগামী ব্যাপার হিসেবে পুনর্বিন্যস্ত হতে হবে। এবং তিনি চান তার পাঠকরাও যেন এ কথা বিশ্বাস করে। ক্র্যাফট নিজে বাস্তবতার যে সংস্করণ তৈরি করেন তা চাপিয়ে দেন জটিল ইরানী ও মার্কিন বাস্তবতার ওপর। এভাবে বদলে নেন ঐসব বাস্তবতা। এর একটি শিক্ষামূলক বাড়তি বৈশিষ্ট্য এই যে, এগুলো সম্পূর্ণ নৈতিকতা বর্জিত; বাস্তবতার এ সংস্করণ ক্ষমতা-সম্পর্কিত সংস্করণ—আমেরিকান ক্ষমতা-সম্পর্কিত ব্যাপার, যাতে "বিশ্ব" আমাদের শর্তাধীন হয়। যদিও এর ফলাফল ছিলো ইরানে পঁচিশ বছরের হস্তক্ষেপ। কিন্তু তা কিছুই শিখায়নি আমাদেরকে। ক্র্যাফট যদিও বুঝতে পারেন যে, এ প্রক্রিয়ায় তিনি অন্য মানুষদের সরকার ব্যবস্থা পরিবর্তনের অধিকার অস্বীকার করছেন, এমনকি এও অস্বীকার করছেন যে, একটা পরিবর্তন ওখানে সত্যিই ঘটছে, তাতেও তার কিছু যায় বা আসে না। তিনি চান বিশ্ব আমেরিকাকে চিনুক এর ক্ষমতা, চাহিদা ও দৃষ্টির জন্য, আবার আমেরিকাও বিশ্বকে চিনে নিক একই মানদণ্ডে। এ ছাড়া আর যা আছে, তার সবই ক্রোধ ও ক্ষোভ।

সমস্যা হচ্ছে একেবারেই বাস্তব ও স্বার্থপর দৃষ্টিকোণের বিচারেও এটি একটি মোটাবুদ্ধির অন্ধ প্রস্তাব। ক্র্যাফট ও তার সমমনারা যখন ইরানী বিপ্লবকে আক্রমণ করছিলেন এবং শোক করছিলেন ক্ষমতাচ্যুত শাহ্‌র জন্য, তখন ইরানের পরিস্থিতি টগবগে ও অনিশ্চিত। যে-জনতা শাহ্‌কে রাস্তায় নামায় তার তখন রাজনৈতিক জোটের সামনের দিকে, আর সবার উপরে আয়াতুল্লাহ খোমেনি। দেশ পরিচালনায় একমাত্র তারই আছে আধ্যাত্মিক ও রাজনৈতিক বৈধতা। এ সত্ত্বেও, তিনি যে স্তরটা

www.pathagar.com

চালাচ্ছিলেন তার নিচের স্তরেই চলছে বিভিন্ন গোষ্ঠীর সংঘাত। এর মধ্যে আছে মোল্লারা (যাদের সমর্থকরা গঠন করে রিপাবলিকান পার্টি), আধা-উদারনৈতিকেরা (বাজেরগানের নেতৃত্বাধীন), বাম উদারনৈতিক থেকে শুরু করে বাম-ইসলামী দল ও ব্যক্তিত্বের বিশাল গ্রুপ (বনি সদরের নেতৃত্বে) এবং অ-ইসলামিক বামদের জোট। বিপ্লবের পরবর্তী এক বছর অর্থাৎ ফেব্রুয়ারী ১৯৭৯ থেকে মার্চ-এপ্রিল ১৯৮০ পর্যন্ত প্রবল সংঘাত চলে এইসব জোটের মধ্যে। একবার মনে হয় বনি সদর জিতে যাচ্ছেন, অন্য সময় বিশেষত ১৯৮০ সালের শীত-বসন্তে সুবিধাজনক অবস্থানে দেখা যায় মোল্লাদেরকে (যাদের নেতৃত্বে ছিলেন আয়াতুল্লাহ মোহম্মদ বেহেশতী)। *এ সংঘাত চলাকালে সংঘাতের খুব সামান্য যুক্তরাষ্ট্রে রিপোর্ট করা হয়েছে।* আদিম ও স্থির ইসলামের ধারণার প্রতি ভাবাদর্শিক বিশ্বাস এতটাই শক্তিশালী! এমনকি ইরানে বা অন্যান্য দেশে চলমান রাজনৈতিক প্রক্রিয়াও তাদের মনোযোগ আকর্ষণ করতে পারেনি। তখন আন্তর্সংঘাতে রক্ষণশীল ইসলাম জয়ী হওয়ার পর তাদের মনে হয় ইসলাম সম্পর্কে আগের বিবরণ সবই সঠিক। বনি সদরকে এমনভাবে প্রচার করা হয় যেন তিনি-ই একমাত্র লোক যার সাথে আলোচনা চালানো যায়, তবে কেবল বেহেশতী যদি দৃশ্যপটে না থাকে। অথচ ১৯৭৯ সালে বনি সদরের উত্থানকালে হয় তার প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করা হয়েছে, নয়তো উপেক্ষা করা হয়েছে তাকে।

ক্ষমতা এক জটিল জিনিষ, সবসময় স্পষ্টও নয়, যদি না সামরিক দৃষ্টিকোণ থেকে দেখা হয়। ক্র্যাফট ঠিকই নিরীক্ষণ করেন এমন কিছু পরিস্থিতি আছে যখন ক্ষমতা সহজে দেখা বা বোঝা যায় না, সরাসরি প্রয়োগও করা যায় না (রেইড, সিআইএ'র গোপন আঘাত, শাস্তিমূলক হামলা চালানো সম্ভব হয় না।) কেবল পরোক্ষ প্রয়োগ সম্ভব হয় (যেমন, প্রচার মাধ্যম কর্তৃক যেন কোনো অনিঃশেষ উৎস থেকে বার বার উপস্থাপিত "আমেরিকান জিম্মি" ব্যাপারটি)। দীর্ঘ সময় ধরে নিজেদের ক্ষমতা জাহির করার আগ্রহ ছিলো প্রচার মাধ্যমের। এমনকি বললে অতিরঞ্জন হবে না যে, ক্র্যাফট যে "জাতীয় পৌরুষহীনতার" কথা বলেছেন তা আসলে এক রকম মার্কিন ক্ষমতা কর্তৃক আরেক রকম মার্কিন ক্ষমতাকে ঢেকে ফেলার ঘটনা : প্রচার মাধ্যমের বিশাল ছায়ায় সামরিক বাহিনীর আপাত অদৃশ্য অবস্থা। দূতাবাস দখলের পর মার্কিন সেনাবাহিনী এমন এক শক্তির দ্বারা বাধাগ্রস্ত হয় যা মার্কিন আওতা থেকে অনেক দূরে (১৯৮০ সালের এপ্রিলের শেষ দিকে পরিচালিত ব্যর্থ উদ্ধার-অভিযান তার স্পষ্ট প্রমাণ)। অথচ সেই শক্তিই প্রচার মাধ্যমের আঘাতের জন্য উন্মুক্ত, প্রতীকায়ন ক্ষমতার দ্বারা নির্ধারিত আওতার মধ্যে, অসহায়। ইরানীরা শাহ কিংবা যুক্তরাষ্ট্রের নাগপাশ থেকে হয়তো মুক্তি পায়, কিন্তু মার্কিন টেলিভিশনে আবির্ভূত হয় বেনামা, বিশাল উন্মত্ত জনতারূপে, নৈর্ব্যক্তিক, অমানবিক রূপে; এবং এর ফলে পতিত হয় প্রচার মাধ্যমেরই আরেক রকম শাসনের মধ্যে। তবে সচেতন বা অসচেতনভাবেই হোক, সংবাদ মাধ্যমগুলোর ক্ষমতা প্রয়োগের উদ্দেশ্য একই—যুক্তরাষ্ট্র সরকারের আগের উদ্দেশ্যেরই অনুরূপ: আমেরিকার বিস্তৃতি, যা ইরানীদের মতে বাতিল করে

www.pathagar.com

দেয় ইরানী বিপ্লবকে। এর অর্থ খবর পরিবেশন নয়, কোনো একটি গুরুত্বপূর্ণ পর্যায়ে মার্কিন পররাষ্ট্রনীতির বিশ্লেষণও নয়। দু'একটি ব্যতিক্রম বাদ রেখে বলা যায়, প্রচার মাধ্যমের উদ্দেশ্য ছিলো ইরানের বিরুদ্ধে এক ধরনের যুদ্ধ ঘোষণা।

১৯৭৯ সালের ডিসেম্বর ও পরের বছর জানুয়ারী, ফেব্রুয়ারী ও মার্চে *ওয়াশিংটন পোস্টে* প্রকাশিত ওয়াল্টার পিনকাস ও ড্যান মর্গানের বিস্ময়কর অনুসন্ধিৎসু প্রতিবেদনগুলো এক্ষেত্রে ব্যতিক্রম। যুক্তরাষ্ট্রের অস্ত্র কোম্পানীগুলোর সাথে শাহ্‌র লোভনীয় চুক্তি, পাহলভি ফাউন্ডেশনের ব্যাপক নিয়ন্ত্রণ, জনগণের ওপর অন্যায় প্রভাব বিস্তার, ও দমন-নির্যাতন সম্পর্কে প্রচুর তথ্য-উপাত্ত তুলে ধরেন এরা। এর কিছু কিছু খুঁটিনাটিসুদ্ধ আলোচিত হয়েছে রবার্ট গ্রাহামের বই *ইরান : দি ইল্যুশান অব পাওয়ারে*। এ সত্ত্বেও ১৯৭৯ সালের নভেম্বরের ২৬ তারিখে প্রাকশিত বার্নার্ড নসিটারের নিবন্ধসহ এ জাতীয় লেখায় খোমেনির তুলনা করা হয় শাহ্‌র সাথে, যদিও মিল পাওয়া যায় খুব সামান্যই। এসব প্রতিবেদনেও প্রচার মাধ্যমের ক্রোধের প্রকাশ লক্ষণীয়। অথচ কেউ ইরানে মার্কিন নীতি "সমর্পণের নীতির" আলোকে দেখার চিন্তা করেন নাই। এ নীতিতেই ইরানে বিভিন্ন শক্তিকে আন্তঃসীমানা অর্থনৈতিক, কূটনৈতিক ও আইনী সুবিধা প্রদান করা হয়, যার শুরু হয় ইংল্যান্ডকে দিয়ে। এ জন্যই ১৯৬৪ সালে খোমেনি বলতে পারেন, "শাহ্ যদি একটি মার্কিন কুকুরের ওপরও পা দেয় তবু তাকে কৈফিয়ত দিতে হবে, কিন্তু কোনো মার্কিন বাবুর্চিও যদি শাহ্‌কে পদদলিত করে... তার ব্যাপারে কারো কোনো আপত্তি নেই।"[৭] প্রচার মাধ্যম এ দিকটা উল্লেখ করে না। অথচ এ বিষয়টির আলোকে বিচার করলে বোঝা যেতো কেন সকল "বিদেশী শয়তানের" বিরুদ্ধে, বিশেষ করে—কেবল যুক্তরাষ্ট্রের নয়, সবদেশের— সকল কূটনীতিকের বিরুদ্ধে এমন প্রবল ঘৃণা ইরানীদের। তা হলে অনেক ভাষ্যকারের পুতপবিত্র প্রতিবাদও থেমে যেতো, যারা মনে করেন ইরান যুক্তরাষ্ট্রকে ভুল বুঝেছে, যুক্তরাষ্ট্র ইরানের প্রতি প্রচণ্ড দয়া দেখানো ছাড়া আর কিছুই করে নাই।

কাজেই সঙ্কটের প্রথম তিনমাসে প্রকাশিত লেখালেখি থেকে পাঠকরা যে কিছু জানতে পারেনি তাতে অবাক হওয়ার কিছু নাই। প্রচার মাধ্যম সরবরাহ করেছে জেদ বা ঝোঁক, প্রতিবেদনের ভেতরের জটিলতা তাদের লেখায় উঠে আসেনি, এর বিশ্লেষণও হয়নি। আমার ধারণা আমেরিকানরা বলবে প্রচার মাধ্যম যে ওখানে অর্থাৎ তেহরানেও হাজির থাকার ক্ষমতা রাখে তার যথেষ্ট প্রমাণ দিয়েছে এবং খোঁচা-মারা ঘটনাগুলোকে একত্রে মিলিয়ে নেয়ার মত করে মূল একটা আকারও দিয়েছে। কিন্তু যা ঘটেছে তার জটিল রাজনৈতিক বিশ্লেষণে কোনো কাজেই আসে না ওগুলো। নিঃসন্দেহে বলা যায় প্রচার মাধ্যম যে ইতহাসের জটিল ও কখনো কখনো সন্দেহসৃজক প্রক্রিয়ার নথি রাখছে, তা হয়তো কারো মনেই আসেনি। তবে প্রচার মাধ্যম কিভাবে কাজ করেছে অনেক জানার আছে সে সম্পর্কে।

আমি যে দিকে ইঙ্গিত করেছি অর্থাৎ সংঘাতমুখি অভিজ্ঞতাকে কঠোর চেহারায় চিত্রিত করা ছাড়াও আছে ইরান সম্পর্কিত খবরের পরিমাণগত বিশালত্ব ও অস্বাভাবিক

www.pathagar.com

খরচের ব্যাপারটাও ভাববার মতো। আমি ৮টি খবরের কাগজ, তিনটি নেটওয়ার্ক, *টাইমস, নিউজ উইক* ও *পিবিএস*-কে পর্যবেক্ষণ করি দশ সপ্তাহ ধরে। দেখা গেছে প্রথম সারির প্রতিটি পত্রিকাই ইরান সম্পর্কিত খবর প্রচার করে বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে। তা ছাড়া, 'এর পশ্চাদপটের" এবং ছোটো আকারের ফিচারগুলোকেও ছাপে বিশেষ যত্নসহকারে। ১৯৭৯ সালের ডিসেম্বরের ১৫ তারিখের *নিউইয়র্ক টাইমসে* জন কিফনার লেখেন যে, প্রায় তিনশ' পশ্চিমা সাংবাদিকের এক বিরাট বাহিনী ঘটনাস্থল তেহরানে সক্রিয় (এদের অধিকাংশেরই দোভাষী লাগে)। পরের দিনের *দি অস্ট্রেলিয়ানে* কল অ্যালেন লিখেন বড় তিনটি মার্কিন নিউজ নেটওয়ার্ক তেহরানে দিনে মিলিয়ন ডলার খরচ করছে। *সিবিএস*-এর ব্যুরো চীফ ছাড়াও "২৩ জন সাংবাদিকের একটি টীম রয়েছে, আছে একজন ক্যামেরাম্যান, অডিও, ফিল্ম ও টেকনিক্যাল এক্সপার্ট; এর ওপর আছে বারো জন ইরানী দোভাষী, গাড়িচালক ও গাইড।" অপারেশনাল সেন্টার খোলা হয় মাসিক ছয় হাজার ডলার ভাড়ার একটি হেটেল স্যুটে। সাংবাদিক ও অন্যান্যদের থাকার জন্য দিনে প্রতিটি ৭০ ডলার ভাড়ার ৩৫টি হোটেল রুম। এ ছাড়া আছে প্রাইভেট বিমান, টেলেক্স মেশিন, গাড়ী ও ফোনের খরচ এবং প্রতি মিনিটে এক শ ডলার হিসেবে দিনে চারঘন্টা টেলিকমিউনিকেশন স্যাটেলাইট ব্যবহারের খরচ। এ খরচ দ্রুত উপরের দিকেই ওঠে।

ভারমন্ট রয়স্টার বিদেশ থেকে ফিরে ১৯৭৯ সালের ডিসেম্বরের ১৯ তারিখের *ওয়ার্ল্ড স্ট্রীট জার্নালে* মন্তব্য করেন, একসাথে জমানো বিপুল পত্রিকা ও টিভি অনুষ্ঠান দেখে মনে হয় ওগুলো যেন প্রমাণ দিচ্ছে :

> যে-বিষয়টি আমি জানতাম না সেই ইরান সঙ্কট সম্পর্কে আমি খুব সামান্য জানতে পেরেছি, যদিও প্রতিবেদন-রিপোর্ট পরিমাণে বিপুল। দেশে ফিরে উদ্বেগের সাথে লক্ষ্য করলাম ইরান সম্পর্কিত টেলিভিশন অনুষ্ঠান, বেতার কথিকা ও সংবাদপত্রের কাহিনীর দৈনিক বন্যায় সয়লাব হয়ে আছি আমি। বিরাট বিরাট হেডলাইনে বড় বড় রিপোর্ট তুলে ধরে পত্রিকাগুলো, টিভি চ্যানেলগুলো প্রায় প্রতিটি সন্ধ্যা ব্যয় করে এ সম্পর্কিত সংবাদের পেছনে, আবার গভীর রাতেও প্রচার করে বিশেষ অনুষ্ঠান। এ থেকে বিপথগামিতার ব্যাপারে একটা চিন্তা আসে মাথায়—অতিরঞ্জন করছে প্রচার মাধ্যম।
>
> এমন গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে এ ধরনের প্রতিক্রিয়া অস্বাভাবিক মনে হয়। কিন্তু জানান দেয়া তথ্যটির সাথে ঘটনার বর্ণনায় খরচ করা বিপুল পরিমাণ শব্দের স্তূপের তুলনা হয় না। সত্য হলো ঐ শব্দরাশির বেশিরভাগের মধ্যেই প্রকৃত কোনো খবর নেই।
>
> ২৮ দিন —৩৮ দিন, চল্লিশ দিন... অধিকাংশ দিনে এমন কিছুই থাকে না যে আগের দিনের চেয়ে ভিন্ন কিছু রিপোর্ট করা সম্ভব।

কেবল একই ধাঁচের রিপোর্টের কারণে অত প্রতিক্রিয়া দেখাননি রয়স্টার। সম্ভবত খবরের খোঁজে অসন্তোষজনক সঙ্কীর্ণ ও দ্রুত নির্জীব হয়ে আসা আন্দাজের বহর

www.pathagar.com

দেখেই তার মধ্যে এমন তীব্র প্রতিক্রিয়া হয়ে থাকবে। রিপোর্টার ও বিশেষজ্ঞরা বোধগম্যভাবেই জিম্মিদের নিয়ে ব্যস্ত, ঘটনাটির রুক্ষতায় ক্রুদ্ধ—হয়তো ক্রুদ্ধ ইসলামের ওপরও; অথচ এরা তাজা খবর পাওয়ার আশা করেন। কত আর ভরসা রাখা যায় এদের ওপর! নভেম্বরের ১৮ তারিখের *শিকাগো ট্রিবিউনে* জেমস ইয়ুঙ্গার লম্বা এক লেখায় জনৈক বিশেষজ্ঞকে উদ্ধৃত করে লেখেন— ঐ বিশেষজ্ঞ বলেছেন, "এটি এমন এক ঘটনা যে, এ নিয়ে যৌক্তিক কোনো আলোচনা চলে না" অথবা "শাহাদাত বরণের জন্য ইরানীরা ক্ষুধার্ত" এবং "বলির পাঁঠা খোঁজার প্রবণতা আছে ওদের"। এরপর আছে পরের সপ্তাহের *টাইমস* ও *নিউজ উইক*, তার পরের সপ্তাহের নিউইয়র্ক টাইমসের অনেকগুলো ফিচার। এইসব পড়লে বর্ণিত তথ্য থেকে পাঠকের মনে এই ধারণাই বজায় থাকবে যে, ইরানীরা শাহাদাত বরণের জন্য উন্মুখ শিয়া সম্প্রদায়ের মানুষ, আপোষহীন, যুক্তিবোধহীন খোমেনির নেতৃত্বে পরিচালিত, আমেরিকার প্রতি ঘৃণা পোষণ করে, শয়তানের গোয়েন্দাদের দমন করতে দৃঢ়-প্রতিজ্ঞ, ইত্যাদি।

দূতাবাস দখলের আগে ইরানে কি এমন কিছুই ঘটে নাই যে, এ ব্যাপারে আলো ফেলতে পারে? ইরানের ইতিহাস ও সমাজ সম্পর্কে কি কিছু লেখা যায় না যা বর্তমান ইরানের সাথে জড়ানো সম্ভব নয়, যে উন্মত্ত ইরান অকারণে খোঁচাচ্ছে "ভালো ছেলে" আমেরিকাকে? সবচেয়ে বড় কথা প্রচার মাধ্যম কি খালি জিম্মিদের শর্তহীন মুক্তির দাবীর পেছনে সমগ্র জাতিকে ঐক্যবদ্ধ রাখার সরকারী নীতির সাথে তালমিলানো খবর ছড়িয়ে দিতেই আগ্রহী? শর্তহীন মুক্তির বিষয়টি প্রথম দাঁড় করান হার্ভার্ডের রজার ফিশার, ডিসেম্বরের ৩ তারিখের টুডে শো-তে। এই দাবী আবার আসল কথাটার অনুগামী; আসল কথাটা হলো জিম্মিদের মুক্তি নয়, বরং "আমেরিকাকে শক্তিশালী রাখা"?

মাঝেমধ্যে পরস্পর বিরোধী অবস্থানে উপনীত হয় সরকার ও প্রচার মাধ্যম। এ জন্যই, গেলে গোজের সাক্ষাৎকার প্রচারের কারণে সরকার এনবিসিকে আক্রমণ করলে আলোড়ন ওঠে[৮]। এছাড়াও বিভিন্ন মহল থেকে সংযমের পরামর্শ আসে, যারা হয় সরকারের জন্য অথবা সরকারের মত কথা বলে; জর্জ বল ডিসেম্বরের ১২ তারিখের ম্যাকনেইল/লেহরার রিপোর্টে এ বিষয়টির প্রতি ইঙ্গিত করেই বলেন, "বিশ্বের সর্ববৃহৎ যোগাযোগ নেটওয়ার্ক এখন প্রকৃতই ইরানের তথাকথিত সরকারের সেবায় নিয়োজিত।" প্রচার মাধ্যমে মুদ্রিত সাক্ষ্য-প্রমাণাদি, বিবৃতি, ঘোষণা, বাতিল করে দেয়ার চেষ্টা চলে এই মূল মনোভাবের সাথে সঙ্গতি রেখে। তা করা হয় নানা কায়দায়: যেমন- বলা হয় "অমুক ভদ্রলোক" কথা বলার আগেই তার মগজ ধোলাই করা হয়েছে, 'ক' বা 'খ' ইরানী লোকটি অপপ্রচারণা চালাচ্ছে, কিংবা ওরা এখন উন্মত্ত। নভেম্বরের ২২ তারিখের *শিকাগো ট্রিবিউনে* জেমস কোট লেখেন, "প্রশাসনের কর্মকর্তারা বলছেন তেহরানে মার্কিন দূতাবাসে জিম্মিরা দিন কাটাচ্ছেন মনস্তাত্ত্বিক চাপের মধ্যে, কোরীয় ও ভিয়েতনাম যুদ্ধের সময় যেমনটা ঘটে মার্কিন পাউ (POW)-এর বেলায়। কর্মকর্তারা পরে স্বীকার করেন, "মুক্তি পাওয়ার পর জিম্মিরা যে-সব

www.pathagar.com

বিবৃতি দিয়েছে তার কয়েকটির ব্যাপারে তারা সজাগ"। লয়েস টিমনিক নভেম্বরের ২৬ তারিখের লস এঞ্জেলেস টাইমসে লেখেন জনৈক বিশেষজ্ঞের মতে "বিশ্ববাসী এমন প্রত্যাশা করতেই পারে যে, মুক্তিপ্রাপ্ত জিম্মিরা টেপে ধারণকৃত ব্যক্তিগত সাক্ষাৎকার দেবেন, যাতে সব অপকর্ম স্বীকার করে নেবেন সাক্ষাৎকার প্রদানকারী; এবং এমন সব বিবৃতি দেবেন যা ওদের জন্য যেমন, তেমনি আমেরিকার জন্যও ক্ষতিকর।"

এমন ছেলেমানুষী ঝগড়ার আরেকটি দৃষ্টান্ত হলো প্রচার মাধ্যমের মনোভঙ্গি ও সরকারের মনোভাব কোনোটাই অনুসরণ না করে বিকল্প একটি দৃষ্টিভঙ্গি প্রস্তাব করায় সিনেটর কেনেডীর ওপর আক্রমণ (ডিসেম্বরের ৫ তারিখের *নিউইয়র্ক পোস্ট* : "টেডি ইজ দ্য টোস্ট অব তেহরান")। কিংবা রিপ্রেজেন্টেটিভ জর্জ হ্যানসানকে নির্দয়ভাবে ধোলাই করার ঘটনা; টিপ ও'নেইল তার বিরুদ্ধে যে অভিযোগ তুলেন তা যাতে গুরুত্বপূর্ণ মনে হয় সেজন্য হ্যানসানের গোটা অতীত এনে হাজির করা হয় পাঠকের সামনে।

আমি বলছি না যে সরকার ও প্রচার মাধ্যম সরাসরি সংঘর্ষ বাধিয়ে দেয়; এও বলি না ইরান সম্পর্কে যা-ই রিপোর্ট করা হয় তাই আমার আলোচিত ভাবাদর্শিক বেড়ির কারণে বিকৃত হয়ে যায়। কিংবা জিম্মি করার অপরাধ মার্জনা করার উপায় আছে বলেও আমি মনে করি না। এমনকি জাতিসংঘে খোমেনির কয়েক মাসের দূত মনসুর ফারাঙ দলত্যাগের আগে ঠিক এই জিনিষটাই স্বীকার করেন নভেম্বরের ৫ তারিখের ম্যাকনেইল/লেহরার রিপোর্টে। কেউ সন্দেহ করবে না যে, ইরানের অব্যাহত বিপ্লবের জটিল গতিধারায় জিম্মি-ঘটনার ভূমিকা ঠিকমতো বিশ্লেষিত হয় নাই। তবে একটা জিনিষ বোঝা গেছে ইরানী সমাজের পশ্চাদগতির উপাদানসমূহের পেছনের কারণগুলো উৎসাহিত হয়েছে দীর্ঘায়িত এই জিম্মি-সঙ্কট মারফত। সঙ্কট এখন শেষের দিকে (এর বড় কারণ ইরান-ইরাক যুদ্ধের ফলে এখন আভ্যন্তরীণ রাজনীতিতে জিম্মিদের উপযোগিতা নেই), নয়া পরিস্থিতির উদ্ভব হচ্ছে। আমি বলতে চাই যে-বিশ্বে আমরা বাস করছি এখন তা অনেক জটিল, অনেকটা ভিন্ন; এ বিশ্ব জন্ম দিতে পারে অনেক অপ্রথাগত পরিস্থিতির (হয়তো ওগুলো আমেরিকান জাতির পছন্দমতো হবে না)। আমেরিকা সেগুলোকে এমনভাবে বিবেচনা করতে পারে যেন সবকিছুকেই হয় মার্কিন-বিরোধী না হয় মার্কিন ক্ষমতা বৃদ্ধির হাতিয়ারে রূপান্তরিত করা সম্ভব। আমেরিকানরা অব্যাহতভাবে এমন বিশ্বাস করতে পারে না যে, ইসলাম আমেরিকাপন্থী না আমেরিকা-বিরোধী সেটিই ইসলাম সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। বিশ্বের প্রতি, ভিনদেশীদের প্রতি ভীতি বা বিদ্বেষের ভিত্তিতে বিশ্ব সম্পর্কে গৃহীত সংকোচক দৃষ্টিভঙ্গি আমেরিকা এবং বাকী আপসহীন মানবজাতির মধ্যে সংঘর্ষই নিশ্চিত করবে। এ হলো স্নায়ুযুদ্ধকালীন হান্টিংটন স্টাইলের নীতি যা বিশ্বের অনাকাঙ্ক্ষিতিরকম বড় এক অঞ্চলকে জড়িয়ে নেয়। আমি মনে করি "পশ্চিমা জীবনযাপন রীতিই" এ ধরনের নীতির সক্রিয় সমর্থক। আমি এও বিশ্বাস করি, এটিও দেখানো সম্ভব যে, বিশ্বে আমাদের অবস্থান সম্পর্কে আমাদের সচেতনতা পরিষ্কার করার জন্য পশ্চিমা জীবনযাপন রীতি যে অনিবার্যভাবেই শত্রুতা ও সংঘাত ডেকে আনে এমন নয়।

www.pathagar.com

যা বলেছি সে ব্যাপারে আমার আন্দাজ হচ্ছে বিশ্বব্যাপী একটা নয়া রাজনৈতিক পরিস্থিতি সৃষ্টি হচ্ছে, এ পর্যায়ে তা সংক্ষেপে দাখিল করা দরকার। অনেকে বলেন মার্কিন শক্তির পতন হচ্ছে। আমি বরং বলবো পৃথিবী আগের তুলনায় এখন রাজনৈতিকভাবে অনেক সচেতন, তাই স্যাটেলাইট উপনিবেশ বা নিজস্ব চিন্তাহীন মিত্রের মর্যাদায় সন্তুষ্ট থাকবে বলে মনে হয়। এর প্রমাণ দিচ্ছে যথাক্রমে সাম্প্রতিক ইরান ও তুরস্ক এবং পশ্চিম ইউরোপ: এর প্রত্যেকটিই যুক্তরাষ্ট্র কর্তৃক ইরানের ওপর আরোপিত বাণিজ্যিক নিষেধাজ্ঞা মানতে রাজী নয়। তা ছাড়া শাহ্‌র প্রতি যুক্তরাষ্ট্রের সমর্থনের কারণে ইরান যতটা ক্ষুব্ধ, তেমনি আফগানিস্তানও আর সোভিয়েত ইউনিয়নের দখলাভিযান দেখতে চায় না। আমি মনে করি ইসলামকে একটি "জোট" মনে করা ভুল ও বোকামি; তেমনি "আমেরিকাকে" একটি জটিল ব্যবস্থা রূপে না দেখে এমন ভাবে বিচার করা যেন আমেরিকা একজন আহত ব্যক্তি। সেও বাজে রাজনৈতিক বিবেচনা মাত্র। কাজেই আমি বিশ্বাস করি পৃথিবী সম্পর্কে আমাদেরকে আরো বেশি জানতে হবে, কম নয়। আমাদেরকে প্রত্যাশা করতে হবে এখন যা পাচ্ছি তার তুলনায় আরো উন্নত মানের রিপোর্টিং, আরো নিখুঁত তথ্য, যা ঘটছে সে সম্পর্কে আরো সংবেদনশীল ও নিখুঁত বর্ণনা; আজকাল আমরা যা পাই তার নাটকীয় সূচনা ১৯৯১ সালের উপসাগরীয় যুদ্ধ ও ১৯৯৩ সালের অসলো চুক্তির সময় : কেবল যুক্তরাষ্ট্রের মুসলিম-বিরোধী ও আরব-বিরোধী পররাষ্ট্রনীতির মূল লাইনটার অনুসরণ। কিন্তু এরও অর্থ হলো প্রচার মাধ্যমের নারী-পুরুষেরা হাতের কাছে যা পায় সচরাচর তাকেও ছাড়িয়ে যাওয়া। এইসব নারী-পুরুষেরা যে সমাজে কাজ করে সে সমাজে (ক) অপশ্চিমা মানুষদের সম্পর্কে সচেতনতা হয় সঙ্কট নয়তো নিঃশর্ত জাতিকেন্দ্রিকতা দ্বারা নির্ধারিত, (খ) সঙ্কীর্ণ আত্ম-স্বার্থ এবং ত্বরিতে জোগাড় করা পুরোনো ও বহুব্যবহৃত কথাবার্তা থেকে তথ্যের একটি বিশদ কাঠামো গঠনের ক্ষমতা অসামান্য, (গ) বিপুল বৈচিত্র্যে পূর্ণ ইসলামী জনগোষ্ঠীর সাথে আদান-প্রদানের ইতিহাস আকার পেয়েছে কেবল তেল আর (ক্ষমতাচ্যুত শাহ্‌র মতো) শাসকদের দ্বারা। যুক্তরাষ্ট্রের সাথে এইসব শাসকের মিত্রতার পরিণামই হচ্ছে সীমিত ও বিপদজনক রকম অপরীক্ষিত কমিউনিজম-বিরোধিতা ও "আধুনিকায়ন"।

এইসব কিছুর উর্ধ্বে ওঠা অবশ্যই কঠিন। কিন্তু ভেবে দেখুন, প্রথম সারির মার্কিন পত্রিকা ও টেলিভিশনের প্রায় সকল প্রতিনিধিই কোনো একটা প্রতিবেদনের কাহিনী উদ্ধারের অসম্পূর্ণ কাজ সম্পূর্ণ করার জন্য অনেক সময় দুর্ভোগের সাথে বীরের মত লড়াই করে। অথচ সচরাচর ওরা সংশ্লিষ্ট ভাষাটিও জানে না; ঐ অঞ্চলে বসবাসের পূর্ব-অভিজ্ঞতাও নেই। দিনকতক থাকার করার পর হয়তো ওরা যখন সত্যিই গুরুত্বপূর্ণ কিছু করতে আরম্ভ করেছে তখনই সরিয়ে নেয়া হয় অন্য কোনো এলাকায়। একজন মানুষ যত মেধাবীই হোক, ইরান বা তুরস্ক অথবা মিশরের মত জটিল জায়গা সম্পর্কে সঠিক রিপোর্ট করতে হলে তাকে কিছুটা প্রশিক্ষণ নিতে হবে এবং সংশ্লিষ্ট দেশটিতে কিছুদিন স্থায়ীভাবে বসবাস করতে হবে। কিছু দৃষ্টান্ত বিবেচনা করা যাক।

www.pathagar.com

১৯৭৫-৭৬ সালে টাইমসের জন্য লেবাননের গৃহযুদ্ধের ওপর রিপোর্ট করেন সহজাত মেধার অধিকারী ব্যক্তিত্ব জেমস মার্কহ্যাম। তখন তিনি মাত্র ভিয়েতনাম থেকে ফিরেছেন; এক বছর পর তাকে আবার পাঠিয়ে দেয়া হলো স্পেনে। তেহরানে জন কিফনারের অনুপস্থিতিতে টাইমসের পক্ষে গোটা লেভান্তের ওপর ভাগাভাগি করে রিপোর্ট করেন নিকোলাস গেইজ বা হেনরি ট্যানার, যদিও তার স্টেশন ছিলো রোম। তেমনি বৈরুতের প্রাক্তন প্রতিনিধি (সেই সাথে জর্ডান, সিরিয়া, ইরাক ও গালফের দায়িত্বপ্রাপ্ত) মার্ভিন হো এক বছর পর্তুগালে থাকার পরপরই বৈরুতে আসেন। এক বছর পর ১৯৭৯ সালের শরতে তাকে সরিয়ে নেয়া হয় আঙ্কারায়।

এ ধরনের কাজকর্মের সাথে ইউরোপের কিছু প্রকাশনার তুলনা করলে বোঝা যায় এ বিপদ পুরোপুরি নিজেরই ডেকে আনা। যেমন ফ্রান্সের লো মঁদ-এর এরিক রোলো গত প্রায় পঁচিশ বছর ধরে এই অঞ্চলের ওপর রিপোর্ট করছেন; আরবী ভাষার ওপর তার দখল চমৎকার। *ম্যানচেষ্টার গার্ডিয়ান*-এর আছে আরবী জানা ডেভিড হার্স্ট, এ এলাকার ওপর অন্তত তিরিশ বছরের রিপোর্টিং-এ অভিজ্ঞ হার্স্ট(তবে, অন্যান্য দিক বিবেচনায় ইউরোপের পররাষ্ট্র বিষয়ক সাংবাদিকতা আমেরিকার চেয়ে কম দুর্বল নয়)। নেটওয়ার্ক সাংবাদিকদের বেলায় ভালো রিপোর্টিং করার পথে প্রতিবন্ধকতা এত বেশি এবং তারা নিজেরাও দেশ থেকে দেশান্তরে এত বেশি ভ্রমণশীল যে, তাদের সাথে তুলনা করলে মুদ্রণ-সাংবাদিকদের রিপোর্টগুলোকেই মনে হবে জ্ঞানকোষ, শান্ত সমাহিত রচনা।

আমার ধারণা, আমেরিকায় প্রাচ্য ও "ইসলাম" সম্পর্কিত রিপোর্টে নিয়মিত যে-অসমতা দেখা যায়, তা পশ্চিম ইউরোপের ব্যাপারে ঘটলে অত সহজে সহ্য করা হতো না। এ কথার অর্থ এই নয় যে, পশ্চিম ইউরোপ সম্পর্কিত রিপোর্টে সকল সমস্যার সমাধান হয়ে গেছে। যাহোক, একটা জিনিষ আমি বুঝতে পারি না রেডিও, টেলিভিশন ও সংবাদপত্রের নির্বাহীদের কেন মনে হয় যে কোনো অঞ্চল সম্পর্কে দীর্ঘ অভিজ্ঞতাজাত রিপোর্টের চেয়ে, নয়া তাজা-চোখের রিপোর্টিং বেশি বিশ্বাসযোগ্য? ইরান সঙ্কটের সময় দেখা যায় মর্টন ডীন, জন কোচরান বা জর্জ লুইসের মত নেটওয়ার্ক সাংবাদিকরা চোখের সামনে "বিশেষজ্ঞে" পরিণত হয়ে উঠছেন; এরা বেশি জানেন বলে নয়, বরং এই রকম অনুমানের কারণে যে, আপনি যদি কোনো ঘটনাস্থলে অল্প কয়েকদিন থাকেন তাহলে আপনি জায়গাটা সম্পর্কে নিখুঁতভাবে জেনে নিবেন। কিন্তু বাস্তবে দেখা যায় রিপোর্টার প্রশ্নহীনভাবে কেবল রিপোর্ট তৈরির প্রয়োজনীয়তার ওপরই নির্ভর করছেন, প্রকৃত অর্থে সংবাদ সংগ্রহ ও বিশ্লেষণের ওপর ততটা নয়। যেমন এনবিসির রাতের অনুষ্ঠানে নিউইয়র্ক থেকে জন চ্যান্সেলর এবং তেহরানস্থ লুইস ও কোচনারের আলোচনা। নিখুঁততা কখনোই প্রচার মাধ্যমের গুণ নয়; কোথাও যদি সংবাদ হওয়ার মত নতুন কিছু নাও থাকে তবু সেখান থেকে একটা রিপোর্ট নিংড়ে নেয়ার কাজে বলি হয়ে যায় এই নিখুঁততা।

অন্যান্য চাপেরও বিশেষ ভূমিকা আছে। টেলিভিশন সাংবাদিকরা প্রতিরাতেই চোখে দেখার মত প্রতিবেদন পরিবেশন করবেন, এই ব্যাপারটা মুদ্রণ-সাংবাদিকদের মাথায়

www.pathagar.com

থাকে। ওরা তাই ভাবতে বাধ্য হন কোন জিনিষটা ভোক্তাদের টানবে; শেষ পর্যন্ত সেই জিনিষের সাথে প্রকৃত কাভারেজ, নিখুঁততা ও বিশেষত্বর সম্পর্ক থাকে না। মুদ্রণ সাংবাদিকতা ও টিভি সাংবাদিকতার এই রকম প্রতিদ্বন্দ্বিতার ফলে ঝোঁক পড়ে অন্য দিকে : যেমন, শিয়া ইসলাম বা খোমেনীর মনস্তাত্ত্বিক ভাবমূর্তির কোন জিনিষটা উদ্ভট তার খোঁজ করা হয়। একই কারণে উপেক্ষিত হয় ইরানে সক্রিয় অন্যান্য ব্যক্তিত্ব ও শক্তিসমূহ। এর চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার হলো কূটনীতির নিষ্কাশন নালা হিসেবে প্রচার মাধ্যমের ব্যবহার। "ইরান কাহিনীর" এই দিকটা নিয়ে চিন্তাসমৃদ্ধ আলোচনা করা হয়েছে ১৯৭৯ সালের ডিসেম্বরের ২৪ তারিখের *ব্রডকাস্টিং ম্যাগাজিন*-এ। ইরান এবং যুক্তরাষ্ট্র উভয় দেশের সরকারই খুব ভালো করে জানতো টেলিভিশনে যে সব মন্তব্য/বিবৃতি দেয়া হয়েছে তা কেবল সংবাদ-ভোক্তাদের জন্য নয়, সরকার, বিভিন্ন পক্ষের অনুগামীগোষ্ঠী এবং নয়া বা কেবল বিকশিত রাজনৈতিক সমর্থকগোষ্ঠীর উদ্দেশ্যেও প্রচারিত। তবে আমি বিশ্বাস করি এ ব্যাপারে সাধারণ মানুষের সমাজে জাগ্রত সচেতনতা ওরা-বনাম-আমরা দ্বি-বিভাজন সম্পর্কে সংকোচ ও সংযমের সাথে ভাবতে তাড়িত করেছে যুক্তরাষ্ট্রের সাংবাদিকদেরকে। এ সত্ত্বেও, রিপোর্টে সম্প্রদায় বা দলগত অনুভূতির আক্ষরিক প্রতিফলন আরো স্পষ্ট করে রিপোর্টারের অযাথার্থ্য ও অক্ষমতাকে।

www.pathagar.com

অপরীক্ষিত গোপন আন্দাজ

ভুল রিপোর্টিং খুব বাজে কাজ। কিন্তু আমার মতে এর চেয়েও খারাপ চলতি পরিস্থিতি সম্পর্কে আন্দাজী রিপোর্ট করা। যুক্তরাষ্ট্রের প্রচার মাধ্যম কিভাবে শাহ্‌র শাসনামল সম্পর্কে প্রচারণা চালায় তার বিবরণ দেয়া হয় ১৯৭৯ সালের জানুয়ারী-ফেব্রুয়ারি সংখ্যার *কলাম্বিয়া জার্নালিজম রিভিউয়ে* প্রকাশিত একটি নিবন্ধে। অসাধারণ উপলব্ধিসম্পন্ন ঐ নিবন্ধটির লেখক দেখান "প্রচার মাধ্যম মোটের ওপর রেজা শাহ্‌র এই বক্তব্যই মেনে নেয় যে, তার লোকেরা (অর্থাৎ ইরানীরা) ভাবাদর্শিক উৎস হিসেবে বড়জোর ধর্মীয় উন্মাদনা বা কমিউনিজমকে টেনে আনতে পারে"[৯]। সে বছর ডিসেম্বরের ১৪ তারিখের *সায়েন্স ম্যাগাজিনও* ইরানের পরিস্থিতি উপলব্ধিতে ব্যর্থতার উল্লেখ করে; তবে সম্পূর্ণ দায় চাপিয়ে দেয়া হয় প্রতিরক্ষা ও গোয়েন্দা বিভাগের লোকদের ওপর। মার্চের ১২ তারিখের *ফরচুনে* এই মতটাকে আরো বিশদভাবে বিচক্ষণতার সাথে তুলে ধরেন হারমেন নিকেল। (ইরানে) মার্কিন ব্যর্থতার শিকড় যে কৌশলগত ত্রুটির চেয়ে অতীতের গভীরে বেশি প্রোথিত... নিকেলের এই বক্তব্য কানে তুলেনি কেউ যে:

> কেবল এই শিকড়কে যথাযথ ও নিরপেক্ষভাবে চিহ্নিত করতে পারলেই ভবিষ্যতে ব্যবহার-উপযোগী অনুসন্ধান সম্ভব হবে। কিন্তু এ ধরনের মার্কিন আত্ম-সন্ধান যেন আবার "কে চীনকে হারিয়ে ফেলল?" ধরনের সমস্যাজনক আবেগী অভিযোগ টেনে না আনে; ১৯৪০ ও ৫০-এর দশকের রাজনীতিতে এ জাতীয় মনোভাব এক বিষাক্ত ইস্যুতে পরিণত হয়। যুক্তরাষ্ট্রের ইরান নীতির সাম্প্রতিক ইতিহাস সেইসব পণ্ডিতদের চোখে পড়ার মতো উজ্জ্বল কোনো কাহিনী নয়, যারা এতদিন উপেক্ষিত থাকার পর এখন মুখ খোলার ও আঙ্গুল তুলে নির্দেশ করার অধিকার পেয়েছেন। বরং সামগ্রিক অপমানবোধ জাগানোর জন্য ব্যর্থতার দায়দায়িত্ব সবাই মিলে মাথা পেতে গ্রহণ করে। ইরানকে শাসনে রাখার ব্যাপারে শাহ্‌র ব্যক্তিগত ক্ষমতা সম্পর্কে অতিরঞ্জিত গালগল্প ছিল একরকম ভুল হিসাব। এ মতটিই গ্রহণ করে ডেমোক্র্যাট ও রিপাবলিকান উভয় প্রশাসন। এবং কংগ্রেস হলে, তেমনি হোয়াইট হাউস কাউন্সিলে কখনো সন্দেহবাদী বা ভিন্নমতের কণ্ঠ শোনা যায়নি।
>
> নির্বিচার দোষারোপের সংস্কৃতি চর্চার বদলে গঠনমূলক রাজনৈতিক প্রশ্নগুলো নিয়ে বিতর্কের সূচনা করতে হলে প্রথমেই আমাদেরকে একটা বিষয়ে পুরোপুরি সচেতন হতে হবে যে, অন্য জাতিগুলো আমাদের সম্পদ

www.pathagar.com

নয় যে, "আমরা ওগুলো হারিয়ে ফেলতে পারি"। ভিয়েতনাম শোকগাঁথায় আমেরিকানদের জন্য যদি একটিও শিক্ষণীয় বিষয় থেকে থাকে তবে তা এই যে, নিজস্ব ইতিহাস, সংস্কৃতি ও ধর্মের দ্বারা গভীরভাবে প্রভাবিত প্রাচীন দেশগুলোর ঘটনাক্রমকে আমাদের নির্দেশ অনুযায়ী পরিচালিত করার মতো ক্ষমতা আমাদের নাই। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় বৌদ্ধধর্মকে যদি প্রায়ই রাজনৈতিকভাবে সন্দেহজনক বলে মনে হয়, তাহলে ইরানে ইসলামের ভূমিকা মার্কিন নীতি-নির্ধারকদের কাছে অনেকবেশি গুরুত্বপূর্ণ ও ঘোরধরানো বলে প্রমাণিত হয়েছে।

কিন্তু বছর পার হয়ে যাওয়ার পরও অটুট থেকে যায় মালিকসুলভ দোষারোপপ্রবণ মনোভাব; সাথে যুক্ত হয় শ্লেষাত্মক এই উপসর্গ: যুক্তরাষ্ট্র যেসব দেশকে তার আওতাধীন মনে করে সেসব দেশেও পরিস্থিতির পরিবর্তন অনুমোদনযোগ্য বলে মানা কঠিন হয়ে পড়ে প্রচার মাধ্যমের পক্ষে। তুরস্কে ১৯৯৬ সালের নির্বাচনে একটি মধ্যপন্থী ইসলামী দল ক্ষমতায় আসায় *টাইমসের* পণ্ডিত থমাস এল ফ্রাইডম্যান লিখে ফেললেন, "হু লস্ট টার্কি?" (আগষ্ট ২৯, ১৯৯৬)। যেন তুরস্ক ও ইরান "আমাদের" সম্পদ যে ওগুলো হারিয়ে ফেলব। অধিকাংশ সাংবাদিক তাদের লেখায় মোহাম্মদ রেজাকে 'প্রাক্তন শাহ' না বলে, উল্লেখ করে কেবল "শাহ" হিসেবে। অন্যদিকে, ১৯৮০ সালের মাঝামাঝি (যখন পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছিলো বিপ্লবের ডানপন্থী শক্তি পুরোপুরি জাঁকিয়ে বসেছে, তখন) দেশের প্রকাশ্য, টগবগে রাজনৈতিক পরিস্থিতির ওপর লেখা হয় কদাচিত, কিন্তু ওখানে সংঘটিত হত্যাকাণ্ড ও নির্যাতন সম্পর্কে নানা গল্প-কাহিনী ছাপা হয় প্রচুর সংখ্যক। কয়েক যুগের কঠোর দমন-পীড়নের পর নির্যাতন ও কারাবাস থেকে তুলনামূলকভাবে মুক্ত একটা দেশে প্রভাব বিস্তারের জন্য দশ-বারোটা রাজনৈতিক দলের চলমান সংঘাত নিয়ে অবস্থা দাঁড়াতে পারে দেশটির জাতীয় অস্তিত্বের—সে বিষয়ে খুঁটিনাটি প্রতিবেদন করার কথা মনে আসা উচিত ছিল।

খোমেনি একগুঁয়ে ও আকর্ষণহীন; দেশে তার অফিসিয়াল অবস্থান একেবারেই অনির্দিষ্ট, এ সত্ত্বেও তিনি পরম শ্রদ্ধার পাত্র; কেন্দ্রীয় সরকার ব্যবস্থায় তার আগ্রহ অতিসামান্য; আবার পারস্পরিক সংঘাতে জড়ানো দশ-বারোটা দলকে অনায়াসে হাতের মুঠোয় রাখার কাজে বেশ দক্ষই মনে হয় তাকে; এবং তিনিই তীব্র আবেগ ও অভিযোগের সাথে উচ্চারণ করেন—আলমোস্তাজাফিন—দুর্বল ও নিপীড়িতরা! দেশে এমন একজন নেতা সক্রিয় থাকার কী অর্থ হতে পারে? জিম্মি সংকটের প্রথম পর্যায়ের কয়েকটি রিপোর্টে এ দিকে মনোযোগ দিয়ে উল্লেখ করা হয় যে, ইরানের সরকার বড়জোর অন্তবর্তীকালীন সরকার, নতুন একটা রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার বিষয়টি সাময়িকভাবে স্থগিত রেখেছে মাত্র। ১৯৭৯ সালের গোটা সময়টা জুড়ে ভবিষ্যৎ সংবিধান ও সরকার ব্যবস্থা নিয়ে বিতর্ক চলে (ডান ও বামপন্থী, ধর্মীয় ও অসাম্প্রদায়িক জোটের মধ্যে)। ইসলামী নীতিমালার রাজনৈতিক ও ধর্মীয় ব্যাখ্যা নিয়ে আয়াতুল্লাহদের মধ্যে তখনো সংঘাত (খোমেনি বনাম শরীয়াতি) চলমান; এগুলোও বর্ণিত হয় কোনো কোনো

www.pathagar.com

রিপোর্টে। এমন মন্তব্যও করা হয় যে, মধ্যবিত্ত মার্কিন সাংবাদিকদের রুচি অনুযায়ী "আকাঙ্ক্ষিত" ও "অনাকাঙ্ক্ষিত" দ্বিবিভাজনের কোনো একটাতে ইরানের ভবিষ্যত পরিস্থিতিকে পড়তেই হবে এমন ধারণা বেঠিক। তবে প্রচার মাধ্যমের সম্পাদকীয় ও ফিচার বিভাগের একটা প্রবণতা বোঝা খুবই কঠিন মনে হয়: যে-বিপ্লব পাহলভীকে উৎখাত করে অধিকতর জনপ্রিয় শক্তিগুলোকে ক্ষমতায় নিয়ে আসে সেই বিপ্লবের প্রতি প্রবল সন্দেহ ও ক্ষোভ কেন এদের? ১৯৭৯ সালের *আটলান্টা কনস্টিটিউশনে* লেখেন হাল গালিভার: "দি বারবারিয়ানস লুজ ইন ইরান"; এ লেখায় দূতাবাস দখলকারী ছাত্রদেরকেই নয় কেবল, সকল ইরানীকেই বর্বর বলেন হাল। সে বছর অক্টোবরের ১৪ তারিখের *নিউইয়র্ক টাইমস সানডে ম্যাগাজিনে* ইউসুফ ইব্রাহিমের দীর্ঘ লেখাটি পড়লে মনে হবে ইরানে বিপ্লব ব্যর্থ হয়েছে, ইরান এখন বিপ্লব-বিরোধী ভয় ও ক্ষোভ ও ঘৃণার আখড়া। এ মন্তব্যের সাক্ষ্য হলো কিছু ব্যক্তিক আন্দাজ, দুজন মন্ত্রীর মন্তব্যের উদ্ধৃতি, আর একজন ব্যাংকার, এক উকিল ও বিজ্ঞাপন কোম্পানীর নির্বাহীর সাক্ষাৎকার।

আমি বলছি না রিপোর্টারদের নিজস্ব মতামত থাকবে না, বা রিপোর্টাররা তাদের মতামত সম্পর্কে কিছুই বলবে না সংবাদ-ভোক্তাদেরকে। কিন্তু মতামতকে যখন বাস্তবে রূপান্তরিত করা হয় তখনই সাংবাদিকতা পরিণত হয় নিজ স্বার্থানুকূল ভবিষ্যৎবাণীতে। কেউ যদি ধরে নেয় যে, ইরানী বিপ্লব খুব বাজে একটা ঘটনা, কারণ তা স্বৈরাচার উৎখাতের জন্য ধর্মীয় ও রাজনৈতিক প্রতিরোধের (আমেরিকানদের কাছে) অপরিচিত গণভাষা ব্যবহার করেছে, তাহলে আপনি প্রথমেই যা খুঁজবেন এবং খুঁজে পেয়ে যাবেন তাহলো: যুক্তিহীন ক্রোধ। নভেম্বরের ২ তারিখের শিকাগো ট্রিবিউনে বে মোজেলির লেখা, "কনফরমিটি, ইনটলারেন্স, গ্রিপ রেভ্যুলিউশনারী ইরান"-এর কথাই ধরা যাক :

> যারা মনে করে মৃত্যু সম্মানজনক, সংজ্ঞানুযায়ী তারাই উন্মত্ত। ইরানের শিয়া মুসলমানদের মধ্যে যেন প্রতিশোধাত্মক রক্তপাতের নেশা, শাহাদাত বরণের আকুতি! বিপ্লবের সময় এই শক্তিই স্বয়ংক্রিয় আগ্নেয়াস্ত্র সজ্জিত সেনাবাহিনীর সামনে দাঁড় করিয়ে দেয় হাজার হাজার নিরস্ত্র ইরানীকে।

উদ্ধৃতির প্রত্যেকটা বাক্যেই বিতর্কিত অনুমানকে সত্য দাবী করা হয়েছে। কিন্তু এগুলো উৎরে যায়, কারণ আলোচনাটি ইসলামী বিপ্লব সম্পর্কে। ১৯৯০-এর দশকে ইরান ও হিজবুল্লাহ সম্পর্কিত লেখালেখিতে এসব কথাই ঘুরে ফিরে আসে। অথচ নাজীদের দ্বারা সংঘটিত ইহুদি হত্যাকাণ্ডে সহায়তাকারী ফরাসীদেরকে খুন করার স্বাধীনতা চেয়ে প্যাট্রিক হেনরি যখন বলেন "আমাকে স্বাধীনতা দাও, নয়তো মৃত্যু" তখন কেউ তাকে ধর্মোন্মাদ বলে না। কিন্তু ইরানে যাদের নৈতিক সাহস উদ্ধত সৈন্যদের মাথা নিচু করে দেয় তাদের বিপুল জনপ্রিয়তার ব্যাপারটার কী হবে? ইরানের ওপর মোজেলির আক্রমণের সমর্থনে পরদিন তার পত্রিকার সম্পাদকীয়তে খোমেনিকে দায়ী করা হয় "পৃথিবীর বিরুদ্ধে পবিত্র যুদ্ধ (জিহাদ) ঘোষণার" জন্য। জিহাদ বিশেষভাবে আলোচিত হয় ১২ তারিখের *লস এঞ্জেলস্ টাইমসে* এডমন্ড

www.pathagar.com

বসওয়ার্থের লেখাতেও; এর পর থেকে পশ্চিম কর্তৃক ইসলামের প্রতিনিধিত্বে গুরুত্বপূর্ণ মোটিফরূপে আবির্ভূত হয় 'জিহাদ'। যদিও ফজলুর রহমান লেখেন, "কেবল ধর্মোন্মাদ খারিজীদের মতেই জিহাদ ধর্ম-বিশ্বাসের অঙ্গ"[১০], তবু বসওয়ার্থ নির্বিচারে বলে যান তুরস্ক, ইরান, সুদান, ইথিওপিয়া, স্পেন, ইন্ডিয়ায় বারো শ' বছরের রাজনীতি উৎসারিত হয়েছে জিহাদের আহবান থেকে।

ইরান ও ইসলামের প্রতি মতাদর্শিক শত্রুতার একটা রূপ হল প্রকৃত ঘটনার বদলে রিপোর্টারের "ব্যাখ্যা" পরিবেশন করা। ইরান সঙ্কট শুরু হওয়ার পর থেকে অনেক দিন ধরে সাংবাদিকরা একটা বিষয় এড়িয়ে যায়; তা হচ্ছে শাহ প্রশাসন ও শাহ্‌র প্রতি যুক্তরাষ্ট্রের নিরবিচ্ছিন্ন সমর্থনের কারণে ইরানীদের ক্ষোভ। ১৯৫৩ সালের আগষ্টে সিআইএ ও অ্যাংলো-ইরানী তেল কোম্পানীর সহযোগিতায় ইরানের নির্বাচিত জনপ্রিয় নেতা মোসাদ্দেককে যখন ক্ষমতাচ্যুত করা হয় তখন এ নিয়ে কোনো তদন্ত হয়নি।[১১] এর কারণ একটাই, যুক্তরাষ্ট্রের আওতাধীন অশিক্ষিত অ-শ্বেতাঙ্গদের দেশে সরকার পরিবর্তনের ও স্বৈরশাসকদের মাফ করে দেয়ার অধিকার রাখে বৃহৎ শক্তি যুক্তরাষ্ট্র (এ ঘটনার অনুপঙ্খ বিবরণ আছে কারমিট রোজভেল্টের *কাউন্টার কু* গ্রন্থে)। জানুয়ারীর ১১ তারিখের নিউইয়র্ক টাইমসে সাইকোথেরাপিস্ট জর্জ ই. গ্রস এক নিবন্ধে মন্তব্য করেন নিউইয়র্কে প্রাক্তন-শাহকে আশ্রয় দেয়ার অর্থ হল যুক্তরাষ্ট্র নৈতিক বিধি-বিধান অমান্য করে তাকে মাফ করে দিয়েছে। এ ঘটনা প্রমাণ করে 'নৈতিক পরিকাঠামোর মধ্যে বিচার বিবেচনায় অক্ষমতা, অন্যদের নীতিগত ক্ষোভের প্রতি সহানুভূতির অভাব"। এ ধরনের লেখার সংখ্যা খুবই কম। সবাই ধরে নেয় তেহরানে মার্কিন দূতাবাসের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেছে ইরানীরা। কিন্তু একবারও ভাবে না যে, ১৯৫৩ সালে মোসাদ্দেককে উৎখাতের করার মাধ্যমে প্রকৃতপক্ষেই ইরানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেছিলো যুক্তরাষ্ট্র[১১]। ১৯৭৯ সালের ডিসেম্বরের ১২ তারিখের লস এঞ্জেলস টাইমসের সম্পাদকীয়তে আর্নেস্ত কোনাইন লেখেন যে, এখন পশ্চিমা রীতির আধুনিকতার প্রভাবের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ প্রত্যক্ষ করছি আমরা। ইরানে শাহ্‌র শিল্প-বিপ্লব প্রত্যন্ত অঞ্চলের ইরানীদেরকে ঐতিহ্যিক জীবন থেকে বিচ্ছিন্ন করার কারণে এবং মোল্লাদের পেনশন বন্ধ করে দেয়াতেই এই ক্ষোভ। কোনাইনের যুক্তির মধ্যে আন্দাজমূলক কিছু ব্যাপার থাকায় তা পাঠ করতে হবে সতর্কতার সাথে। প্রথমত, কোনাইন বলতে চেয়েছেন "পশ্চিমা রীতির আধুনিকায়নের অ-সুস্থিত প্রভাবের" উদ্দেশ্য হচ্ছে ইরানীদেরকে অতীত থেকে বর্তমানে নিয়ে আসা। কাজেই ইরানীরা এখন পশ্চাদপদ। তার দ্বিতীয় অনুমান হচ্ছে শাহ্‌র পুলিশ বাহিনীর নির্যাতনের চেয়ে মোল্লাদের অপমান করার কারণে ইরানীরা বেশি ক্রুদ্ধ। এ মন্তব্যে আছে জাতিকেন্দ্রিক পক্ষপাতিত্ব: কেবল আদিম মানুষদের সম্পর্কেই মনে করা হয়, নির্যাতন ক্রোধ জাগানোর মতো ব্যাপার নয়। তার আরেকটি অভিযোগ হল ইরানকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য পাহলভী প্রশাসন ও যুক্তরাষ্ট্রের আন্তরিক উদ্যোগের প্রশংসা করা হয়নি ইরানে। এর অর্থ হল "আমরা" নিষ্পাপ তো বটেই, ইরানীরা আমাদের আধুনিকতার মূল্য না বোঝার অভিযোগেও অভিযুক্ত।

www.pathagar.com

অথচ প্রায় অনুল্লেখ থেকে যায় যে, মার্কিন করপোরেশনগুলো কী বিপুল পরিমাণ অর্থ লাভ হিসেবে তুলে নিয়ে গেছে ইরান থেকে। রেজা শাহ্‌র নির্যাতনের সামান্যতম অংশও যদি স্বীকার করা হয়, সাথে সাথে এও যোগ করা হয় যে, ইরানীদের ইতিহাসে এ ধরনের নির্যাতন ঐতিহ্যিক (ওয়াশিংটন পোস্ট, ডিসেম্বর ১৬)। এর অর্থ এই বলা যে, যেহেতু ইরানীরা ঐতিহ্যগতভাবে নির্যাতিত হয়ে আসছে তাই ওদেরকে নির্যাতন থেকে রেহাই দেয়ার অর্থ হল ওদেরকে ঐতিহ্যচ্যুত করা।

১৯৭৯ সালের ডিসেম্বরের ৫ তারিখের লস এঞ্জেলস টাইমসে ডন এ. সানচি মন্তব্য করেন খোমেনির উত্থান প্রাক্তন শাহ্‌র মতোই বাজে একটা ব্যাপার। কারণ ইরানের নয়া সংবিধান যুক্তরাষ্ট্রের সংবিধানের অনুরূপ হয় নাই। এ সংবিধান আসলে "আধুনিক কালের সবচেয়ে বিকৃত এক রাজনৈতিক দলিল"। সানচির মতে ইরানে "প্রেসিডেন্ট ও সংসদ নির্বাচন এবং সুসংগঠিত বিচার ব্যবস্থা গণতন্ত্রকে ফাঁদে আটকানোর কৌশল"। অথচ ডিসেম্বরের ২-৩ তারিখে লা মঁদে এরিক রোলো জানান, এসব বিষয় নিয়ে ইরানে তখন তুমুল বিতর্ক চলছে। রোলোর লেখা যেন চোখেই পড়েনি সানচির। অর্থাৎ বাস্তব ঘটনার বদলে এখানে হাজির থাকছে সানচির সম্পাদকীয় বিশ্লেষণ।

১৯৮০-এর দশকের মাঝামাঝি ইরানের রাজনৈতিক বিন্যাস অনেক ইরানীর নিকটই অসন্তোষজনক বলে মনে হয়, যা ছিল আসলে দীর্ঘ সংঘাতের পরবর্তী ঘটনাক্রমিক ফলাফল। অথচ যুক্তরাষ্ট্রে তখন চরম ডানপন্থী এক রিপাবলিকান প্রার্থী উঠে এসেছেন।

শাহ্ শাসনামলের অভিজ্ঞতা ও অনুভূতি নিয়ে কেউ কথা বলে না। এর মধ্যে বিশেষ ব্যতিক্রম হলেন এন্ড্রু ইয়ুঙ। এই নীরবতার সাথে যুক্ত হয় শাহকে মহৎ বলে দেখানোর চেষ্টা। তাকে দেখানো হয় তার অতীত থেকে বিচ্ছিন্ন করে। যেন দূতাবাসের দখলের ঘটনার সাথে রেজা শাহর কোনো সম্পর্ক নাই। অবশ্য দু'একজন সাংবাদিক এখনো আছেন; যেমন ওয়াশিংটন পোস্টের ডন ওবারডরফার বর্ণনা করেন কিভাবে ডেভিড রকফেলার, হেনরি কিসিঞ্জার ও জন ম্যাকলয় প্রাক্তন শাহকে আশ্রয় দেয়ার জন্য যুক্তরাষ্ট্র সরকারের ওপর চাপ সৃষ্টি করে। কিন্তু এইসব তথ্য ও প্রাক্তন শাহ্‌র সাথে ম্যানহাটন ব্যাংকের সম্পর্ক প্রকাশ্যে দূতাবাস দখলের ঘটনার সাথে যুক্ত করে দেখানো হয় না। বরং নানা ব্যাখ্যায় বোঝানোর চেষ্টা চলে জনগণের দৃষ্টি সরিয়ে দেয়ার জন্য ও দেশের কঠিন অর্থনৈতিক পরিস্থিতির কারণে দূতাবাস দখলের ঘটনা ঘটিয়েছেন খোমেনি নিজেই (নভেম্বর ২৫ ও ২৭, ডিসেম্বর ৭ ও ১১ তারিখের লস এঞ্জেলস টাইমস এবং নভেম্বরের ১৫ তারিখের ওয়াশিংটন পোস্ট)।

আমি এখন নিশ্চিত যে, ইরানের ব্যাপারে যুক্তরাষ্ট্রের সরকারী অবস্থান ছিল নির্বাচনের বছরে গৃহীত একটা রাজনৈতিক পরিকল্পনা—ইরান, ইসলাম ও অ-শ্বেতাঙ্গ দুনিয়ার প্রতি প্রচার মাধ্যমের সামগ্রিক ঘৃণাকে রাজনৈতিক পুঁজি হিসেবে কাজে লাগানোর কৌশল। শক্তি প্রয়োগে কার্টারের অস্বীকৃতি উইলিয়াম স্যাফায়ার ও জোসেফ ক্র্যাফটের মতো লোকদের ভর্ৎসনার শিকার হলেও সামগ্রিকভাবে গণমানসে এমন

www.pathagar.com

বোধ সৃষ্টি হয় যে, "ইসলামী" সন্ত্রাসীদের তুলনায় সভ্যতার পশ্চিমা মানদণ্ড সমুন্নত রেখেছেন কার্টার। সঙ্কটের আরেকদিকের ফলাফল হল প্রেসিডেন্ট সাদাত (যিনি খোমেনিকে বলেন ইসলামের কলঙ্ক) এবং সৌদী রাজপরিবারের লোকেরা গৃহীত হন কাঙ্ক্ষিত ইসলামী আদর্শরূপে।

১৯৭৮ সালে ক্যাম্প ডেভিড চুক্তির পর থেকে সাদাত পরিণত হন এ অঞ্চলে মার্কিন মিত্র ও আঞ্চলিক পুলিশে। যুক্তরাষ্ট্রের প্রতি সাদাতের দৃষ্টিভঙ্গিকেই মিশরীয় আরব ও এ অঞ্চলের অন্যান্যদের ব্যাপারে আদর্শরূপে তুলে ধরে প্রচার মাধ্যম। সাদাতের উপলব্ধিকে সঠিক ধরে আরব বিশ্ব এগিয়ে চলেছে এমন একটা মনোভাবও প্রচার করা হয়। মার্কিন ক্যাম্পে থেকেও সাদাতের গ্রহণযোগ্যতা অর্জন করতে পারেননি তার উত্তরসূরী হোসনি মোবারক।

সাদাতকে মনে করা হত মধ্যপ্রাচ্যের আদর্শ এবং সংবাদের মূল উৎস। একই ঘটনা ঘটে ইরানের পাহলভী শাসনামলেও। বার্কলের পণ্ডিত হামিদ আলগারের অসাধারণ বিশ্লেষণাত্মক নিবন্ধ প্রকাশিত হওয়ার পরও ইরানের রাজনৈতিক ও ধর্মীয় বিরুদ্ধ মতের ব্যাপারে কান দেয়নি কেউ[১২]। মধ্যপ্রাচ্যে সক্রিয় চলমান ভাবাদর্শিক মতানৈক্য সকলের অগোচরে গুরুত্বহীন থেকে যায় দীর্ঘদিন। এ দিকটা কখনো তুলে ধরেনি প্রচার মাধ্যম। এর অন্যান্য কারণও আছে। যেমন, একটা কারণ হল মধ্যপ্রাচ্যের স্পর্শকাতর আভ্যন্তরীণ কিছু ব্যাপার। ওয়াটারগেট কেলেঙ্কারীর পর দীর্ঘদিন ধরে মধ্যপ্রাচ্যে যুক্তরাষ্ট্রের তৎপরতা সম্পর্কে কিছুই জানা যায় নাই, কেবল ইরানের ঘটনা ছাড়া। ইরানে বহুসংখ্যক আমেরিকান তো অবৈধভাবে যুক্ত ছিলই, অনেক ইহুদিও ছিল। SAVAK প্রতিষ্ঠিত হয় ইসরাইলী গোয়েন্দা সংস্থা মোসাডের প্রত্যক্ষ সহযোগিতায়। অনেক ব্যাপারে সহযোগিতা করেছে সিআইএ ও এফবিআইও[১৩]। ইরানে ইসরাইলের কীর্তি সম্পর্কে কিছু উন্মোচক নিবন্ধ লেখেন উরি লুব্রানিসহ আরো কয়েকজন; বিপ্লবের পূর্বে ইরান-ইসরাইল লেনদেনে যুক্ত ছিলেন লুব্রানিরা। এসবের কিছুই ছাপা হয়নি মার্কিন প্রচার মাধ্যমে; কারণ তা ক্ষুন্ন করতে পারে ইসরাইলের গণতান্ত্রিক ভাবমূর্তি। একই কারণে ইরান-কন্ট্রা কেলেঙ্কারীতে ইসরাইলের জড়িত থাকার ব্যাপারটিও ধামাচাপা দেয়া হয়। সৌদী আরব ও কুয়েতের মত সুস্থির দেশগুলোর পরিস্থিতি সম্পর্কেও কোনো সংবাদ ছাপা হয় না; মাঝে মধ্যে কেবল সৌদী আরবের দুর্বলতার প্রসঙ্গ আসে। দুনিয়ার বড় বড় সংবাদ সংস্থা ও পত্রপত্রিকার মধ্যে কেবল সিবিএস-এর এড ব্রাডলি ১৯৭৯ সালের নভেম্বরের ২৪ তারিখে লিখেন মক্কায় মসজিদ দখলের ঘটনা সম্পর্কে সমস্ত খবর সরবরাহ করে সৌদি সরকার। *খ্রিস্টিয়ান সায়েন্স মনিটরের* হেলেন কোভান বৈরুত থেকে নভেম্বরের ৩০ তারিখে পাঠানো রিপোর্টে মন্তব্য করেন যে, মসজিদ দখলের ঘটনার একটি নিশ্চিত *রাজনৈতিক* অর্থ আছে। আক্রমণকারীরা ধর্মোন্মাদ মুসলমান নয়, বরং ইসলামী ও ধর্ম-নিরপেক্ষ কর্মসূচী নিয়ে গড়ে ওঠা একটি রাজনৈতিক নেটওয়ার্কের অংশ, সৌদী রাজপরিবার কর্তৃক অর্থ-সম্পদ ও ক্ষমতার একক কর্তৃত্বের বিরুদ্ধে পরিচালিত। বিগত বছরগুলোতে এই নেটওয়ার্ক যথেষ্ট

www.pathagar.com

বিস্তৃতি লাভ করে। ১৯৯৫ সালের শেষে ও ১৯৯৬ সালের গ্রীষ্মে রিয়াদে ও খোবানে বোমা বিস্ফোরণ তার প্রমাণ। এর কয়েক সপ্তাহ পরই নিখোঁজ হয়ে যায় কোবানের তথ্যের উৎস বৈরুতে বসবাসকারী সৌদী নাগরিক লোকটি। ধারণা করা হয় এ কাজ সৌদী গোয়েন্দা সংস্থার।

আফগানিস্তানে দখলাভিযানের পর আমরা হয়তো ভালো মুসলমান ও খারাপ মুসলমানের মধ্যে আরো নাটকীয় পার্থক্য দেখতে পাব, ভালো মুসলমানদের কৃতিত্বের প্রশংসা শুনব : যেমন, হোসনি মোবারক ও বেনজির ভুট্টোর, ইয়াসির আরাফাতের হামাস-বিরোধী নিরাপত্তাবাহিনীর, দেখব ভালো ইসলামের সাথে জড়িয়ে দেয়া হচ্ছে সংযম এবং সম্ভব হলে স্বাধীনতা ও গণতন্ত্র; এই স্বাধীনতা ও গণতন্ত্রের অর্থ হল মুক্তবাজার অর্থনীতি, কিন্তু সৌদী আরব, কুয়েত, মিশর বা জর্ডানের মত দেশে আরো বর্ধিত মানবাধিকার নয়। কিছু লোক আফগানিস্তানে সোভিয়েত-বিরোধী সংগ্রামের সাথে ফিলিস্তিনের ইসরাইল-বিরোধী যুদ্ধের তুলনা করেন। এ মন্তব্য করেন জর্ডানের বাদশা হোসেন, ১৯৮০ সালে জুনের ২২ তারিখে *মীট দি প্রেস* অনুষ্ঠানে। সৌদী আরবের ক্ষেত্রে দেখা যায়, সে দেশে বিপুল পরিমাণ মার্কিন বিনিয়োগের বিষয়টি ইসরাইলের সমর্থক আমেরিকানদের চোখে পড়ে (বিস্ময়কর নয় মোটেও), ওরা মনে করে মার্কিন সহায়তা ইসরাইল থেকে সৌদী আরবের দিকে সরে যাওয়া অনুচিত।

এরই একটা দৃষ্টান্ত ১৯৭৯ সালের ২২শে ডিসেম্বরের *নিউ রিপাবলিকে* পিটার লুবিনের নিবন্ধ "হোয়াট উই ডু নট নো এ্যাবাউট সৌদী অ্যারাবিয়া"। গালফের তেল-সমৃদ্ধ রাষ্ট্রগুলোর ব্যাপারে এতদিন ধরে বিশ্ববিদ্যালয়ে যা পড়ানো বা লেখা হয়েছে তা হয় স্রেফ প্রচারণা না হয় অজ্ঞতা হিসেবে বাতিল করে দেয়ার পক্ষে অতিরঞ্জিত কিন্তু যৌক্তিক বক্তব্য তুলে ধরেন তিনি। কিন্তু ইসরাইল বিষয়ক লেখালেখি কিংবা বিশ্ববিদ্যালয়গুলোয় মধ্যপ্রাচ্য অধ্যয়ন কর্মসূচীতে ইসরাইলের প্রতি স্থূল পক্ষপাতিত্বের বিষয়টিকে তার সমালোচনায় অন্তর্ভুক্ত করতে সক্ষম হননি লুবিন। তিনি ঠিকই বলেন আমাদের তেল-সমৃদ্ধ মিত্র দেশগুলো সম্পর্কে তথ্য প্রদানের কাজে আরো বেশি কিছু জানার আগ্রহ থাকা উচিত সাংবাদিকদের। কিন্তু ইসরাইল সম্পর্কিত লেখায় যাথার্থ্য ও নিরপেক্ষতার জঘন্য অনুপস্থিতির কথাও উল্লেখ করা উচিত ছিল, অথচ তা করেননি লুবিন।

www.pathagar.com

অন্য এক দেশ

জিম্মি সঙ্কটের প্রথম দিকে সবচেয়ে উদ্বেগজনক কয়েকটা মাস ধরে প্রচার মাধ্যম যেভাবে ইসলাম ও ইরানকে তুলে ধরে সে সম্পর্কে এতক্ষণ যা বললাম তা শেষমেষ দানা বাঁধে কয়েকটি প্রধান প্রধান বিন্দুতে। এ বিন্দুগুলো সুসংগঠিত ও দৃশ্যমান করার সবচেয়ে ভালো কায়দা হচ্ছে ইরান কাহিনীর সামগ্রিক আমেরিকান সংস্করণের সাথে ইউরোপীয় সংস্করণের তুলনা করা। ইউরোপীয় সংস্করণে আছে সঙ্কটের প্রথম সপ্তাহ থেকে ডিসেম্বরের শেষ পর্যন্ত *লা মঁদ*-এ এরিক রোলোর লেখা নিয়মিত প্রতিবেদনগুচ্ছ। জানুয়ারীতে মার্কিন রিপোর্টারদেরকে ইরান ত্যাগ করার নির্দেশ দেয়ার পর কিছুদিন রোলোর রিপোর্ট ছাপে *টাইমস*। অবশ্য মনে রাখা দরকার: রোলো আমেরিকান নন, কোনো ফরাসি জিম্মি ছিল না দূতাবাসে, ইরান কখনো ফরাসি প্রভাবের মধ্যে ছিল না এবং রোলোর লেখা হিসেবের বাইরে রাখলে বলা যায়, বিদেশ সম্পর্কে রিপোর্টিং-প্রতিবেদনের কাজে ফরাসিরা তাদের মার্কিন প্রতিপক্ষের চেয়ে খুব একটা ভালো নয়। তবে বিস্ময়কর বিপুল রিপোর্টের মধ্যে কিছু মূল্যবান লেখাও প্রকাশিত হয়, যেগুলো ছিল মূলত সামগ্রিক মতৈক্যের বিপরীত স্রোতের। যেমন *লস এঞ্জেলস টাইমস* ও *বোস্টন গ্লোবের* কিছু নিবন্ধ, ইরানী বাস্তবতাকে গুরুত্বের সাথে গ্রহণের জন্য চাপ দেয়ার উদ্দেশ্যে লিখিত কিছু কাল্পনিক প্রতিবেদন (ডিসেম্বরের ৯ তারিখে *আটলান্টা কনস্টিটিউশনে* রিচার্ড ফক এবং জানুয়ারীর ১৪ তারিখে *নিউজ উইকে* রজার ফিশারের লেখা), দেশটির রাজনৈতিক পরিস্থিতি সম্পর্কে চমৎকার কিছু বিশ্লেষণ (*লস এঞ্জেলস টাইমসে* ডয়েল ম্যাকমেনাস ও *নিউইয়র্ক টাইমসে* কিফনারের লেখা)। সঙ্কটকালে সর্বত্র প্রতিষ্ঠিত সঙ্কীর্ণ দেশপ্রেমমূলক অবস্থানের বাইরে কিছু দেখার ও বোঝার চেষ্টা করেন এইসব নিবন্ধের লেখকেরা। আমেরিকানদের "ইরান সাক" "নুক ইরান" বোতাম পরার মধ্যে প্রতিফলিত চরম জাতীয়তাবাদী মনোবৃত্তির ব্যাপারটি নিয়ে জবরদস্ত নিবন্ধ লেখা হয় *ইনকোয়েরি* মাগাজিনে (ডিসেম্বরের ২৪ ও জানুয়ারী ৭-২১)। ডিসেম্বরের ২২ তারিখে *দি ন্যাশনে* ফ্রেড জে. কুক তার নিবন্ধে বর্ণনা করেন ইরানের ঘটনা তদন্তের জন্য ১৯৬৫ সালে গঠিত কংগ্রেশনাল তদন্ত কমিটির কাজ কেন থেমে যায় এবং কেনই বা এখন তদন্ত পুনরায় শুরু করা যাচ্ছে না, যদিও এ তদন্ত অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক ও জরুরী। তেমনি, ইরানের মিত্র লেবানীজ গেরিলাদের দ্বারা আটককৃত মার্কিন জিম্মিদের ছাড়ানোর জন্য ১৯৮৬ সালে কিভাবে ম্যাক ফারলন ও অলিভার নর্থ ইরানীদের সাথে আলোচনার মাধ্যমে মার্কিন অস্ত্রের অবৈধ চালান পাঠায়।

www.pathagar.com

রোলোর অন্তর্দৃষ্টি ও চমৎকার উপলব্ধি আমেরিকান রিপোর্টে দুর্লভ। মার্কিন রিপোর্টের পাশাপাশি রোলোর রিপোর্টিং সম্পর্কে পরিষ্কার কথা বলতে চাইলে বলতে হয়, এ ইরান মার্কিন প্রচার মাধ্যম কর্তৃক চিত্রিত ইরান নয়, বুঝি অন্য এক দেশ। ইরান তখনো বৈপ্লবিক পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে চলমান এবং সরকারবিহীন অবস্থায় নতুন প্রতিষ্ঠান, প্রক্রিয়া ও বাস্তবতা প্রতিষ্ঠার দিকে এগিয়ে যাচ্ছে; এ ব্যাপারটি সম্পর্কে বরাবরই সচেতন ছিলেন রোলো। কাজেই মার্কিন দূতাবাস দখলের ঘটনাকে বিচ্ছিন্নভাবে না দেখে দেখতে হবে ঐ পরিস্থিতির অংশ হিসেবে। মতাদর্শিক সাধারণীকরণ ও রহস্যময়তা সৃষ্টির বদলে রাজনীতি, সমাজ ও ইতিহাসের আলোকে ঘটনার বিশ্লেষণ সাংবাদিকের অধিকার-সংশ্লিষ্ট দায়িত্ব বলে মনে করেন রোলো। সাংবিধানিক রেফারেন্ডাম বা অন্য কিছু নিয়ে কথা বলেন না মার্কিন সাংবাদিকদল। বেহেশতি, বনিসদর, বজেরগান, ঘোতবজাদেহর মধ্যে মতাদর্শিক সংঘাত কিংবা ক্ষমতার জন্য বিভিন্ন দল, মতাদর্শ ও প্রতিষ্ঠানের লড়াইয়ের দিকটা বিশ্লেষিত হয়নি বললেই চলে। বিপ্লবের একযুগ পর এখন পর্যন্তও কোনো মার্কিন সাংবাদিক স্বীকারও করেনি যে, ঐ সময় জিম্মিদের মুক্তির ব্যাপার ছাড়াও ইরানের রাজনৈতিক পরিস্থিতিও গুরুত্বপূর্ণ বিশ্লেষণযোগ্য বিষয় ছিল। ১৯৭৯ সালের ডিসেম্বরের ৫ তারিখে দূতাবাসের ছাত্রদের সাথে দেখা করতে যান বনিসদর। গুরুত্বপূর্ণ এই ঘটনাটিও মার্কিন প্রচার মাধ্যমে প্রচারিত হয়নি। যথারীতি এর সকল কিছুই উঠে এসেছে এরিক রোলোর লেখায়।

এর চেয়ে জরুরী আরেকটি ব্যাপার হল রোলো আগাম বুঝতে পেরেছিলেন সঙ্কটে সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন ব্যক্তিত্ব ও মতধারার হয়তো উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রয়েছে। কেবল রোলোর রিপোর্টেই বোঝা যায় রেপ্রেজেন্টিটিভ হ্যানসেনের সফর ফলপ্রসূ হয়েছিল। তিনি ১৯৭৯ সালের ২৪শে নভেম্বর প্রমাণসহ মন্তব্য করেন যে, ইরানীদের সাথে আলোচনায় হ্যানসেনের সাফল্য অঙ্কুরে শুকিয়ে যেতে দিচ্ছে হোয়াইট হাউস ও প্রচার মাধ্যম; তেমনি মার্কিন-ইরান ব্যাংকিং লেনদেনের ব্যাপারে কংগ্রেশনাল তদন্তের (বদলে জিম্মিদের মুক্তির ব্যাপারে ইরানীদের দাবী) ফুঁ দিয়ে উড়িয়ে দেয় হোয়াইট হাউস। সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী বামপন্থী বনিসদর এবং রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক দিক দিয়ে রক্ষণশীল ঘোতবজাদেহ্‌র পারস্পরিক সংঘাতের খুঁটিনাটি বর্ণিত হয় রোলোর লেখায়; তেমনি গুরুত্ব লাভ করে জিম্মিদের ব্যাপারে উভয়ের মনোভাবও (বনিসদর বিষয়টি মিটিয়ে ফেলার, ঘোতবজাদেহ আরো ছড়িয়ে দেয়ার পক্ষে)।

আরেকটা ব্যাপার আন্দাজ করা যায়। যুক্তরাষ্ট্র ঘোতবজাদেহ্‌র সাথে আলোচনায় আগ্রহ দেখায়, অন্যদিকে, পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব থেকে বনিসদরের অব্যাহতি চায় (তাকে গুরুত্ব না দিয়ে, তার প্রস্তাবগুলো হেসে উড়িয়ে দিয়ে, তাকে ক্ষ্যাপাটে মানুষ অভিহিত করার মধ্য দিয়ে)। প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে সামান্য ব্যবধানে বনিসদর জয়লাভ করেন। ইরানের প্রতি যুক্তরাষ্ট্রের ভবিষ্যত দৃষ্টিভঙ্গি (এবং কমিউনিস্টদের পরিবর্তে রক্ষণশীলদের সাথে লেনদেনে আগ্রহ) এ সময়ের ঘটনাবলীর জন্য

www.pathagar.com

গুরুত্বপূর্ণ, তেমনি বাজেরগানের পরাজয়ের ব্যাপারেও। আবার, বাজেরগানের পরাজয়ের মূল কারণ এই নয় যে, মার্কিন প্রচার মাধ্যম বাজেরগানকে লিবারেল ডেমোক্র্যাট বলে প্রচার করে, কিংবা এও নয় যে, তিনি আলজিয়ার্সে ব্রেজেনস্কির সাথে হাত মিলিয়েছিলেন। তার পতনের আসল কারণ সরকার কর্তৃক ঘোষিত ইসলামী নীতিমালা বাস্তবায়নে তার অদক্ষতা ও অযোগ্যতা। এ সমস্ত ঘটনাই রোলোর লেখায় আলোচিত হয়। একটি নিবন্ধে তিনি দেখান দূতাবাস দখলের আগে থেকেই যুক্তরাষ্ট্র ইরানের বিরুদ্ধে অর্থনৈতিক যুদ্ধ চালাচ্ছিল (এর সারাংশ ছাপা হয় ১৯৭৯ সালের ডিসেম্বরের ২ তারিখে *ম্যানচেস্টার গার্ডিয়ানে*); এরই একটি বিদ্বেষসূচক দিক হল এতে নেতৃস্থানীয় ভূমিকা পালন করে চেজ ম্যানহাটন ব্যাংক।

এরিক রোলো যে এমন ভূমিকা পালন করতে পারেন তার একটা কারণ তিনি একজন সক্ষম সাংবাদিক, আরেকটা কারণ মধ্যপ্রাচ্য সম্পর্কে তার দীর্ঘ অভিজ্ঞতা, এছাড়া আরো একটা কারণ হলো মার্কিন সাংবাদিকদের মতো তার মনেও কাজ করেছে নিজদেশের পাঠকদের রুচির বিষয়টি। যেনতেন একটা ফরাসি পত্রিকা নয় *লা মঁদ*, এটি রেকর্ড সংরক্ষণের জন্য একটি ফরাসি জার্নাল; ফরাসি স্বার্থবোধের সাথে সঙ্গতিপূর্ণভাবে গোটা বিশ্বের জন্য একটা প্রতিনিধিত্বশীল অবস্থানে নিজেকে ভাবে এ পত্রিকা। এ জন্য *নিউইয়র্ক টাইমস* বা অন্যান্য পত্রিকার তুলনায় রোলোর ইরান অন্য রকম। ফরাসি দৃষ্টিভঙ্গি হল বিকল্প এক দৃষ্টিভঙ্গি, ইউরোপের অন্যান্য দেশের বা যুক্তরাষ্ট্রের মতো নয়। কারণ প্রাচ্যের প্রতি ফরাসি ও রোলোর মনোভাব বেশ পুরোনো এবং অভিজ্ঞতায় ঋুনাঃ নির্মম ক্ষমতার পরিবর্তে কৌশল ও প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে যেতে ইচ্ছুক; বিচ্ছিন্ন প্রশাসনের বগলের তলায় বসে বিশাল বিনিয়োগ করার বদলে স্বার্থ ফলিয়ে তুলতে আগ্রহী। যৌথ ফরাসি মনোভাবের ধারক *লা মঁদ* ফরাসি বুর্জোয়াদের পত্রিকা, অন্তত তৃতীয় বিশ্ব তা-ই মনে করে। এ পত্রিকা যে রাজনীতি অভিব্যক্ত করে তা মিশনারী ধরনের, যাজক-সদৃশ, অভিভাবকসুলভ—"অন্তরে সমাজতন্ত্র" ও আঠারো শতকের এনলাইটেনমেন্টের দৃষ্টি নিয়ে প্রগতিশীলভাবে ক্যাথলিক (১৯৮০ সালে মে'র ১৩ তারিখের *ক্রিস্টিয়ান সায়েন্স মনিটরে* লুই উইৎজার এবং জুন ৩০ তারিখের *নিউইয়র্কারে* জেন ক্রেমার)।[১৪]

নিউইয়র্ক টাইমস যেখানে সঙ্কট ও সংবাদের প্রচারযোগ্যতার ওপর গুরুত্ব দেয় সেখানে *লা মঁদ* চায় বিদেশে যা ঘটছে তার একটা বস্তুনিষ্ট বিবরণ সংরক্ষণ। *টাইমসে* মতামত ও ঘটনার ফারাক রাখা হয় না বললেই চলে। *লা মঁদ* তার রিপোর্টে বস্তুনিষ্ঠ জাগতিকতাকে গুরুত্ব দেয়, *টাইমস* গুরুত্ব দেয় তার নিজস্ব কিছু নির্বাচিত সচেতনতার ওপর।

১৯৭৯ সালের ডিসেম্বরের ২ ও ৩ তারিখে যে রিপোর্ট করেন এরিক রোলো তা বিবেচনা করা যাক। রোলো শুরু করেন এই বলে যে, ইরানে সাংবিধানিক পরিষদ ও সংবিধানের অগণতান্ত্রিকতা নিয়ে গত তিন মাস ধরে তীব্র, খোলাখুলি ও সম্প্রচারিত বিতর্ক চলছে (এর প্রায় কিছুই পাওয়া যায়নি মার্কিন রিপোর্টে)। এর পর তিনি উল্লেখ করেন খোমেনি ও বিরোধী শক্তির সংঘাতের কথা, এবং মন্তব্য করেন খোমেনির

www.pathagar.com

"ইসলামী শক্তি" একটি বহুদলীয় সমাবেশ যা সমাজ ও শাসনকাঠামোর বিভিন্ন স্তরে ছড়ানো; এবং বলেন যে, কেবল "খুঁতখুতেরকম আইনী মানুষ" খোমেনির পক্ষেই সম্ভব "স্থায়ী বিপ্লবের" কথা মনে রেখে এইসব বিচিত্র শক্তিকে একমুখি করে ধরে রাখা। এ ছাড়া, সবগুলো দলের অবস্থান ব্যাখ্যা করে রোলো দেখান সংবিধানে কিছু অসঙ্গতি আছে: যেমন মেয়েরা এখন আর যৌন-আনন্দ লাভের বস্তু নয়, কিন্তু তাদের অধিকার স্পষ্ট করা হয়নি; কমিউনিস্ট সংগঠন হিসেবে সমবায় নিষিদ্ধ অথচ শ্রমিক পরিষদ কর্তৃক আর্থিক জীবনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালনের সুযোগ রয়েছে; সব নাগরিকের সমান অধিকার অথচ শিয়া ইসলাম রাষ্ট্রধর্ম। এসব বিবেচনায় রেখে তিনি লেখেন :

> বিস্তৃত আলোচনাযোগ্য এ সংবিধান অবিলম্বে গ্রহণ করে নেয়া অনিবার্য হয়ে দাঁড়িয়েছে ইমাম খোমেনির জন্য। অনেকে তাকে পরামর্শ দিয়েছেন যুক্তরাষ্ট্রের সাথে শক্তি পরীক্ষার আগ পর্যন্ত রেফারেন্ডাম স্থগিত রাখার জন্য। তারা বলছেন বিপ্লবের মধ্যে একটি দেশে দীর্ঘদিন অন্তবর্তী সরকার থাকতেই পারে। কিন্তু ঐসব পরামর্শ দূরে সরিয়ে রেখেছেন ইমাম সাহেব।
>
> যারা তাকে ভালো করে জানে না তাদের মনে হতে পারে কুম-এর অভিভাবক এই ব্যক্তিত্ব "খুঁতখুঁতে আইনী মানুষ"। তিনি জোর দিয়েই বলেন তার ক্ষমতা নির্ভর করে আইনী ভিত্তির ওপর। গত কয়েক সপ্তাহে অর্জিত পাহাড় পরিমাণ জনপ্রিয়তা তাকে এনে দিয়েছে প্রকাশ্য সন্তোষ। ভবিষ্যতে এই জনপ্রিয়তার বিচিত্রমুখি প্রসার নির্ভর করবে বর্তমানে অগ্রসর "দ্বিতীয় বিপ্লব" থেকে উৎসারিত বিভিন্ন শক্তির ভারসাম্যের ওপর, সংবিধানের লেখার ওপর নয়।

এখানে ঘটনার প্রকাশ্য বিচারে অবতীর্ণ হননি রোলো (এর সঙ্গে তুলনা করা যায় *লস এঞ্জেলস টাইমসে* ডন সানচির কৃত্রিম বিশ্লেষণের)। তিনি বরং ক্ষমতা ও প্রত্যক্ষ উপস্থিতি, রচনা ও পাঠক, ব্যক্তি ও দলের মধ্যে পৃথকীকরণের বিষয়টি দেখিয়েছেন এগুলোকে একটা টগবগে আধারের যথাযথ স্থানে চিহ্নিত করা মধ্য দিয়ে। তিনি আসলে প্রক্রিয়াটির সাথে এর জোরদার বিন্দুসমূহ এবং সংঘাতগুলো সম্পর্কে একটা ধারণা দেয়ার চেষ্টা করেছেন।

লা মঁদ থেকে অবসর গ্রহণের পর ফ্রঁসোয়া মিতেরা এরিক রোলোকে পর্যায়ক্রমে তিউনিসিয়া, আরবলীগ ও পিএলও'তে ফরাসি রাষ্ট্রদূত নিয়োগ করেন। ১৯৮৯ থেকে ৯১ সাল পর্যন্ত আবার তুরস্কে রাষ্ট্রদূতের দায়িত্ব পালন করেন তিনি। পুরোপুরি অবসর গ্রহণের পর ১৯৯৫ সালে ইরান সফর করে একটি নিবন্ধ লেখেন রোলো (মে, ১৯৯৫-এর *লা মঁদ ডিপলোম্যাটিকে*)। এটি খোমেনির মৃত্যুপরবর্তী ইরানী সমাজে সূচিত জটিল সব পরিবর্তনের ম্যাজেষ্ট্রিয়াল জরীপের মত। যুক্তরাষ্ট্রের মূলধারার প্রচার মাধ্যমে যেসব বিষয়ে কখনো লেখা হয় না, সেগুলো সম্পর্কেই লেখেন রোলো; যেমন, পবিত্র গ্রন্থসমূহের প্রচার, তাফসীর ও প্রাপ্যতার ওপর কম্পিউটার ও ইন্টারনেটের প্রভাব। তার লেখা থেকে জানা যায় বর্তমান ইরানে নারী-স্বাধীনতার পক্ষে কাজ করছে ৬০টির মতো সংগঠন, যার সদস্যরা সুশিক্ষিত। এসব সংগঠনসহ বিপুলসংখ্যক ধর্ম-প্রচারক,

www.pathagar.com

চলচ্চিত্র নির্মাতা, পণ্ডিতবর্গ ও স্বাধীন মনোভাবাপন্ন মোল্লারা এখনো বিলায়েত-ই-ফকীহ্ বা কাউন্সিলের প্রশাসনের বিরোধিতা করে যাচ্ছে। সবমিলিয়ে তিনি ইরান সম্পর্কে এমন একটি টগবগে ফুটন্ত ইসলামী রাষ্ট্রের ধারণা দেন যা, দুএকটি প্রতিবেশী দেশ বাদে, সকল আরব রাষ্ট্রের মধ্যে সবচেয়ে গণতান্ত্রিক। যুক্তরাষ্ট্রের প্রচার মাধ্যম এখনো "শয়তান ইরান"-এর যে ভাবমূর্তি চালু রেখেছে, রোলোর ইরান সর্বোতোভাবে তার বিপরীতে বিকাশমান।

মোট কথা ইরান সম্পর্কে এরিক রোলোর রিপোর্টিং সবচেয়ে ভালো অর্থে 'রাজনৈতিক', মার্কিন রিপোর্টিং অ-রাজনৈতিক বা খারাপ অর্থে রাজনৈতিক। "ইসলামী" মার্কাটা যেন আমেরিকানদের কাছে অদ্ভূত এক জিনিষ। জীর্ণ উক্তি, কেরিকেচার, অজ্ঞতা, প্রমাণহীন বর্ণকেন্দ্রিকতা—এসবই যেন "ব্ল্যাকমেইল করতে দেব না", জিম্মিদের ছাড়া হবে কি হবে না, ইত্যাদি সরকারী নীতির অন্ধ অনুকরণ। পরিস্থিতি সম্পর্কে এমনভাবে নির্বিচার সিদ্ধান্ত ঘোষণা করা হয়ে যায় যেন ইরানী বিপ্লবের ধারাবাহিক কোনো প্রভাব পড়ে নাই ইরানীদের জীবনে। বলা হয়ে থাকে যুক্তরাষ্ট্র শাহ্কে ক্ষমা করে দিল কি না তা ইরানীদের (বা তাদের ইতিহাসের) বক্তব্যের সাথে প্রাসঙ্গিক নয়। এ সময়ই আই. এফ স্টোন সাহসের সাথে বলেন, "ইরানের কাছে মাফ চাওয়া উচিত যুক্তরাষ্ট্রের। কারণ ১৯৫৩ সালে আমাদের দ্বারা শাহ্কে ক্ষমতায় বসানোর ঘটনা ইরানীদের জন্য প্রাচীন ইতিহাস নয়, হয়তো আমাদের জন্যও নয়" (*ভিলেজ ভয়েস, ফেব্রুয়ারী ২৫, ১৯৮০*)।

১৯৭৯ সালের সেই সময়টায় এমন বাজেভাবে এবং বিদ্বেষের সাথে ইরান সম্পর্কে রিপোর্ট করা হত যে, আমার এখন সন্দেহ হয় হয়তো এ কারণে জিম্মি সঙ্কট সমাধানের অনেকগুলো সুযোগ নষ্ট হয়ে যায়। এজন্যই ইরান মন্তব্য করে যে, খুব কম রিপোর্টই উত্তেজনা প্রশমিত করে শান্তিপূর্ণ পরিস্থিতি সৃষ্টি করতে পারে। প্রচার মাধ্যমের ব্যর্থতার সবচেয়ে গুরুতর দিক এই যে, তা এ সময়ের জরুরী আন্তর্জাতিক পরিবর্তনগুলোর ব্যাপারে স্বাধীন দায়িত্ব পালন করতে পারে নাই। ১৯৮০ ও ৯০-এর দশকে আমরা এমন এক যুগে প্রবেশ করি যাকে যুক্তরাষ্ট্র বনাম সোভিয়েত ইউনিয়ন ও তার অনুসরণে পশ্চিম বনাম ইসলাম... "আমরা" বনাম "ওরা" জাতীয় বিরোধাত্মক জোড়ে প্রকাশ করা অসম্ভব, যদি না আমরা বুঝতে পারি যে, এর মধ্য দিয়েই দুই পরাশক্তি পৃথিবীকে ধ্বংসের দিকে নিয়ে যাবে। উল্লেখ্য যে, সেই বিপরীত জোড়ে প্রচার মাধ্যমের অবস্থান আবার বরাবরই "ভালো" পক্ষটিতে।

এ সত্ত্বেও নিরপেক্ষতার কিছুটা আভাস পাওয়া যায় ১৯৮০ সালে। এ সময় ইরানে যুক্তরাষ্ট্রের ভূমিকা সম্পর্কে তদন্তমুখি কিছু প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়েছে প্রচার মাধ্যমে। যেমন সিবিএস-এর ষাট মিনিটের দুইটা শো, *নিউইয়র্ক টাইমস* ও *ওয়াশিংটন পোস্ট* (যথাক্রমে মার্চ ৬ ও ৭ তারিখে) ও অন্যান্য পত্রিকায় প্রশ্নমুখর লেখালেখি আসতে থাকে। স্বীকার করে নেয়া হয় যে, ইরানের ব্যাপারে অনেকেরই ভিন্নমত থাকতে পারে। পাঠকরাও (চিঠিপত্রের মাধ্যমে) প্রতিবাদ করে যে ইরানের ব্যাপারে তাদেরকে

www.pathagar.com

পুরো ঘটনা বলা হচ্ছে না। অবশ্য *নিউ রিপাবলিকের* মতো রক্ষণশীল পত্রিকা ইসলাম সম্পর্কে ভুল ধারণা ছড়ানো অব্যাহত রাখে। তেহরানে অনুষ্ঠিত "ক্রাইমস অব আমেরিকা" সম্মেলনে অংশগ্রহণ করেন রামসে ক্লার্ক। ফিরে আসার পর এবিসি তার একটি সাক্ষাৎকার নেয় *ইস্যুজ এণ্ড অ্যানসার* প্রোগামে। তাদের প্রশ্নগুলো ছিল যথেষ্ট বিদ্বেষপূর্ণ; ওগুলো সরকারের এই বক্তব্যেরই নিরীহ সমর্থক যে, ঐ সম্মেলনে যোগ দিয়ে বিশ্বাসঘাতকতার কাজ করেছেন ক্লার্ক।[১৫]

মাঝে মাঝে জন কিফনারের লেখা (*নিউইয়র্ক টাইমস, মে ২৯, ৩১, জুন ১, ১৯৮০*) ও শাউল বাখাশের নিবন্ধ (*নিউইয়র্ক রিভিউ অব বুকস*, জুন ২৬, ১৯৮০) থেকে বোঝা যায় বিপ্লব তখনো অব্যাহত রয়েছে, কেবল ধারণাগত বা অভিজ্ঞতাভিত্তিক দৃষ্টিকোণ থেকে সেই বিপ্লবের সামগ্রিক শক্তি উপলব্ধি করা অসম্ভব। কিন্তু আমার সন্দেহ নেই জিম্মিরা মুক্তি পেয়ে গেলে এ ধরনের লেখাও লেখা হত না। জিম্মি সঙ্কটের কারণেই আমেরিকানরা ধাক্কা খেয়ে বুঝতে পারে অনেক ব্যাপারে সচেতনতার অভাব আছে তাদের। এশিয়ার প্রায়-বিস্মিত উপনিবেশ ইরান হঠাৎ পরিণত হয় যুক্তরাষ্ট্রে আত্ম-বিশ্লেষণের উপলক্ষে। ইরানের উদ্বেগজনক, অদম্য পরিস্থিতি প্রচার মাধ্যমকে তার একমুখি মনোভাব পরিশোধনে বাধ্য করে আরো জটিল, ব্যবহার উপযোগী দৃষ্টিকোণের দিকে নিয়ে যায়। আমেরিকানরা নিজেদের সম্পর্কে যা জানত, তার চেয়ে আরো বেশি জানার সুযোগ পায় জিম্মি সঙ্কটের মধ্য দিয়ে। এখন অনেক বেশি আমেরিকান জানে ক্ষমতার লড়াইয়ের অর্থ কী (আগে যারা বুঝত না খোমেনির সাথে বনিসদর ও বেহেশতির সংঘাতের মানে কী)। ইরানের গণ-অভ্যুত্থানের ওপর আমাদের নিজস্ব শৃঙ্খলা বা ইরান-ইরাক যুদ্ধ চাপিয়ে দেয়ার চেষ্টার ব্যর্থ ফলাফলের বিষয়টি এখন অনেক আমেরিকান মানুষই স্বীকার করে নিয়েছে। তবু অনেক প্রশ্নেরই জবাব পাওয়া যায়নি। যেমন বেহেশতীর উত্থানের অনুকূল পরিবেশ, ডান ও বামপন্থীদের লড়াইয়ের ধরন, ইরানের অর্থনৈতিক পরিস্থিতি; এ ছাড়া অনেক ফলাফলও এখনো ফলে উঠতে বাকী।[১৬]

যা তদন্ত করা হয়নি তা হচ্ছে সঙ্কটের তলবর্তী বিষয়টি; এখন ঐ দিকটা সামনে রেখেই এগুবো আমরা। ইরান কেন একটা বিশেষ ব্যাপার কিংবা ইসলাম কেন গুরুত্বপূর্ণ, এবং উভয়ের সম্পর্কে কোন জ্ঞান বা প্রচার দরকার আমাদের? এই ত্রিপক্ষীয় প্রশ্নটি বিমূর্ত নয়। একে কেবল সাম্প্রতিক রাজনীতির সাথে সম্পর্কিত না দেখে দেখা উচিত অন্য সংস্কৃতিবিষয়ক জ্ঞানের সাথে সম্পর্কিত পণ্ডিতি প্রয়াস ও তাফসীরী তৎপরতা রূপে। কিন্তু জ্ঞান ও ক্ষমতার সম্পর্কের ব্যাপারে আমাদের দৃষ্টি মোহমুক্ত না হলে আমরা আসল বিন্দুটাকেই পাশ কাটিয়ে যাব। এ অবস্থান হতে সেই বিন্দুটার দ্বারাই আমাদের অনুসন্ধানের হাতেখড়ি হওয়া উচিত।

www.pathagar.com

তৃতীয় অধ্যায়
জ্ঞান ও ক্ষমতা

www.pathagar.com

www.pathagar.com

ইসলাম বিষয়ে তাফসীরের রাজনীতি : রক্ষণশীল ও বিরোধী জ্ঞান

"ইসলাম" ও "পশ্চিম" এখন শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানে নেই; অশান্তি চলছে নিজেদের মধ্যেও। এ পরিস্থিতিতে এ ধরনের জিজ্ঞাসা অর্থহীন মনে হতে পারে যে, অন্য সংস্কৃতি সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন আসলেই কি সম্ভব। জ্ঞানের জন্য প্রয়োজন হলে সুদূর চীনেও যাবে—এমন একটা নীতিশিক্ষা আছে ইসলামে। আর পশ্চিমে অন্তত গ্রীকদের সময় থেকে সাধারণ রীতি হচ্ছে এমন দাবী করা যে, মানবীয় ও প্রাকৃতিক যা কিছু আছে তাতে যদি জ্ঞান থাকে তবে সেই জ্ঞানের খোঁজ করতে হবে। কিন্তু খোদ পশ্চিমের ভাবুকদের বুঝ মতেই এ ধরনের জ্ঞান-অন্বেষার ফলাফলে খুঁত রয়ে গেছে। বেকনের *এডভান্সমেন্ট অব লার্নিং*-এর কথা বিবেচনা করা যাক; ধরে নেয়া হয় এ গ্রন্থটিই পশ্চিমে সবচেয়ে আগ্রহব্যঞ্জক, আত্মোৎসাহী রীতির আধুনিক ভাবনার সূচনাকারী। অথচ জ্ঞানার্জনের পথে নানা বাধা (প্রতিমূর্তি) আদৌ দূর করা সম্ভব কি না সে ব্যাপারে সবরকম সন্দেহ প্রকাশ পেয়েছে এই বইয়েও। বেকনের শিষ্য, শ্রদ্ধেয় ভিকো তো পরিষ্কার বলেছেন জ্ঞান হল তা-ই মানুষ নিজে যা বানায়; সুতরাং বইয়ের বাস্তবতা আসলে "মানব মনের পরিশোধন" ছাড়া আর কিছুই না[১]। নিটশের পর দূর ও অচেনা'র ব্যাপারে জ্ঞানার্জনের সম্ভাবনা আরো কমে যায় ।

সন্দেহগ্রস্ত ও নৈরাশ্যবাদী এই স্রোতের বিপরীতে পশ্চিমে ইসলামের শিক্ষার্থীরা (এবং ইসলামী বিশ্বে পশ্চিমের শিক্ষার্থীরা—যদিও তাদের সম্পর্কে আলোচনা করছি না) সচরাচর অস্বস্তিকর আশাবাদী ও আত্মবিশ্বাসী। ইউরোপে প্রথমদিকের আধুনিক প্রাচ্যতাত্ত্বিকরা নিশ্চিত ছিলেন যে, প্রাচ্যবিষয়ক অধ্যয়নই বৈশ্বিক জ্ঞানার্জনের সদর রাস্তা। ইসলামী বিশ্ব এই প্রাচ্যেরই অংশ। এসব প্রাচ্যতাত্ত্বিকদের একজন ব্যারন ডিকেনস্টাইন ১৮২০-এর দশকে লেখেন :

> কুভিয়ের ও হামবোল্ডট যেমন পৃথিবীর অভ্যন্তরে (প্রকৃতির) সংগঠনের রহস্য আবিষ্কার করেন, তেমনি আবেল রেমুসাত, সেইন্ট মার্টিন, সিলভেস্ত্রা ডি সেসি, বপ, গ্রিম ও এ. ডব্লিউ শ্লেগেল ভাষার শব্দের মধ্যে চিহ্নিত ও আবিষ্কার করেন মানুষের চিন্তার আদিম ভিত্তি ও আন্তরবিন্যাস।[২]

এর কয়েক বছর পরই আর্নেস্ত রেনান "Mahomet et les orgines de l'islamisme" সম্পর্কিত আলোচনার ভূমিকায় মন্তব্য করেন "la science critique" -এর উন্মুক্ত সম্ভাবনার ব্যাপারে। রেনান বলেন ভূবিদ্যা-বিশারদ, ইতিহাসবিদ ও ভাষাবিজ্ঞানীগণ "আদিম" অর্থাৎ প্রকৃত ও মূলে পৌঁছাতে পারেন ধৈর্য ও সূক্ষ্মতার সাথে এগুলোর চিহ্ন

www.pathagar.com

পরীক্ষা করে: বিশেষত ইসলাম মূল্যবান প্রপঞ্চ, কারণ এর জন্ম তুলনামূলকভাবে সাম্প্রতিক ও অ-মৌলিক। কাজেই ইসলাম অধ্যয়ন করার অর্থ এমন কিছু অধ্যয়ন করা যে-সম্পর্কে নিশ্চিত ও বৈজ্ঞানিক জ্ঞান অর্জন সম্ভব।[৩]

হয়তো এমন সন্তোষজনক মনোভাবের কারণেই, ইসলামী প্রাচ্যতত্ত্বের ইতিহাস সন্দেহবাদী স্রোত থেকে তুলনামূলকভাবে মুক্ত, পদ্ধতিগত আত্মজিজ্ঞাসা থেকেও সম্পূর্ণ মুক্ত ছিল, এই কিছুকাল আগ পর্যন্তও। পশ্চিমে ইসলাম বিষয়ের ছাত্ররা মনে করে তাদের কালিক ও স্থানিক সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও ইসলাম সম্পর্কে বিষয়গত জ্ঞান অথবা ইসলামী জীবনের কিছু দিক সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন সম্ভব। অন্যদিকে, ইসলাম আসলে কী সে ব্যাপারে আধুনিক পণ্ডিতদের খুব কমই রেনানের মতো এমন প্রকাশ্য ও উদ্ধত মনোভাব পোষণ করবেন: যেমন, কোনো পেশাজীবি পণ্ডিতই রেনানের মতো প্রকাশ্যে বলবেন না যে, ইসলাম জানার যোগ্য, কারণ তা রুদ্ধ মানবীয় উন্নয়নের মৌলিক নমুনার মতো। এ সত্ত্বেও আমি ইসলাম-বিষয়ক পণ্ডিতদের মধ্যে এমন একজনও পাইনি যার কাছে তার অধীত বিষয়টিই সন্দেহের উৎস। এর কারণ অংশত এই যে, এ বিষয়ক অধ্যয়নের প্রায় দুই শত বছর ধরে প্রজন্মক্রমে হস্তান্তরিত সংঘ-মনোভাব ব্যক্তি পণ্ডিতদেরকে কাজের ক্ষেত্রে নিশ্চয়তা দিয়েছে ও আগলে রেখেছে; যদিও মানববিদ্যার অন্যান্য বহু শাখার পণ্ডিতরা পদ্ধতিগত উদ্ভাবনা ও বিপদের হুমকির মুখে।

এর একটা প্রতিনিধিত্বশীল দৃষ্টান্ত হল *আমেরিকান স্কলারের* ১৯৭৯ সালের গ্রীষ্ম সংখ্যায় প্রকাশিত একটি নিবন্ধ। এর লেখক একজন প্রবীন বৃটিশ প্রাচ্যতাত্ত্বিক, বর্তমানে যুক্তরাষ্ট্রে প্রবাসী। নিবন্ধটি মোটের ওপর স্বাভাবিক বিষয়ে, কোনো মনের অলস, আকর্ষণহীন বিচরণের সৃষ্টি। বুদ্ধিবৃত্তিক বিষয়গুলোর ব্যাপারে তার উদাসীনতা ছাড়াও আরেকটি ব্যাপার অ-বিশেষজ্ঞদের ধাক্কা দেয় : তা হল প্রাচ্যতত্ত্বের অনুমিত সাংস্কৃতিক সিলসিলা। ব্যাপারটি দীর্ঘ উদ্ধৃতির যোগ্য :

> পশ্চিমা বিশ্বে রেনেসাঁস ইসলাম ও মধ্যপ্রাচ্য অধ্যয়নের বিকাশে পুরো একটি নতুন পর্যায় সূচিত করে। নতুন উপাদানগুলোর মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হল বুদ্ধিবৃত্তিক অনুসন্ধিৎসা, যা মানবীয় ইতিহাসে এখনো অনন্য এক ব্যাপার। ঐ কালপর্ব পর্যন্ত কোনো বিচ্ছিন্ন, কম বিদ্বেষপূর্ণ সভ্যতা অধ্যয়ন বা বোঝার আকাঙ্ক্ষা বা চেষ্টা কোনাটাই হয় নাই। অনেক সমাজই তাদের পূর্ব-পুরুষদের ব্যাপারে অধ্যয়নের চেষ্টা করেছে, যাদের থেকে নিজেদের উৎপত্তি হয়েছে বলে মনে করে ওরা। কোনো বিদেশি ও সবল সংস্কৃতির আধিপত্যের অধীন সমাজ, জবরদস্তি বা যে কারণেই হোক, সচরাচর আধিপত্যকারীদের ভাষা শিখতে বাধ্য হয়েছে, তাদের রীতিনীতি বোঝার চেষ্টা করেছে। এসব সমাজ তাদের মালিক-কাম-গুরুদের সম্পর্কেও অধ্যয়ন করেছে। কিন্তু রেনেসাঁসের সময় থেকে পরবর্তীকালে ইউরোপীয় (ও সমুদ্রের ওপারের ইউরোপীয় আত্মজদের) সৃষ্ট ভিন্

www.pathagar.com

> সংস্কৃতির অধ্যয়ন *সম্পূর্ণ ভিন্ন ও নতুন কিছুর প্রতিনিধিত্ব* করে। আজকাল মধ্যপ্রাচ্যের লোকদের মধ্যে পারস্পরিক আগ্রহ সামান্যই, এশিয়া ও অ-ইসলামী সংস্কৃতির প্রতি আগ্রহ আরো কম। এ বিষয়টা গুরুত্ববহ। মধ্যপ্রাচ্যে কেবল তুরস্ক ও ইসরাইলেই বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে চীন ও ভারতের সভ্যতা নিয়ে কিছুটা গবেষণা হয়েছে। এ দুটো দেশই সচেতনভাবে গ্রহণ করেছে পশ্চিমা রীতি।

এ সত্ত্বেও অ-ইউরোপীয় সভ্যতার পক্ষে এ জাতীয় বুদ্ধিবৃত্তিক অনুসন্ধিৎসা বোঝা কঠিন কাজ। মধ্যপ্রাচ্যে যখন প্রথম মিশরবিদ ও অন্যান্য প্রত্নতাত্ত্বিক খনন কাজ শুরু করেন তখন স্থানীয়দের পক্ষে বোঝা সম্ভব হয় না যে, কেবল তাদেরই বিস্মৃত পূর্ব-পুরুষদের ধ্বংসাবশেষ খুঁড়ে তোলা ও পাঠ করার জন্য বিদেশীরা এত সময়, শ্রম ও অর্থ ব্যয় করতে পারে, নানা ঝুঁকি ও কষ্ট স্বীকার করতে পারে। কাজেই ওরা খোঁজ করে আরো যৌক্তিক অন্য কোনো ব্যাখ্যার। স্থানীয়দের মনে হয় প্রত্নতাত্ত্বিকরা মাটির নিচের গুপ্তধনের খোঁজ করছে। মার্জিত শহুরে মানুষেরা মনে করে ওরা তাদের সরকারের গুপ্তচর। কোনো কোনো প্রত্নতাত্ত্বিক গুপ্তচরবৃত্তির সাথে জড়িত ছিলেনও; এর কারণেও তাদের বিজ্ঞান যথেষ্ট ভুল বুঝাবুঝির শিকার হয় এবং মানব জাতির ইতিহাসে এক নয়া অধ্যায়ের সংযোজক এবং মধ্যপ্রাচ্যের জাতিগুলোর আত্ম-সচেতনতার ক্ষেত্রে কিছু নয়া দিগন্ত উন্মোচক প্রয়াসকে বোঝার ক্ষেত্রে দু:খজনক অক্ষমতাই প্রকাশ করে। উপলব্ধির এই জটিলতা রয়ে গেছে আজকের দিনেও। এমনকি কোনো কোনো প্রাতিষ্ঠানিক ব্যক্তিত্বও এর দ্বারা প্রভাবিত; তারা এখনো মনে করেন প্রাচ্যতাত্ত্বিকগণ হয় ধনসম্পদের অনুসন্ধানরত অথবা সাম্রাজ্যবাদের এজেন্ট। ইউরোপের যেসব গুরুত্বপূর্ণ নৌ-অভিযান ইউরোপীয়দেরকে সমুদ্রের ওপারের আশ্চর্য সব নতুন নতুন অঞ্চলে নিয়ে যায়, সেই সকল অভিযান এই নয়াবুদ্ধিবৃত্তিক অনুসন্ধিৎসায় আত্মতুষ্টি অর্জনে সাহায্য করে। এগুলো বুদ্ধিবৃত্তিক ছাঁচ ভাঙ্গার ক্ষেত্রেও সহায়ক হয়, তেমনি সরবরাহ করে আরো অধ্যয়নের জন্য প্রয়োজনীয় উদ্দীপনা ও সুযোগ।[৪]

উদ্ধৃতিটিতে প্রায়-প্রমাণহীন দাবী লক্ষণীয়। বহু প্রাচ্যতাত্ত্বিক, বা রেনেসাঁ থেকে এখন পর্যন্ত বিভিন্ন ঐতিহাসিক, অথবা অগাস্টিন থেকে শুরু করে পরবর্তীকালের তাফসীর বিদ্যার ছাত্ররা যা বলেছেন, এ লেখাটা তার সবকিছুর বিরুদ্ধে চলে যায়। "নয়া ও সম্পূর্ণ ভিন্নরকমের" কাজেই (আনুমানিক) নিখাদ বুদ্ধিবৃত্তিক অনুসন্ধানের কথাটা না হয় বাদ দিলাম, যা আর কেউ কোনো রচনা পাঠের সময় অধিগত করার সৌভাগ্য অর্জন করতে পারেনি; এপরও এ লেখায় এমন বহু কিছু থেকে যায় যা কেবলই সরল বিশ্বাসে মেনে নিতে হবে। ডোনাল্ড ল্যাচ বা জে. এইচ. পারির মত সাংস্কৃতিক ও উপনিবেশি ইতিহাসবিদদের পাঠ করলেও দেখা যায় ভিন্ সংস্কৃতির প্রতি ইউরোপের আগ্রহ সচরাচর বাণিজ্য, বিজয় বা কেবলই ঘটনাক্রমে সেই সংস্কৃতির সংস্পর্শে আসার বাস্তবতার সাথে সম্পর্কিত।[৫] আগ্রহের সৃষ্টি প্রয়োজনীয়তা থেকে, প্রয়োজনীয়তা

www.pathagar.com

নির্ভরশীল অভিজ্ঞতায় অনুপ্রাণিত একত্রে সক্রিয় কিছু বিষয়ের ওপর : যেমন, রুচি, ভয়, অনুসন্ধিৎসা, ইত্যাদি। যখন, যেখানে মানুষ বাস করেছে সেখানেই সক্রিয় হয়ে উঠেছে এই বিষয়টি।

তাছাড়া শুরুতে বিশেষ প্রাক-পরিস্থিতিতে 'আন' (Other) সংস্কৃতিকে হাতের কাছে না পেলে কিভাবে তার তাফসীর করা সম্ভব? আন্ সংস্কৃতিতে ইউরোপীয়দের আগ্রহে লক্ষ্য করা যায় ঐসব প্রাক-পরিস্থিতি হচ্ছে বরাবরই বাণিজ্য, উপনিবেশি বা সামরিক বিস্তৃতি, বিজয়, সাম্রাজ্য ইত্যাদি। এমনকি উনিশ শতকের জার্মান বিশ্ববিদ্যালয়ের পণ্ডিতরা যখন সংস্কৃত ও হাদিস অধ্যয়ন করেন তখন নিখাদ অনুসন্ধিৎসার কল্পকাহিনীর বদলে তারা নির্ভর করেছেন ঐ সব বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগার, অন্যান্য পণ্ডিত, সামাজিক প্রাপ্তি প্রভৃতির ওপর। কেবল ডঃ প্যানগ্লস বা *গালিভার ট্র্যাভেলসে* লাগাডোর সুইফট একাডেমী অব প্রজেকটরের কোনো সদস্যই বিশাল ইউরোপীয় সাম্রাজ্য ও ঐ জ্ঞান অধিভুক্ত করার পেছনে এ জাতীয় তাড়না আবিষ্কার করতে পারেন; "নয়া বুদ্ধিবৃত্তিক অনুসন্ধিৎসায় তুষ্ট" করার মধ্য দিয়ে সেই জ্ঞান আবার সাম্রাজ্যেরই অনুগামী । কোনো পশ্চিমা পণ্ডিত যখন একটি অ-পশ্চিমা দেশে যান তখন পরোক্ষ ও প্রতীকি অর্থে হলেও তিনি ওখানে উপস্থিত হন ঐ দেশের ওপর পশ্চিমের ক্ষমতার বদৌলতেই; কাজেই স্থানীয়রা তার "জ্ঞানতিয়াসে" সন্দেহ করবে এ আর আশ্চর্য কি![৬] সাম্রাজ্যবাদ ও জাতিবিদ্যা পরস্পর কুকর্মের সঙ্গী কি না সে প্রশ্নকে কেন্দ্র করে নৃ-বিজ্ঞানে যে বিতর্ক চলছে প্রাচ্যতাত্ত্বিকরা যেন সে ব্যাপারে কিছুই জানেন না; এই না-জানাও একরকম অজ্ঞতা ও আত্মশ্লাঘার ইঙ্গিত। জাতিবিদ্যার মাঠকর্মের প্রধান প্রবণতা হিসেবে সাম্রাজ্যবাদের প্রকাশে আশঙ্কা ব্যক্ত করেন লেভি স্ট্রশের মত বিরাট ব্যক্তিত্বও, কিন্তু দুঃখ করেন না।

খাঁটি অনুসন্ধিৎসার ব্যাপারে এই অভিযোগ বাতিল করে দেয়ার অর্থ স্বীকার করে নেয়া যে, ওরা দূরবর্তী ভিন্ সংস্কৃতি সম্পর্কে সত্য বয়ানে সক্ষম। নিবন্ধটিতে আরেকটু এগিয়ে এই বক্তব্যের ওপরই জোর দেয়া হয় এবং সংশ্লিষ্ট অধ্যয়নক্ষেত্রটিকে রাজনৈতিকায়িত করার বিপদ সম্পর্কে সতর্ক করা হয়। যেন রাজনীতি সঙ্কীর্ণ অংশীদারিত্বের ব্যাপার, প্রকৃত পণ্ডিত খালি মহৎ মতাদর্শ, পারলৌকিক মূল্যবোধ ও উন্নত নৈতিকতায় পূর্ণ। উল্লেখ্য যে কোথাও কোনো দৃষ্টান্ত দেয়া হয় না।

নিবন্ধটির একটি লক্ষণীয় দিক হচ্ছে এতে বিজ্ঞান ও বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়ার নাম উল্লেখ করা হয় কেবল। মধ্যপ্রাচ্য নিয়ে অ-রাজনৈতিক অধ্যয়নের সত্য কী সে প্রশ্নে লেখক নিরুত্তর। অর্থাৎ মনোভাব, ভঙ্গি, বাকচাতুর্য ও মতাদর্শকেই পাণ্ডিত্যের গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য মনে করা হয়। সবচেয়ে খারাপ ব্যাপার হচ্ছে নিরপেক্ষ ও অ-রাজনৈতিক পাণ্ডিত্যের সত্যের গল্প টিকিয়ে রাখার জন্য পাণ্ডিত্য ও বৈষয়িকতার সম্পর্ক আড়াল করার চেষ্টা।

এ প্রবণতা থেকে আমরা মূল বিষয়টির চেয়ে লেখক সম্পর্কেই বেশি জানতে পারি। এ শ্লেষাত্মক বৈশিষ্ট্য সকল ইউরোপীয় লেখকের লেখাতেই বিদ্যমান, যারা অ-পশ্চিমা

www.pathagar.com

সমাজ সম্পর্কে লিখেছেন। আলোচ্য অধ্যয়ন ক্ষেত্রটির সার্বিক অবস্থা বোঝার জন্য ১৯৭৩ সালে মিড্‌ল ইস্ট স্টাডিজ এসোসিয়েশন (MESA) ও ফোর্ড ফাউন্ডেশনের যৌথ উদ্যোগে একটি জরীপ চালানো হয়[৭]। ১৯৭৬ সালে এর ফলাফল প্রকাশিত হয় *দি স্টাডি অব দি মিড্‌ল ইস্ট: রিসার্চ এন্ড স্কলারশীপ ইন দি হিউম্যানিটিজ এন্ড দি সোশাল সায়েন্সেস* নামে, লিওনার্দ বাইন্ডারের সম্পাদনায়। এতে সঙ্কট ও জরুরিত্বের যে-বোধ ফুটে উঠেছে তা পাঠক মাত্রকেই নাড়া দেয়; অথচ *আমেরিকান স্কলারের* পূর্বোক্ত নিবন্ধে তার লেশমাত্র চিহ্ন নাই। কারণ এ জাতীয় পণ্ডিতদের মতে মধ্যপ্রাচ্য অধ্যয়ন ক্ষেত্র হচ্ছে একটি যুদ্ধক্ষেত্র, ওখানে যথাযথ মনোযোগ, প্রয়োজনীয় অর্থ ও বিশেষজ্ঞ নিয়োজিত করা হয় নাই। (অথচ মাত্র কয়েক বছর আগে যুক্তরাষ্ট্র সরকারের প্রয়োজনে মেসারই এক সদস্য মধ্যপ্রাচ্য অধ্যয়ন সম্পর্কে মতামত জানাবার সময় মন্তব্য করেন: ইসলাম বা আরবদের সম্পর্কে বিশেষজ্ঞ পর্যায়ের গবেষণা নিষ্প্রয়োজন, কারণ যুক্তরাষ্ট্রের কাছে এর সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক গুরুত্ব দ্বিতীয় সারির ব্যাপার।[৮] কিন্তু ওদের উল্লেখিত সকল সমস্যার মূলে যে সমস্যা সক্রিয় তা স্পষ্ট আলোচিত হয়েছে কেবল লিওনার্দ বাইন্ডারের ভূমিকাতেই।

প্রথম বাক্যেই বাইন্ডার বলেন, "যুক্তরাষ্ট্রে অঞ্চলবিদ্যা বিকাশের মূল উদ্দেশ্য রাজনৈতিক।"[৯] এরপর কথা বলেন খুঁটিনাটি বিষয় নিয়ে। তিনি মন্তব্য করেন যে, বিষয়টির সবচেয়ে মৌলিক প্রশ্নগুলোও মূল্য-বিচ্ছিন্ন নয়। এমন হতে পারে যে, সরকারী তথ্যের প্রেক্ষাপটের তুলনায় বিভিন্ন ক্ষেত্রে মধ্যপ্রাচ্য অধ্যয়নের বৈষয়িক মূল্য-সংশ্লিষ্টতা খুবই সূক্ষ্ম... তাহলেও সমস্যা এড়াবার নয়।[১০] সবশেষে বাইন্ডার অগ্রসর হন ভিন্ন সংস্কৃতি সম্পর্কে পশ্চিমা ছাত্রদের অধ্যয়নের সত্যের ওপর রাজনৈতিক প্রভাবের সারসংক্ষেপকরণে।

তিনি স্বীকার করেন প্রত্যেক পণ্ডিতই তার অধ্যয়নের "মূল্য সম্পর্কে সচেতন"। তিনি বলেন "বিষয়টির সাথে সাধারণ পরিচিতি" ব্যক্তিগত ও অস্থায়ী বিচার-বিবেচনার বিপথগামী প্রভাব কমিয়ে আনে।[১১] কিন্তু বাইন্ডার বলেন নাই "বিষয়" জিনিষটা কী, কিভাবে তা মানবীয় বিচার-বিবেচনাকে অলিম্পীয় বিশ্লেষণে রূপান্তরিত করে ফেলে। তার আলোচনা থেকে বিষয় সম্পর্কে পাঠকের আত্মবিশ্বাস আরো দৃঢ় হয়, কিন্তু সেই *বিষয়টা* আসলে কী সে ব্যাপারে কোনো ধারণাই জন্মায় না।

দেখা যাচ্ছে মধ্যপ্রাচ্য অধ্যয়নে রাজনৈতিক চাপের কথা স্বীকার করেও এইসব চাপ সরিয়ে প্রাচ্যতাত্ত্বিক জ্ঞানভাষ্যের (ডিসকোর্স) কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠার প্রবণতা রয়েছে। তা আবার এই কথাই বলে যে, এই কর্তৃত্ব সরাসরি পশ্চিমের সাংস্কৃতিক ক্ষমতা থেকে উৎসারিত হয়ে ইসলাম বা প্রাচ্য বিষয়ের শিক্ষার্থীদেরকে প্রাচ্য ও ইসলাম সম্পর্কে মন্তব্য করার ও বিবৃতি প্রদানের সুযোগ দেয়। বহু বছর ধরে এইসব মন্তব্য ছিল চ্যালেঞ্জের উর্ধ্বে। উনিশ শতকের প্রাচ্যতাত্ত্বিক বা বিশ শতকের লিওনার্দ বাইন্ডারের মতো পণ্ডিতের মনেও সন্দেহ নেই যে, পশ্চিমা সংস্কৃতি প্রাচ্য সম্পর্কে যা-ই জানতে চেয়েছে এই অধ্যয়ন ক্ষেত্রটি অর্থাৎ প্রাচ্য বা প্রাচ্যজন তা-ই সরবরাহ করেছে পশ্চিমা

www.pathagar.com

সংস্কৃতিকে। যিনি এ বিষয়টির নিজস্ব ভাষায় কথা বলবেন, এর কৌশলগুলোয় হাত পাকাবেন, এর বিশ্বস্ততা অর্জন করবেন, তিনিই সক্ষম হবেন বৈজ্ঞানিক ভাষ্য উৎপাদনে। এই ক্ষমতাই আগে থেকে এবং এখনো প্রাচ্যতত্ত্বের আত্মভোলা বাকভঙ্গির যোগানদাতা। বাইন্ডারের মতে প্রাচ্যের মানুষ নয়, এ বিষয়টিই স্বাভাবিক ব্যাপারগুলোকে সাধারণ পটভূমিতে বিবৃত করে। প্রাচ্যজনের আকাঙ্ক্ষা বা প্রাত্যহিক জীবনের নৈতিকতা নয়, বিষয়টি নিজেই "এর পরিপ্রেক্ষিতে উদ্ভূত বিভিন্ন নৈতিক ইস্যু বিশ্লেষণের প্রয়োজনীয় পদ্ধতির যোগান দেয়।"

কাজেই "বিষয়" একদিকে যতটা না কর্ম-তৎপরতা, তার চেয়ে বেশি একটি প্রতিষ্ঠানস্বরূপ; অন্যদিকে, তা নিজের অধীত ব্যাপারগুলোকেও তাৎক্ষণিকভাবে স্বাভাবিক করে ও নিয়ন্ত্রিত রাখে, অথচ সে তুলনায় নিজেকে বা নিজের কৃতকর্মকে বিশ্লেষণ করে দেখে না। এর ফলাফলকে অন্য সংস্কৃতি সম্পর্কে পূর্ণ জ্ঞান বলা যাবে কেবল অসংখ্যবার পুনরুক্তির মাধ্যমে। বস্তুত এখন ইসলাম অধ্যয়নের কোনো কিছুই জরুরী সমকালীন চাপ থেকে "মুক্ত" নয়, আবার, গুপ্ত বিরুদ্ধাচরণেরও শিকার। প্রাচ্যতাত্ত্বিকদের দাবীকৃত অ-রাজনৈতিক বিষয়মুখিনতা তা থেকে অনেক দূরে। আসলে এ পরিস্থিতি একদিকে অশীল বস্তুবাদীদের যান্ত্রিক নির্ধারণবাদী এবং "বিষয়ের" কৌলশগত দক্ষতায় বিশ্বাসী পণ্ডিতদের থেকে যথেষ্ট ফারাকে। এই দুই চরমপন্থী প্রবণতার *মধ্যে কোনোখানে তাফসীরকারী আগ্রহ নিজেই পথ খুঁজে নেয় এবং সবশেষে প্রতিফলিত হয় সংস্কৃতিতে*।

কিন্তু এখানেও পুরোপুরি স্বাধীনতা ও বৈচিত্র্য অনুপস্থিত। কারণ ক্ষমতা ও বাসনার অনুপস্থিতিতে যে বিষয়টি প্রাতিষ্ঠানিক বা প্রত্ননির্দশনাদির বিদ্যায় পরিণত হত, কোন বলে তা আগ্রহের বিষয় হয়ে উঠে? এই দুই ব্যাপারই কিন্তু পশ্চিমে (কমবেশি মাত্রায় অন্যত্রও) সংগঠিত হওয়ার প্রবণতা দেখায়। ওখানে এগুলো প্রয়োগ লাভেও সক্ষম; সঙ্কীর্ণ বাস্তব ও জরুরিত্বের উর্ধ্বে এদের নিজস্ব, দুর্দম প্রাতিষ্ঠানিক কর্তৃত্ব খাটাতে পারে। একটা সরল দৃষ্টান্ত দিলে জিনিষটা পরিষ্কার হবে, তখন আমরা বিশদ আলোচনা করতে পারব।

ইউরোপ ও আমেরিকায় "ইসলাম" একটা অশান্তিদায়ক "খবর"। সরকার, প্রচার মাধ্যম, বিশেষজ্ঞদল, সবারই একসুর—ইসলাম পশ্চিমা সভ্যতার প্রতি হুমকি। আমি বলতে চাচ্ছি ওখানে ইসলামের নেতিবাচক ভাবমূর্তিটাই বেশি প্রচলিত। এ ধরনের ভাবমূর্তি কিন্তু বলে না ইসলাম আসলে কী, বরং একটি সমাজের প্রভাবশালী অংশ ইসলামকে কী মনে করে তাই অবহিত করে আমাদেরকে। এই অংশটির আছে ক্ষমতা ও বাসনা, যা দিয়ে বিশেষ ভাবমূর্তি সৃষ্ট ও বিস্তৃত হয়। ফলে এই ভাবমূর্তিটাই অন্যগুলোর চেয়ে বেশি চোখে পড়ে। প্রথম অধ্যায়ে বর্ণনা করেছি যে এই কাজটা করা হয় মতৈক্যের মাধ্যমে, যা নির্ধারণ করে সীমানা, প্রয়োগ করে বিভিন্ন চাপ।

১৯৭১ সাল থেকে ৭৮ সালের মধ্যে ফোর্ড ফাউন্ডেশনের অর্থে প্রিন্সটন বিশ্ববিদ্যালয়ে অনুষ্ঠিত চারটি সেমিনারের কথা আলোচনা করা যাক। কিছুদিন আগেও প্রিন্সটনের

www.pathagar.com

নিয়ার ইস্ট স্টাডিজের নাম ছিল ডিপার্টমেন্ট অব অরিয়েন্টাল স্টাডিজ, প্রায় আধা শতাব্দি আগে ফিলিপ হিট্টী কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত। খুবই নামীদামী বিভাগ। এখন অন্যান্য নিয়ার ইস্ট স্টাডিজ প্রোগ্রামের মত এটিও সমাজবিজ্ঞানী ও নীতি-নির্ধারণ বিজ্ঞানীদের আধিপত্যে। অর্থনীতি, রাজনীতি, ইতিহাস ও সমাজবিদ্যার তুলনায় ধ্রুপদ ইসলামী, আরবী ও ফারসী সাহিত্য পাঠ্যসূচীতে তেমন গুরুত্ব পায় না। ফোর্ড ফাউন্ডেশনের সহযোগিতার কারণে এ প্রোগ্রাম যুক্তরাষ্ট্রে কর্তৃত্বময় মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত। ওখানে সেমিনারগুলো করা হয় জাতীয় স্বার্থের কথা মাথায় রেখে। এগুলোর বিষয়বস্তু ইঙ্গিত করে রাজনৈতিক অগ্রাধিকার থেকে সৃষ্টি হয় পণ্ডিতি প্রয়োজনীয়তা। ফোর্ড ফাউন্ডেশন ও প্রিন্সটন বিশ্ববিদ্যালয় আরবী ব্যকরণের তত্ত্ব নিয়ে এমন বিলাসী সেমিনার আয়োজনে আগ্রহী হওয়ার কথা না, যদিও দেখানো সম্ভব অনুষ্ঠিত সেমিনারগুলোর সবকটা বিষয়ের চেয়ে আরবী ব্যাকরণের গুরুত্ব বেশি।

সেমিনারগুলোর বিষয়বস্তু কী, অংশগ্রহণকারী কারা? একটা সেমিনার হয় "স্লেভারি এন্ড রিলেটেড ইনস্টিটিউশন ইন ইসলামিক আফ্রিকা" বিষয়ে। ওখানে উল্লেখ করা হয় "কতিপয় ইসরাইলী পণ্ডিত" আফ্রিকান দেশগুলোকে সতর্ক করার চেষ্টা করেছেন যে, আরবদের ওপর বেশি নির্ভর করা ঠিক হবে না, কারণ অতীতে আরবরাই একদিন ওদের দেশকে জনশূন্য করেছিলো[১২]। দাসত্বকে সেমিনারের আলোচ্য বিষয় হিসেবে নির্বাচন করার কারণে আফ্রিকান ও আরব মুসলমানদের সম্পর্কের নিশ্চিত অবনতি ঘটবে। আসলে এই উদ্দেশ্য পূরণের জন্যই ওখানে আরব মুসলিম জগতের কাউকে দাওয়াত করা হয়নি।

মিলেটকে সামনে রেখে অনুষ্ঠিত দ্বিতীয় সেমিনারে আলোচনা হয় "দি পজিশন অব মাইনরটিজ এন্ড ইন পারটিকুলার রিলিজিয়াস মাইনরিটিজ উইদিন দি মুসলিম স্টেট ইন দি মিড্‌ল ইস্ট"।[১৩] মিলেট হচ্ছে অটোমান সাম্রাজ্যের অভ্যন্তরে তুলনামূলকভাবে স্বায়ত্তশাসিত সংখ্যালঘুদের দলবদ্ধতা। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর এগুলো জাতীয় রাষ্ট্র গড়ে তুলে। যেমন ইসরাইল মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলোর মাঝখানে একটা ধর্মীয় সংখ্যালঘু রাষ্ট্র। আলোচ্য বিষয়টি কোনো বিচারেই নিরপেক্ষ হতে পারে না; বরং "মিলেট পদ্ধতি" আলোচনার মধ্য দিয়ে আসলে সমকালীন ইসলামী বিশ্বের জটিল জাতীয়তা ও জাতিগত সমস্যাকে সামনে এনে নীতি-নির্ধারণী সমস্যা সমাধানের উদ্যোগকেই গুরুত্ব দেয়া হয়। সংখ্যাগুরু সুন্নী ও কিছু সংখ্যালঘুর কাছেও আধুনিক ইসলামী বিশ্বের সাম্প্রতিক ইতিহাস হলো জাতিগত ও ধর্মীয় বিভক্তির বিপরীতে একীভূত অসাম্প্রদায়িক গণতন্ত্র বিকাশের লড়াইয়ের ইতিহাস। এ লক্ষ্য অর্জিত হয়নি সত্য। তবে কেবল ইসরাইল ও চরম ডানপন্থী লেবানীজ মেরোনাইট খ্রিস্টানরাই বাইরের কোনো পরাশক্তির সহযোগিতায় জাতিগত সংখ্যালঘুর স্বায়ত্তশাসনের রাষ্ট্রকাঠামো প্রতিষ্ঠার জন্য আন্দোলন করে।

এ জাতীয় আন্দোলন যে আবার ফিলিস্তিনীদের সমস্যারও সমাধান দিতে পারে তা আগেই ভেবে দেখেছিলেন সেমিনারের উদ্যোক্তারা। আর সেজন্যই এ বিষয়ে মূল

www.pathagar.com

বক্তা করা হয় একজন ইহুদি অধ্যাপককে। সংখ্যাগুরু সুন্নী সম্প্রদায়ের কাউকেই দাওয়াত করা হয়নি। যুক্তরাষ্ট্রে অনুষ্ঠিত এমন একটি সেমিনারকে কী করে পণ্ডিতি অনুসন্ধিৎসার বিষয় বলে চালানো সম্ভব? সেই ভদ্রলোক আবার সেমিনারগুলো প্রধান আহবায়ক, যিনি পশ্চিমের বুদ্ধিবৃত্তিক অনুসন্ধিৎসার প্রশংসা করেন, এবং যে-সব ইউরোপীয় পণ্ডিত এর মধ্যে রাজনীতি দেখেতে পান তাদের বিদ্রূপ করেন।

একটি সংকলন প্রকাশিত হয় সেমিনারের বক্তব্যগুলো নিয়ে[১৪]। সেমিনারে জোর দেয়া হয় জাতীয় চরিত্র অধ্যয়নে (অবশ্য আলী বানুয়াজিজি চমৎকারভাবে দেখিয়েছেন ইরানী জাতীয় চরিত্র সম্পর্কিত অধ্যয়নের সাথে সম্পর্ক আছে ইরানে সাম্রাজ্যবাদী শক্তির উদ্দেশ্যসমূহের[১৫])। কাজেই বুঝাই যায়, বইটিতে আমাদেরকে বহুবার বলা হয় মুসলমানরা বাস করে ভান-করা বিশ্বাসের জগতে; তাদের পরিবারগুলো দমনমুখি পরিবার, অধিকাংশ নেতৃবৃন্দ মানসিক রোগাক্রান্ত, গোটা সমাজটাই অপরিপক্ক। সিদ্ধান্তগুলো আসে নিরপেক্ষ, আলোচ্য-বিষয়মুখি ও বৈষয়িক মূল্যের ব্যাপারে উদাসীন বৈজ্ঞানিকদের তরফ থেকে। এইসব বিজ্ঞানীরা কোনো কোনো পদ দখল করে আছেন সরকার ও করপোরেশনগুলোতে, কিংবা, মুসলিমদের প্রতি সরকারী নীতি গ্রহণে এ জাতীয় তদন্ত কীভাবে কাজে লাগে তা বলা হয় না। আমাদের জানানো হয় না সবল একটি সমাজ কর্তৃক কোনো দুর্বল সমাজ সম্পর্কে এ জাতীয় অধ্যয়নে জড়িত মনোভাবের পদ্ধতিগত সংশ্লিষ্টতা কোথায়।

"ল্যান্ড, পপুলেশন এন্ড সোসাইটি ইন দি নিয়ার ইস্ট: স্টাডিজ ইন ইকোনমিক হিস্ট্রি ফ্রম দি রাইজ অব ইসলাম টু দি নাইনটিন্থ সেঞ্চুরি" নিয়ে অনুষ্ঠিত চতুর্থ সেমিনারে ঐ বিষয়টি সম্পর্কে অনুসন্ধানের ছাপ নাই। হাবেভাবে এটিও পণ্ডিতি ও নিরপেক্ষ আলোচনা। কিন্তু তলে তলে এর গুরুত্ব হচ্ছে আধুনিক মুসলিম সমাজে সুস্থিরতা (বা অস্থিরতার) সূচক হিসেবে জমির মালিকানা, জনসংখ্যার বিন্যাস ও রাষ্ট্রের কর্তৃত্বের সম্পর্ক বোঝা। আমরা বলব না সেমিনারে উপস্থাপিত প্রতিটি বক্তব্যই নিরপেক্ষ, তেমনি এও বলব না এতে অংশগ্রহণকারী প্রত্যেকে ষড়যন্ত্রে জড়িত। প্রকৃতপক্ষে, বিষয় নির্বাচন ও অন্যান্য দিক মিলিয়ে সেমিনারগুলো ইসলামকে তুলে ধরেছে দুভাবে: হয় দূরবর্তী, শত্রু প্রপঞ্চরূপে, অথবা, নীতি-নির্ধারণের ক্ষেত্রে বাগে আনার যোগ্য কিছু বৈশিষ্ট্য হিসেবে।

যুক্তরাষ্ট্রে তৃতীয় বিশ্ব সম্পর্কে অন্যান্য অধ্যয়নের মতোই এই সেমিনারগুলো; যেমন দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর চীন সম্পর্কিত অধ্যয়ন।[১৬] পার্থক্য কেবল এইটুকু যে, ইহুদিবাদ, কালো বা অন্যান্য এশীয়দের সম্পর্কে যা বলা সম্ভব নয় ইসলামের ব্যাপারে তাও বলা সম্ভব, যা তাফসীরী প্রক্রিয়ায় ক্ষেত্রে নিটশে, মার্কস ও ফ্রয়েডের সময় থেকে অর্জিত সকল তাত্ত্বিক বিকাশ উপেক্ষা করে।

এর ফল হচ্ছে ইসলাম অধ্যয়নে যা চলছে তা ইতিহাসের পণ্ডিতদের সামনে উত্থিত পদ্ধতিগত সমস্যা সম্পর্কে কোনো আলোকপাত করতে পারে না। প্রিন্সটন বিশ্ববিদ্যালয়ের সেমিনারের বিষয়টিকে যদি প্রাসঙ্গিক উদাহরণ হিসেবে বিবেচনা করি

www.pathagar.com

তাহলে দেখা যাবে এটি প্রথমে ইসলাম বিষয়ে একটি পণ্ডিতি কাজ হিসেবে প্রকাশিত হয়, দুএকটি নামকরা পত্রিকায় আলোচিত হয়, অতপর হারিয়ে যায়। সামগ্রিক সংস্কৃতিতে ইসলাম অধ্যয়নের এই প্রান্তিক অবস্থানের কারণে পণ্ডিতরা তাদের কাজ চালিয়ে যেতে পারছেন, আর তা নিয়ে প্রচার মাধ্যমও সৃষ্টি করতে পারছে মুসলমানদের কেরিকেচার। ১৯৮০-এর দশক থেকে ইসলাম বিষয়ে রাজনৈতিক অধ্যয়ন—অর্থাৎ মৌলবাদ, সন্ত্রাস, আধুনিকতা-বিরোধিতা, প্রভৃতি বিষয়ে আগ্রাসী লেখালেখিতে বাজার সয়লাব হয়ে যায়। এগুলো ইসলামকে পশ্চিমের হুমকিরূপে প্রচার করার কাজে হাতে গোনা কয়েকজন পণ্ডিতের রচনার ওপর নির্ভরশীল (যেমন বার্নার্ড লুইস একজন)। এভাবে পণ্ডিতি জনপরিসর অটুট থাকে, আবার ইসলামী সংবাদের ক্রেতাদেরকে ইসলামী শাস্তি, সন্ত্রাস, হারেম, ইত্যাদি ব্যাপারে বড় ডোজে ভাষ্য সরবরাহও অব্যাহত থাকে।

বিশেষজ্ঞরা যখন সাধারণ মানুষের সামনে উপস্থিত হন তখন তারা বিশেষজ্ঞ হিসেবেই কথা বলেন, তাদের বক্তব্য ইসলামের প্রতি সাংস্কৃতিক সহানুভূতিতে সিক্ত থাকে না। তাদেরকে দেখা হয় টেকনিশিয়ানরূপে, যারা উদ্বেগাক্রান্ত জনগণকে অবহিত করেন।[১৭] জনগণও আন্তরিকভাবে তাদের কথা শুনে, কারণ এরাই ক্রিস্টোফার লাস্কের বর্ণিত পরিস্থিতির জবাব। লাস্ক লেখেন যে, টেকনিক্যাল বিপ্লব ও ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার চাপে বিশেষজ্ঞ, টেকনিশিয়ান ও ব্যবস্থাপকদের চাহিদা বেড়ে যায়, বিশ্ববিদ্যালয়গুলো পরিণত হয় বিশেষজ্ঞ তৈরির কারখানায়।[১৮]

বিশেষজ্ঞের বাজার এমনই চড়া ও লোভনীয় যে, মধ্যপ্রাচ্য অধ্যয়ন সরাসরি এ দিকেই পরিচালিত। এ জন্যই প্রতিষ্ঠিত জার্নালগুলোয় কখনো আলোচিত হয়নি মধ্যপ্রাচ্য ও ইসলাম অধ্যয়নের প্রয়োজনীয়তা কোথায় এবং কাদের জন্য। সামগ্রিক অর্থে (এ বিষয়ক জ্ঞানের) ভোক্তা বাজার আছে বলেই লোপ পেয়েছে পদ্ধতিগত সচেতনতা। কোনো কাজের খরিদ্দার থাকলে কেউ কখনো প্রশ্ন করে না অমুক কাজটি কেন করা হচ্ছে।

এর চেয়েও খারাপ ব্যাপার হল যাদের নিয়ে গবেষণা সেই জনগোষ্ঠী ও অঞ্চলটির পটভূমিতে চিন্তা করেন না পণ্ডিতরা। ইসলাম এখানে কোনো কথক অস্তিত্ব নয়, কেবলই পণ্য। এর ফলে বাইরের সমালোচকদের সামনে তুলে ধরা হয় পণ্ডিতি সততা ও সম্মান, পাণ্ডিত্যপূর্ণ বাকচাতুর্যে অস্বীকার করা হয় রাজনৈতিক সংশ্লিষ্টতা এবং পণ্ডিতি আত্মপ্রশংসা প্রচলিত প্রচারণাকে টিকিয়ে রাখে অনির্দিষ্ট কাল ধরে।

আমি যে ব্যাপারটি নিয়ে কথা বলছি তা আসলে এক সঙ্গীহীন উদ্যোগ; এর অর্থ হল পণ্ডিতদের সাথে সংশ্লিষ্ট স্বার্থ সম্পর্কিত প্রশ্নের জবাবে তারা কাজ করেন প্রতিক্রিয়ার সাথে; যথার্থ তাফসীরের প্রয়োজনীয়তার বদলে সংঘগত রক্ষণশীলতার দ্বারা পরিচালিত হন তিনি। সর্বোপরি, সঙ্কটের কাল ছাড়া অন্য সময় সামগ্রিক সংস্কৃতি তার কাজকে করে তুলে বিচ্ছিন্ন-খণ্ডিত, প্রান্তিক।

অন্য সংস্কৃতি সম্পর্কে জানার দুটো শর্তের একটা হলো প্রকৃত লেনা-দেনার মাধ্যমে সেই সংস্কৃতির সংস্পর্শে আসা, অন্যটি হচ্ছে তাফসীরী কর্মসূচী সম্পর্কে সচেতনতা।

www.pathagar.com

আলোচ্য ক্ষেত্রে দুটো জিনিষই অনুপস্থিত; এই অনুপস্থিতি ইসলাম সম্পর্কিত প্রচারণায় চাপিয়ে দেয় প্রান্তিক জনহীনতা, আঞ্চলিকতা ও পুনরাবৃত্তি। এসব থেকে বোঝা যায় শেষ পরাশক্তি যুক্তরাষ্ট্র থেকে ইসলামকে কাভার করার মধ্যে তাফসীরের ব্যাপারটাই নাই, আছে ক্ষমতার জাহিরতি। প্রচার মাধ্যম ইসলাম সম্পর্কে যা বলতে চায় তা-ই বলতে পারে। এর ফলে মৌলবাদ, সন্ত্রাস ও "ভালো মুসলিম"—সবাই চোখে পড়ে সমান গুরুত্ব নিয়ে। এছাড়া অন্য বিষয় সম্পর্কে কিছুই লেখা হয় না, কারণ সেগুলো যুক্তরাষ্ট্রে আগ্রহের বিষয় নয় এবং প্রচার মাধ্যমের ভালো প্রতিবেদনের কাতারেও পড়ে না। অন্যদিকে প্রাতিষ্ঠানিক সম্প্রদায় সাড়া দেন কেবল সেই সব বিষয়ের প্রতি যেগুলোর রয়েছে জাতীয় ও করপোরেট চাহিদা। একারণে তারা ইসলামের খুঁটিনাটি নিয়ে গঠিত বিশাল জগত থেকে কেঁটেছেঁটে বার করে আনেন দু'একটা বিষয়। এ বিষয়গুলো (চরমপন্থা, সন্ত্রাস ইত্যাদি) ব্যবহৃত হয় ইসলাম ও ইসলামী অধ্যয়নের সংজ্ঞা নির্ধারণে। এ ছাড়া, এমনকি সরকার, বিশ্ববিদ্যালয়ের কোনো বিভাগ কিংবা কোনো ইনস্টিটিউট মধ্যপ্রাচ্য অধ্যয়নের ভবিষ্যৎ নিয়ে সম্মেলনের আয়োজন করলেও সক্রিয় হয়ে ওঠে ঐ একই ধারণা ও লক্ষ্যসমূহ। এতে কোনো পরিবর্তন নেই বললেই চলে।

সরকারী বা করপোরেশনে কর্মরত প্রবীণ বিশেষজ্ঞরা পরস্পর যোগাযোগের মাধ্যমে যে-নেটওয়ার্ক গড়ে তুলে তার ওপর নির্ভরশীল হয়ে পড়ে তরুণ বিশেষজ্ঞরা; এ ছাড়া, প্রতিষ্ঠিত জার্নালে লেখা প্রকাশ করা ও চাকরী পাওয়ার ব্যাপার তো আছেই। একই কারণে প্রবীণদের রচনার সমালোচনা হয় না বললেই চলে, হয় কেবল প্রশংসামূলক আলোচনা। সবচেয়ে সন্দেজনক ব্যাপার হচ্ছে সমাজে বিস্তৃত বিভিন্ন ধরনের ক্ষমতা এবং ক্ষমতার জন্য সৃষ্ট পাণ্ডিত্যের সম্পর্ক কখনো বিশ্লেষিত হয় না। যখনই কোনো কণ্ঠ এই ষড়যন্ত্রমূলক নীরবতাকে চ্যালেঞ্জ করে তখনই সামনে চলে আসে তার মতাদর্শগত ও জাতিগত পরিচয়; সেই কণ্ঠের বিরুদ্ধে অভিযোগ ওঠে সে মার্কসবাদী বা ফিলিস্তিনী (কিংবা ইরানী, মুসলিম, সিরীয়, ইত্যাদি), আমরা জানি এগুলো অর্থ কী।[১৯] কিন্তু তাদের নিজেদের সততা বা অধিকার নিয়ে কখনো আলোচনা হয় না। লক্ষ্যযোগ্য আরেকটি ব্যাপার হলো ইসলাম সম্পর্কে ইসলামী রচনা নিয়ে আলোচনা করেন না পশ্চিমা পণ্ডিতরা। এই কি পাণ্ডিত্য? এই কি সাক্ষ্যপ্রমাণ? না কি এ দুইয়ের কোনোটাই না?

এই দৃষ্টির মান বোঝার কার্যকর উপায় হচ্ছে বৃটেন ও ফ্রান্সের পরিস্থিতির সাথে তুলনা করা। দুটো দেশই এ লাইনে যুক্তরাষ্ট্রের পূর্বসূরী। দুই দেশেই ইসলামী বিষয় পণ্ডিতদের একটি দল সবসময় অস্তিত্ববান, যারা সরকারী ও করপোরেশনের নীতি-নির্ধারণেও উপদেষ্টার ভূমিকা পালন করে থাকে। তবে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের আগে পর্যন্ত উভয় দেশের প্রেক্ষিতেই হাতের কাছের প্রথম কাজটা ছিল উপনিবেশগুলোর শাসন ব্যবস্থা দেখাশোনা করা। তখন ইসলামী বিশ্বকে দেখা হত ধারাবাহিক সমস্যার স্তূপ হিসাবে। ইসলামী মন সম্পর্কে তত্ত্ব ও বিমূর্ত বিবরণ যেখানে সেখানে নীতি-নির্ধারণে

www.pathagar.com

হস্তক্ষেপ করত, তবে প্রধানত ভূমিকা রাখত পরিপ্রেক্ষিতরূপে। ইসলামী বিশ্বে জাতীয় (এমনকি ব্যক্তিগত) স্বার্থ আদায়ের কাজটিকে বৈধতা দেয় এই ইসলামী জ্ঞানভাষ্য। এ কারণেই উপনিবেশ শেষ হয়ে যাওয়ার পর ইসলামী বিশ্বে স্বার্থ সংরক্ষণের জন্য বৃটেন ও ফ্রান্সের ইসলাম বিশেষজ্ঞরা এখনো জনব্যক্তিত্বরূপে গণ্য। এরা সমাজবিজ্ঞানী নন, বরং মানবতাবাদী; জনসংস্কৃতিতে এদের সমর্থন শিল্পোত্তর যুগের বিশেষজ্ঞতা থেকে বিচ্ছুরিত হয় না, বরং উৎসারিত হয় সমাজের প্রচলিত বুদ্ধিবৃত্তিক ও নৈতিক চিন্তাধারা থেকে। ফ্রান্সে রডিনসন, ইংল্যান্ডে আলবার্ট হুরাইনি এ ধরনের পণ্ডিত।[২০] এরা বিলুপ্ত হয়ে যাচ্ছেন। ভবিষ্যতে এদের স্থান দখল করবে আমেরিকান বিশেষজ্ঞদের মতো মানুষেরা।

যুক্তরাষ্ট্রে এ ধরনের পণ্ডিতরা কেবল মধ্যপ্রাচ্য বিশেষজ্ঞ বা ইসলাম বিশেষজ্ঞ নামে পরিচিত। সে দেশে ওদের মর্যাদা নির্ভর করে এই ধারণার ওপর যে, যুক্তরাষ্ট্রের কাছে ইসলামী বিশ্ব হল একটি কৌশলত এলাকা। ইসলামী উপনিবেশগুলো শাসন করার সময় গোটা একদল উপনিবেশি বিশেষজ্ঞ জন্ম দিয়েছিল বৃটেন ও ফ্রান্স। এরা কাজ করতেন বিশ্ববিদ্যালয়রগুলোতে, সরকারী ও ব্যক্তি-মালিকানাধীন করপোরেশন থেকে ডাক এলেও অংশগ্রহণ করতেন, কিন্তু যুক্তরাষ্ট্রের পণ্ডিতদের মতো সরকার-করপোরেশনের মধ্যপ্রাচ্য স্টাডিজ জোটে যুক্ত হননি। তবে এরা কখনো নিজেদের স্বাধীন চিন্তাকাঠামো সৃষ্টি করেন নাই।

কাজেই যুক্তরাষ্ট্রে ইসলামী বিশ্ব সম্পর্কিত জ্ঞান ও প্রচার কাজের গুরুত্ব নির্ধারিত হয় ভূ-রাজনৈতিক কৌশল ও আর্থ-স্বার্থের মাপে। আন (other) সংস্কৃতি সম্পর্কিত জ্ঞান আসলে কী হতে পারে, যখন একদিকে সে সংস্কৃতির সাথে জড়িয়ে দেয়া হয় "সঙ্কটে চাঁদ" জাতীয় জরুরিত্বের বোধ, অন্যদিকে প্রাতিষ্ঠানিকভাবে অনুমোদন করে নেয়া হয় পাণ্ডিত্য, ব্যবসা ও সরকারের পরস্পরিক সম্পর্ক?

দুই ভাগে এ প্রশ্নটির জবাব দিয়ে এ পর্যায়ের আলোচনা শেষ করি। যে-সব বাস্তব ঘটনা ও তথ্যাদি ইসলাম সম্পর্কে রক্ষণশীল ধরনের প্রচারণা পরিচালিত করছে প্রথমে সেগুলো আলোচনা করা যাক। আমি মূলত যুক্তরাষ্ট্রের পরিস্থিতি সম্পর্কে বলব, তবে একই পরিস্থিতির সূচনা হচ্ছে ইউরোপেও। একটি ফরাসি জরীপ অনুযায়ী ১৯৭০ সাল নাগাদ আমেরিকায় ১৬৫০ মধ্যপ্রাচ্য বিশেষজ্ঞ এ অঞ্চলের ভাষা শিক্ষা দিতেন গ্র্যাজুয়েট পর্যায়ের ২৬৫৯ জন শিক্ষার্থী ও আন্ডার-গ্র্যাজুয়েট পর্যায়ের ৪১৫০ জন শিক্ষার্থীকে (অঞ্চল বিদ্যায় গ্র্যাজুয়েট ও আন্ডার গ্র্যজুয়েট পর্যায়ের মোট ছাত্রের ১২% ও ৭.৪% যথাক্রমে)।[২১] মধ্যপ্রাচ্য বিষয়ে গ্র্যাজুয়েট পর্যায়ে ৬৪০০ ও আন্ডার-গ্র্যাজুয়েট পর্যায়ে ২২,৩০০ ছাত্র ভর্তি হয়। সাম্প্রতিক বছরগুলোয় মধ্যপ্রাচ্য বিষয়ে পিএইচডি পর্যায়ে গবেষকের সংখ্যা অনেক কম (গোটা দেশের হিসেবে ১%-এরও নিচে)।[২২] এ ব্যাপারে রিচার্ড নল্টের একটি গবেষণা প্রকাশিত হয় ১৯৭৯ সালে। ওখানে পরামর্শ দেয়া হয় "সরকার, করপোরেশন ও শিক্ষার প্রয়োজনে দ্রুত প্রচুর সংখ্যক দক্ষ বিশেষজ্ঞ ও পণ্ডিত তৈরি" করার জন্য। নল্ট লেখেন: "বিশ্ববিদ্যালগুলোর

www.pathagar.com

উৎপাদনের বাজারজাতকরণের ব্যবস্থা করার কৌশলরূপে দেখা যেতে পারে মধ্যপ্রাচ্য অধ্যয়ন ক্ষেত্রগুলোকে। এগুলো যে কেবল বাজারজাত করার প্রয়োজেন দক্ষ বিশেষজ্ঞ তৈরি করছে তা নয়, বাজারও সৃষ্টি করছে। এম. এ. ডিগ্রী সম্পর্কে তিনি মন্তব্য করেন যে সরকার, করপোরেট, ব্যাংকিং ও অন্যান্য পেশাগত বাজারে যথার্থ প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত এবং মধ্যপ্রাচ্যবিষয়ক অভিজ্ঞতায় সমৃদ্ধ এম. এ.'র বেশ চাহিদা[২৩]।

বুদ্ধিবৃত্তিকভাবে জরুরী বিষয়গুলোকে প্রিন্সটন সেমিনারসমূহ যেমন আকার আকৃতি প্রদান করে, তেমনি বাজারী বাস্তবতা প্রভাবিত করে পণ্ডিতি পাঠ্যসূচীকে। ইসলামী আইন ও আরব-ইসরাইল সংঘাতের মতো বিষয়ের ওপর খুবই জোর দেয়া হয়; নাম শুনেই বোঝা যায় এগুলোর প্রাসঙ্গিকতা কোথায়। অথচ সাহিত্য দারুণভাবে উপেক্ষিত। নল্ট লেখেন যে, কেন্দ্রের যে-সব পরিচালকের সাথে তিনি কথা বলেছেন তারা তাকে :

বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসের বাইরে থেকে আসা রাজনৈতিক চাপের কথা জানান। এই চাপের উদ্দেশ্য হচ্ছে আরব বিষয়ক কর্মসূচি ঠেকানো, অথবা অবমূল্যায়িত করা, যদিও অধ্যয়ন কেন্দ্র মনে করে সেগুলো প্রাতিষ্ঠানিকভাবে বৈধ ও আকাঙ্ক্ষিত কর্মসূচি। আরব সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, চলচ্চিত্র প্রদর্শনী, দাওয়াতী অতিথিদের বক্তৃতা, আরব উৎস থেকে প্রাপ্ত আর্থিক অনুদান গ্রহণ... সবকিছুতেই এ বাধা আসতে পারে। এ বিষয়ে সচেতন থাকার কারণে পরিচালকরা একরকম বাধ্যবাধকতার মধ্যে থাকেন। অনেক পরিচালকের পক্ষেই এর বিরোধিতা করা বা একে উপেক্ষা অসম্ভব। কোনো কোনো পরিচালক মনে করেন পরিস্থিতির উন্নয়ন ঘটছে, অন্যরা অত নিশ্চিত হতে পারেন না।[২৪]

রাজনীতি, চাপ, বাজার... সবকিছুই বিভিন্নভাবে তাদের উপস্থিতির জানান দিচ্ছে। সাম্প্রতিক কালে মধ্যপ্রাচ্য বিশেষজ্ঞের চাহিদা সৃষ্টি করেছে অনেক কোর্স ও ছাত্রছাত্রী, জ্ঞানের সক্রিয় পটভূমির ওপর গুরুত্ব আরোপের প্রবণতা, যা লোভনীয় ও তাৎক্ষণিকভাবে ব্যবহারযোগ্য। এর আরেকটা ফল হল পদ্ধতিভিত্তিক অনুসন্ধানের অভাব। কেউ যদি মধ্যপ্রাচ্য অধ্যয়নকে পেশা হিসেবে গ্রহণ করতে চায় তবে প্রথমেই তাকে পিএইচডি'র জন্য ব্যয় করতে হবে খটখটে শুকনো কয়েকটা বছর (কিন্তু তা চাকুরীর নিশ্চয়তা দেবে না)। এরপর বৃহৎ চাকুরীদাতা কোম্পানীর কাছে আকর্ষণীয় কোনো বিষয়ে এম. এ. অথবা ডিপ্লোমা করবেন তিনি। এসব কিছু মিলে ইসলাম ও মধ্যপ্রাচ্য অধ্যয়নকে বিচ্ছিন্ন করে রেখেছে অন্যান্য পণ্ডিতি ধারা থেকে। বিশেষজ্ঞতা প্রদর্শনের মঞ্চ হিসেবে সাধারণ বুদ্ধিবৃত্তিক জার্নালের তুলনায় প্রচার মাধ্যম অনেক সুবিধাজনক মঞ্চ। প্রচারমাধ্যমে আপনি হয় কোনো না কোন দলমুখি (যা খুবই সীমারোপক), না হলে একজন বিশেষজ্ঞ, যাকে ডাকা হয় শিয়া মতবাদ বা আমেরিকা-বিরোধিতা সম্পর্কে মত প্রকাশের জন্য। যিনি ব্যবসা বা সরকারী চাকরীতে ভালো করতে পারেন নাই তার জন্য বিশেষজ্ঞতা নিজের পেশাকে বিস্তৃত করার নিশ্চিত উপায়।

এ অবস্থা আমাদেরকে দেখায় ইসলাম সম্পর্কিত জ্ঞানে মূল উপাদানগুলো ক্ষীণ হচ্ছে, বাড়ছে দৃষ্টির সঙ্কীর্ণতা। ইসলাম বিষয়ে প্রাতিষ্ঠানিক বিশেষজ্ঞরা হলেন একটি গোষ্ঠী

www.pathagar.com

হিসেবে জনবিচ্ছিন্ন, ব্যবহারিক অবস্থানে ইসলাম বিষয়ক জ্ঞানের কর্তৃত্বের নিষ্ক্রিয় প্রতীক। যে প্রক্রিয়ায় এরা বৈধতা লাভ করেন ও চোখে পড়েন, এরা নির্ভরশীল সে প্রক্রিয়াটির ওপরও। আর, এই প্রক্রিয়াটিকেই প্রতিফলিত করে ভয় ও অজ্ঞতার ওপর তৈরি ছাঁচে আস্থাবান প্রচার মাধ্যম।

আমি যা বর্ণনা করছি তা বুদ্ধিকে সীমাবদ্ধ করে। কিন্তু মধ্যপ্রাচ্য, ইসলাম বা তৃতীয় বিশ্বের অন্যান্য অঞ্চল সম্পর্কে বিপুল পরিমাণ জিনিষ সৃষ্টিতে কোনো বাধা দেয় না। অন্য কথায়, আমাদের কাজ করতে হবে এমন এক বিষয় নিয়ে যাকে অন্য প্রসঙ্গে ফুকো বলেছেন "জ্ঞানভাষ্যে উস্কানি"।[২৫] এটি হস্তক্ষেপ করার মতো সাধারণ কায়দার নিয়ন্ত্রণ নয়। দূর, ভিন্ন সংস্কৃতি সম্পর্কে বুদ্ধিবৃত্তিক বিধি-বিধান নিজের মতো সকলকিছুকেই ইতিবাচকভাবে উৎসাহিত করে। এ কারণে পৃথিবীতে পরিবর্তন আসে, কিন্তু এ ক্ষেত্রটিতে পরিবর্তন আসে না, এখানে তৎপরতা চালানোর জন্য নতুন নতুন মানুষেরও অভাব হয় না। ইসলাম ও অ-পশ্চিমাদের সম্পর্কে একচ্ছত্র প্রচারণা কিছু ধারণা, কথা ও কর্তৃত্বকে পরিণত করেছে সাধারণ নীতিতে। যেমন ইসলাম মধ্যযুগীয় বিপদজনক ব্যাপার, আমাদের শত্রু ও হুমকিস্বরূপ। এইসব ধারণা জায়গা করে নিয়েছে সামগ্রিক সংস্কৃতিতে। কেবল সাংবাদিক বা পণ্ডিতই নয়, যে-কেউ এগুলো থেকে উদ্ধৃতি দিতে পারে, এ নিয়ে তর্ক করতে পারে, এর থেকে ইসলাম সম্পর্কে দৃষ্টান্ত টানতে পারে। এরফলে এগুলোকে মনে করা হয় ইসলাম সম্পর্কিত আলোচনায় কষ্টি পাথরের মতো। এসব মতামত প্রবেশ করে সামগ্রিক সাংস্কৃতিক নীতিমালায়, ফলে তা পরিবর্তন করাও দুরূহ হয়ে দাড়ায়।

ইসলাম বিষয়ে প্রচলিত, রক্ষণশীল যে-ধারার প্রচারের কথা এতক্ষণ বললাম তার বাইরে ইসলাম সম্পর্কে আরেক ধরনের মনোভাব আছে; একে বলা যেতে পারে *বিরোধী জ্ঞান*[২৬]। বিরোধীজ্ঞান বলে আমি বোঝাচ্ছি এমন এক জ্ঞানকে যার স্রষ্টারা অত্যন্ত সচেতনভাবেই মনে করেন তারা প্রচলিত রক্ষণশীলতার বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে লিখছেন। কেন এবং কীভাবে ইসলামকে অধ্যয়ন করছেন সে প্রশ্নের জবাব তাদের কাছে গুরুত্বপূর্ণ। পদ্ধতিগত প্রশ্নে প্রাচ্যতত্ত্বের নীরবতার পরিবর্তে বরং পাণ্ডিত্যের রাজনৈতিক অর্থ সম্পর্কিত গভীরতর আলোচনাকে গ্রহণ করে নিয়েছেন এরা।

ইসলাম বিষয়ে প্রধানত তিন ধরনের বিরোধীজ্ঞান রয়েছে, যেগুলো সমাজে তিন ধারার শক্তির সৃষ্টি করে চ্যালেঞ্জ জানাচ্ছে প্রচলিত রক্ষণশীলতাকে। একটা হল অপেক্ষাকৃত তরুণ পণ্ডিতদের একটি দল। এরা রাজনৈতিকভাবে প্রবীণদের তুলনায় বেশি সৎ, মার্জিত। এরা অনুভব করে যুক্তরাষ্ট্র যে-বিশ্বরাজনীতির সাথে জড়িত তার অনেকটাই মুসলিম বিশ্বের সাথে কায়কারবারের ব্যাপার; আর এই বাস্তবতা কেবল নিরপেক্ষ সত্য নয়। প্রবীণদের মতো সামগ্রিক জ্ঞানে জ্ঞানী নয় এরা, বরং নির্দিষ্ট বিষয়ে বিশেষজ্ঞ; কাঠামোবাদী নৃ-বিজ্ঞান, কোয়ান্টিটিভ মেথড, মার্কিস্ট রীতি প্রভৃতি উদ্ভাবক কৌশল ব্যবহারে আগ্রহী।[২৭] জাতিকেন্দ্রিক প্রাচ্যতাত্ত্বিক জ্ঞানভাষ্যের ব্যাপারে এরা স্পর্শকাতর; প্রবীণরা যে "পৃষ্ঠপোষকতা পদ্ধতির" আশ্রয়ে হৃষ্টপুষ্ট, এরা তার বাইরে।

www.pathagar.com

এদের মধ্য থেকেই গড়ে ওঠেছে "অল্টারনেটিভ মিড্‌ল ইস্ট স্টাডিজ সেমিনার (AMESS)" ও "মিড্‌ল ইস্ট রিসার্চ এন্ড ইনফরমেশন প্রজেক্ট (MERIP)"। । এ ধরনের জোট সৃষ্টি হয়েছে ইউরোপেও। এরা একটা আরেকটার সাথে যোগাযোগ রাখে। প্রবীণরা ইসলাম বিচারের যেসব পরিপ্রেক্ষিত বিচারে অজ্ঞতা বা উপেক্ষা দেখিয়েছেন, এরা সেগুলোর আলোকেই ইসলামকে দেখতে আগ্রহী।

দ্বিতীয় দলটি প্রবীণ পণ্ডিতদের। এদের ব্যক্তিগত কাজই সরাসরি দাঁড়িয়ে গেছে রক্ষণশীল ধারার বিরুদ্ধে। যেমন ইরান বিশেষজ্ঞদের মধ্যে বার্কলের পণ্ডিত হামিদ আলগার ও ইউসিএলের নিকি খেদি; ইরানী বিপ্লবের আগে থেকেই এ দুজন ইরানী উলেমাদের রাজনৈতিক ভূমিকাকে গুরুত্ব দিয়ে দেখেছেন। মতের দিক থেকে ভিন্ন ভিন্ন অবস্থানে থেকে দুজনই সন্দেহ প্রকাশ করেছিলেন পাহলভী শাসনের স্থায়িত্ব সম্পর্কেও। তেমনি বারুচ কলেজের এরভান্দ আব্রাহামিয়ান শাহ-বিরোধী ধর্ম-নিরপেক্ষ শক্তির ব্যাপারে যে গবেষণা করেন তা ইরানী বিপ্লবের রাজনৈতিক গতি-ধারা সম্পর্কে মেধাবী অন্তর্দৃষ্টির যোগান দেয়। সাম্প্রতিক কালে হার্ভার্ডের মিশেল জি. ফিশার এবং ইংল্যান্ডে ফ্রেড হালিডে জরুরী কিছু কাজ করেছেন ইরান নিয়ে।

উল্লেখযোগ্য ব্যাপার হল এদের কেউ-ই মধ্যপ্রাচ্য অধ্যয়নকেন্দ্রিক প্রতিষ্ঠানে জড়িত নন। তবে তার অর্থ এই নয় যে, এদের খ্যাতি কম। বরং এর অর্থ হচ্ছে, হয়তো এরা সরকার বা করপোরেশনে জড়িত নয় বলেই ইসলাম বিষয়ক প্রথানুগ লেখকদের দৃষ্টি এড়িয়ে যাওয়া ব্যাপারগুলোও এদের চোখে পড়ে।

তবে কার্যকর প্রভাব রাখতে হলে নিজ সমাজে আরো বেশি রাজনীতি-ঘেঁষা হয়ে উঠতে হবে তরুণ পণ্ডিতের দলটিকে। কেবল রক্ষণশীলদের থেকে ভিন্নমত পোষণ করলেই চলবে না, সেই মতকে গ্রহণযোগ্য করতে হবে। তা করার অর্থ লেখা ও লেখা প্রকাশ করার বাইরেও জরুরী কিছু কাজ করা; তাই তাদের সামনে পড়ে আছে রাজনৈতিক ও সাংগঠনিক সংঘাতময় দীর্ঘ এক পথ।

এ ছাড়াও লেখক, কর্মী, বুদ্ধিজীবীদের আরেকটি দল আছে যারা মার্কা-মারা ইসলাম বিশেষজ্ঞ না হলেও বিরোধী মত প্রকাশের মধ্য দিয়ে সমাজে নির্দিষ্ট ভূমিকা রাখেন। এরা হলেন যুদ্ধ-বিরোধী, সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী লড়াকু মানুষ, ভিন্নমতের যাজক, আমূলবাদী বুদ্ধিজীবী ও শিক্ষক, প্রমুখ। ইসলাম সম্পর্কে এদের মনোভাব প্রাচ্যতত্ত্বের সাথে সম্পর্কিত নয়, হয়তো সাংস্কৃতিক প্রাচ্যতত্ত্বের এক-আধটু প্রভাব পড়েছে কারো কারো ওপর।

তবু আই. এফ. স্টোনের মতো মানুষদের কথা বিবেচনা করতে পারি আমরা। ইসলামের প্রতি সহানুভূতির অভাব আছে এদের মধ্যে, সংস্কৃতিগত অবিশ্বাসও আছে; তবে এরা এরচেয়ে পরিস্কারভাবে পরিষ্কার জানেন সাম্রাজ্যবাদ কী জিনিষ, মানুষের দুর্ভোগ ব্যাপারটা কেমন...হোক সে মানুষ মুসলমান, ইহুদি বা খ্রিস্টান। ইরানী বিপ্লবী সরকারের প্রতি আপোষমুখি নীতি গ্রহণের জন্য ওকালতি করেছিলেন তার মতো মানুষই, সরকারী বা প্রাতিষ্ঠানিক বিশেষজ্ঞরা নয়।

www.pathagar.com

এদের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হল উত্তর-উপনিবেশী সমাজের গতিপ্রকৃতিটা বুঝতে পারেন। এদের মতে "ইসলামী মন" বা "ইসলামী ব্যক্তিত্ব" প্রভৃতি সীমাআরোপক লেবেল নয়, প্রকৃত মানবীয় অভিজ্ঞতাই মনোযোগের বিষয়। প্রকৃত লেনদেনেও আগ্রহ আছে তাদের। এইসব লোকেরা রক্ষণশীলতার সীমানা পার হয়ে গেছেন জেনেশুনে, সচেতনভাবে। রামসে ক্লার্কের কথা উল্লেখ করা উচিত, সাহসের সাথে তেহরানে যাওয়ার কারণে। রিচার্ড ফ়ক, উইলিয়াম স্লোয়েন কফিন জুনিয়র, ডন লিউসের মত বহু মানুষ এবং ফ্রেন্ড সার্ভিস কমিটি, ক্ল্যার্গি এন্ড লেইটি কনসার্নড ও অন্যান্য সংঘ-সমিতি সাহসী ভূমিকা রেখেছেন ইরানের সবচেয়ে দুঃসময়ে। *দি প্রগ্রেসিভ, মাদার জোনস, দি ন্যাশন* প্রভৃতি যে-সব পত্রিকা বিরুদ্ধ-মত প্রকাশে ইতিবাচক ভূমিকা পালন করেছে সেগুলোর কথাও স্মরণ করতে হবে। একই ঘটনা ঘটেছে ইউরোপেও।

আমার মতে এই তিন দলের মানুষ সম্পর্কে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার হল এদের কাছে জ্ঞান ঘটনার নিষ্ক্রিয় বর্ণনা ও "গৃহীত" মতের উল্লেখ মাত্র নয়, বরং জ্ঞান হচ্ছে সক্রিয় খোঁজের মাধ্যমে অর্জনের জিনিষ। অন্য সংস্কৃতি ও শেষে রাজনৈতিক প্রশ্নে প্রভাবসঞ্চারী এই দৃষ্টিভঙ্গি এবং অগ্রসর পশ্চিমা সমাজের পোষা বিশেষায়িত প্রাতিষ্ঠানিক জ্ঞানের সংগ্রাম পরস্পর-বিরোধী সংগ্রাম এক নয়া যুগের সূচক। তা ছাড়িয়ে গেছে এইসব সঙ্কীর্ণ প্রশ্নের সীমানা যে, কেউ ইসলামীমুখি বা ইসলাম-বিরোধী কি না, কিংবা দেশদ্রোহী বা দেশপ্রেমিক কি না। আমাদের বিশ্ব ক্রমেই আরো পরস্পর লগ্ন হয়ে ওঠার কারণে সম্পদের দুষ্প্রাপ্য উৎস, কৌশলগত এলাকা ও বিপুল জনশক্তির নিয়ন্ত্রণ আরো আকাঙ্ক্ষিত ও প্রয়োজনীয় বিষয় হিসেবে দেখা দেবে। নৈরাজ্য ও বিশৃঙ্খলা ব্যাপারে সযত্ন-লালিত ভয় মতের দিক থেকে আরো অন্তরঙ্গতা নিয়ে আসার কথা, তেমনি "বাইরের" বিশ্বের প্রসঙ্গে আরো বেশি অবিশ্বাসও সৃষ্টি হওয়া স্বাভাবিক। ইসলামী বিশ্ব বা পশ্চিম উভয় ক্ষেত্রেই এ কথা সত্যি। এরই মধ্যে শুরু হয়ে যাওয়া এই যুগে জ্ঞানের উৎপাদন ও সঞ্চারণ পালন করবে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা। তবু, মানবীয় ও রাজনৈতিক পটভূমিতে জ্ঞানকে বুঝতে হবে সহাবস্থান ও সম্প্রদায়ের স্বার্থে ব্যবহার্য অর্জন করার মতো জিনিষ হিসেবে... বিশেষ কোনো বর্ণ, ধর্ম, জাতি,শ্রেণীর জন্য নয়; যতদিন জ্ঞানকে এভাবে বোঝা সম্ভব না হবে, ততদিন মানুষের ভবিষ্যতজুড়ে অশুভ'র-ই আভাস।

www.pathagar.com

জ্ঞান ও তাফসীর

প্রাকৃতিক জগত-বিষয়ক জ্ঞান বাদে, মানব-সমাজ সম্পর্কিত সকল জ্ঞানই ঐতিহাসিক। কাজেই এ জ্ঞান বিচার-বিবেচনা ও তাফসীরের ওপরে নির্ভরশীল। তার অর্থ এই নয় যে, বাস্তব ঘটনা বা উপাত্ত বলে কিছু নাই; বরং তাফসীরে ঘটনারাজির কী তাৎপর্য দাঁড় করানো হচ্ছে তার ওপরই নির্ভর করে ঘটনার গুরুত্ব। নেপোলিয়ন বাস্তবে বেঁচেছিলেন এবং ফরাসি সম্রাট ছিলেন, এ নিয়ে কেউ তর্ক তুলে না। কিন্তু তিনি একজন মহান শাসক ছিলেন, না কি, কোন কোন দিক থেকে সর্বনাশা শাসক ছিলেন সে ব্যাপারে যথেষ্ট তাফসীরি মতানৈক্য রয়েছে। এ ধরনের মতানৈক্য থেকেই ঐতিহাসিক রচনার সৃষ্টি, তা থেকেই আসে ঐতিহাসিক জ্ঞান। কারণ তাফসীরকারী কে, কাকে লক্ষ্য করে তাফসীর করা হচ্ছে, তাফসীরের উদ্দেশ্য কী, কোন ঐতিহাসিক মুহূর্তে তাফসীরটি করা হচ্ছে—এইসব বিষয়ের ওপর তাফসীর নির্ভর করে। এই অর্থে সকল তাফসীরই—বলা যায়—পরিস্থিতিজনিত। এগুলো সবসময় একটি পরিস্থিতিতে সম্পন্ন হয়, তাফসীরের ওপর যার প্রভাব বরাবরই আত্মীকরণমুখি[২৯]। অন্য তাফসীরকারীরা যা বলেছেন তা সমর্থন করা বা তাতে অনাস্থা জ্ঞাপন অথবা সেগুলোর পুনরাবৃত্তি করার মধ্য দিয়ে এটি সেই সব তাফসীরকারীর বক্তব্যের সাথেও সম্পর্কযুক্ত হয়। পূর্ব-দৃষ্টান্ত বা অন্য তাফসীরের সাথে কোনোরূপ সংশ্লিষ্টতা ছাড়া তাফসীর হয় না। যেমন কেউ ইসলাম, বা চীন কিংবা মার্কসবাদ সম্পর্কে কিছু লিখতে গিয়ে অবশ্যই এ বিষয়ে অন্যান্য বক্তব্য সম্পর্কে জেনে নেবেন কোনো না কোনোভাবে, যাতে তিনি অপ্রাসঙ্গিক বা প্রয়োজনাতিরিক্ত না হয়ে পড়েন। কোনো লেখাই সম্পূর্ণ মৌলিক রচনার মতো নতুন না (বা হতে পারে না)। কারণ মানব সমাজ সম্পর্কে লেখার সময় কেউ অংক কষতে বসে না, তাই এতে আমূল মৌলিকতাও আশা করা যায় না।

কাজেই, ভিন্ন সংস্কৃতি সম্পর্কে জ্ঞান বিশেষ করে "অবৈজ্ঞানিক" অযাথার্থ্য ও তাফসীরের পরিস্থিতির অধীন। তবু আমরা সাময়িকভাবে বলতে পারি অন্য সংস্কৃতি সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন সম্ভব; এর সাথে আরেকটা গুরুত্বপূর্ণ কথা বলা দরকার যে, এ জ্ঞান কাম্যও, তবে দুটো শর্তপূরণ সাপেক্ষে; ঘটনাক্রমে, সাম্প্রতিক ইসলাম ও মধ্যপ্রাচ্য অধ্যয়ন মোটের ওপর এ দুটো শর্তই পূরণ করে না। প্রথমত, শিক্ষার্থীর মধ্যে এমন বোধ থাকতে হবে যে তিনি যে সংস্কৃতি ও জনগোষ্ঠীকে অধ্যয়ন করবেন তাদের প্রতি তার জবাবদিহিতা আছে এবং ঐ সংস্কৃতি ও জনগোষ্ঠীর সাথে তার সম্পর্ক দমনমুখি নয়। আগে আমি বলেছি অপশ্চিমা জগত সম্পর্কে পশ্চিম যা জানে তার বেশিরভাগটাই জেনেছে উপনিবেশী পরিকাঠামোর মধ্য দিয়ে; তাই ইউরোপীয়

www.pathagar.com

পণ্ডিত তার বিষয়ের দিকে অগ্রসর হয়েছেন সামগ্রিক আধিপত্যের অবস্থান থেকে। এই বিষয় সম্পর্কে তিনি যা বলেছেন তা বলতে গিয়ে অন্যান্য ইউরোপীয়'র বক্তব্য ছাড়া আর কারো মতামতের উল্লেখ করেননি বললেই চলে। ইসলাম ও ইসলামী জনগোষ্ঠী সম্পর্কিত জ্ঞান সামগ্রিকভাবে কেবল আধিপত্য ও সংঘাত থেকেই নয়, সাংস্কৃতিক বিদ্বেষ থেকেও অগ্রসর হয়েছে; তার কারণগুলো আমি উল্লেখ করেছে এ বইয়ের শুরুতে এবং অরিয়েন্টালিজমে। পশ্চিমের সাথে যা কিছুর মৌলিক বিরোধ, আজকাল তার সাথে মিলিয়ে নেতিবাচকভাবে সংজ্ঞায়িত করা হয় ইসলামকে। এবং এ টানাপোড়েন এমন এক পরিকাঠামো প্রতিষ্ঠিত করেছে যা ইসলাম-বিষয়ক জ্ঞানকে আমূল সংকুচিত করে। যতদিন এই পরিকাঠামো কার্যকর থাকবে ততদিন মুসলমানদের যাপিত অভিজ্ঞতাস্বরূপ ইসলামকে জানা সম্ভব হবে না। দুর্ভাগ্যজনকভাবে, এ অবস্থা যুক্তরাষ্ট্রের ক্ষেত্রে নিরেট সত্য, ইউরোপের ক্ষেত্রে এর সত্যতা সে তুলনায় সামান্য কম।

দ্বিতীয় শর্তটি প্রথমটির পরিপূরক; এটি প্রথম শর্তকে পূর্ণতা দেয়। প্রকৃতি সম্পর্কিত জ্ঞানের বিপরীতে সামাজিক পৃথিবী সম্পর্কিত জ্ঞান মূলত তা-ই আমি যাকে বলছি তাফসীর: এটি জ্ঞানের মর্যাদা লাভ করে বিভিন্ন উপায়ে, যার কিছু কিছু বুদ্ধিবৃত্তিক, বেশিরভাগই সামাজিক, এমনকি রাজনৈতিকও। তাফসীর প্রথমত নির্মাণের একটি ধরন, অর্থাৎ তা নির্ভর করে মানুষের মনের বাসনাযুক্ত-ইচ্ছাকৃত তৎপরতার ওপর, যা সযত্নে ও অধ্যবসায় সহকারে ঢালাই করে ও আকার দেয় তার আগ্রহের জিনিষটাকে। নির্দিষ্ট একটি সময় ও স্থানে একজন নির্দিষ্ট ব্যক্তির দ্বারা এ কাজ সম্পন্ন হয়, যার রয়েছে বিশেষ এক পরিস্থিতিতে নির্দিষ্ট পটভূমি ও একরাশ লক্ষ্য। কাজেই অন্য সংস্কৃতি সম্পর্কিত জ্ঞান প্রধানত যে বিষয়টির ওপর নির্ভরশীল অর্থাৎ বিভিন্ন রচনার তাফসীর, তা দূষণমুক্ত নিরাপদ পরীক্ষাগারে সম্পন্ন হতে পারে না, তেমনি তা বিষয়মুখি ফলাফল বলে গণ্য হওয়ার ভাণও করতে পারে না। তা একরকম সামাজিক ক্রিয়া এবং এর সৃজক পরিস্থিতির সাথে জট লাগিয়ে বাঁধা, সেই পরিস্থিতি একে হয় জ্ঞানের মর্যাদা দেয় অথবা সেই মর্যাদার অনুপযুক্ত ঘোষণা করে। কোনো তাফসীরই এই পরিস্থিতি অবহেলা করতে পারে না, এবং এই পরিস্থিতির তাফসীর ছাড়া কোনো তাফসীরই পরিপূর্ণ নয়।

দেখা যাবে অনুভূতি, অভ্যাস, প্রথা, সংসর্গ ও মূল্যবোধের মত অবৈজ্ঞানিক জঞ্জালও তাফসীরের অবিচ্ছেদ্য অংশ। প্রত্যেক তাফসীরকারী একজন পাঠক; এবং নিরপেক্ষ বা মূল্য-বিরহিত পাঠকের অস্তিত্ব নাই। অর্থাৎ প্রত্যেক পাঠকই এক একটি ব্যক্তিক অহং, আবার সমাজেরও সদস্য; সমাজের সাথে সংযোগ-স্থাপক সকল সম্পর্ক তাকে যুক্ত করে সেই সমাজের সাথে। দেশপ্রেম বা অন্ধ স্বাদেশিকতা থেকে শুরু করে ভয় বা হতাশার মতো অনুভূতির মধ্যে কাজ করার সময় তাফসীরকারী অবশ্যই তার আনুষ্ঠানিক শিক্ষা (যা নিজেই দীর্ঘ এক তাফসীরী প্রক্রিয়া) থেকে পাওয়া যুক্তি ও তথ্য প্রয়োগ করার চেষ্টা করবেন সুশৃঙ্খল উপায়ে। এক পরিস্থিতি থেকে আরেক পরিস্থিতিতে, অর্থাৎ তাফসীরকারীর পরিস্থিতি থেকে রচনার সময় ও স্থানের

www.pathagar.com

পরিস্থিতিতে প্রবেশের বাধা দূর করতে হয় প্রবল চেষ্টায়। দূরত্ব ও সাংস্কৃতিক বাধা পেরিয়ে যাওয়ার বাসনাযুক্ত সচেতন প্রয়াসের ফলেই অন্য সমাজ ও সংস্কৃতি সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন সম্ভব, আবার এই বৈশিষ্ট্যই জ্ঞানকে সীমায়িত করে। এ পর্যায়ে তাফসীরকারী নিজেকে বুঝেন তার মানবীয় পরিস্থিতির আলোকে, আর রচনাকে বুঝেন এর সংশ্লিষ্ট পরিস্থিতির প্রেক্ষাপটে। যা কিছু দূর কিন্তু মানবীয় তার সম্পর্কে সচেতনতার ফলস্বরূপ এটি ঘটতে পারে। বলা প্রায়-নিষ্প্রয়োজন যে, গোটা প্রক্রিয়াটির সাথে প্রথাগত প্রাচ্যতাত্ত্বিকদের নির্দেশিত 'নয়া ও সম্পূর্ণ ভিন্ন জ্ঞান" অথবা প্রফেসর বাইন্ডারের আত্ম-সংশোধনমূলক "শাস্ত্রগুলোর" তেমন কোনো সংযোগ নেই।

তাফসীরী প্রক্রিয়ার শেষে পৌঁছানো যায় জ্ঞানে—যে জ্ঞান কোনোভাবেই স্থির কোনো কিছু নয়। তাফসীরী প্রক্রিয়ার এই বিমূর্ত বিবরণ সম্পর্কে আরেকটা কথা বলা দরকার। যেখানে স্বার্থ নেই সেখানে তাফসীর, উপলব্ধি ও জ্ঞান কোনোটাই সম্ভব নয়। একে মামুলি সত্য বলে মনে হতে পারে, কিন্তু এই প্রকট সত্যই সচরাচর উপেক্ষিত বা অস্বীকৃত হয়। সমকালের কোনো আরবী বা জাপানী উপন্যাসের পাঠ ও অর্থ উদ্ধার করতে গিয়ে একজন মার্কিন সমালোচক যেমন অচেনা জিনিষের সাথে কাজ করতে হয় তা একজন রসায়নবিদ কর্তৃক কোনো রাসায়নিক সূত্রের অর্থ উদ্ধারের কাজের তুলনায় ভিন্ন। রাসায়নিক উপাদানসমূহ অবিচ্ছেদ্যভাবে সক্রিয় নয় এবং কারো অনুভূতিকে জড়ায় না; অবশ্য সম্পূর্ণ বাইরের দিককার কারণে সেগুলো বিজ্ঞানীর মধ্যে আবেগমূলক সংযোগ উস্কে দিতে পারে। যাকে বলা যায় মানবতাবাদী তাফসীর তার ক্ষেত্রে উল্টোটাই সত্যি; বহু তাত্ত্বিকের মতে এ জাতীয় তাফসীরের প্রকৃত সূচনা হয় নিজের পক্ষপাতিত্বের ব্যাপারে তাফসীরকারীর সচেতন হয়ে ওঠা, যে রচনাটির তাফসীর হবে তার সাথে তাফসীরকারীর বিচ্ছিন্নতার বোধ, ইত্যাদির মধ্য দিয়ে। হ্যান্স জর্জ গ্যাডামার যেমন বলেছেন :

> যিনি একটি রচনা বুঝতে চাচ্ছেন তিনি সেই রচনা থেকে কোনো একটি বক্তব্য লাভের ব্যাপারে মানসিকভাবে প্রস্তুত। এ কারণে তাফসীরী কাজে প্রশিক্ষিত মন প্রথম থেকেই রচনাটির নতুনত্বের গুণ সম্পর্কে অবশ্যই স্পর্শকাতর হবে। এ ধরনের স্পর্শকাতরতার জন্য লক্ষ্যীভূত বস্তুটি সম্পর্কে "নিরপেক্ষতা" প্রয়োজন হয় না, বা নিজের আমিত্ব বিলীন করে দেয়ারও দরকার হয় না; বরং এ হচ্ছে নিজের পূর্বার্থসমূহ (পূর্ব-অভিজ্ঞতার ফল হিসেবে এরই মধ্যে যে-সব অর্থ বা তাফসীর বর্তমান, সেগুলো) ও পক্ষপাতিত্ব অঙ্গীভূত করে নেয়ার ব্যাপার। গুরুত্বপূর্ণ কাজ হচ্ছে নিজের পক্ষপাতিত্ব সম্পর্কে সচেতন থাকা, যাতে গ্রন্থটি তার তাবৎ নতুনত্বের মধ্য দিয়ে নিজেকে তুলে ধরে এবং কারো পূর্বার্থসমূহের বিপরীতে আপন সত্য জাহিরে সক্ষম হয়।[৩০]

কাজেই, ভিন্ সংস্কৃতিতে রচিত কোনো বই পাঠের ক্ষেত্রে প্রথম কাজ হচ্ছে এর দূরত্ব সম্পর্ক সচেতন হওয়া; (সময় ও স্থান উভয় দিক থেকে) এই দূরত্বের মূল শর্ত

www.pathagar.com

হচ্ছে—যদিও একমাত্র অর্থে নয়, তবে আক্ষরিক অর্থে—নিজের কাল ও স্থানে তাফসীরকারীর উপস্থিতি। আমরা দেখেছি রক্ষণশীল প্রাচ্যতাত্ত্বিক বা "অঞ্চল অধ্যয়নের" কায়দা হচ্ছে দূরত্বের সাথে কর্তৃত্বের সমীভবন, দূরের সংস্কৃতির অচেনা অবস্থাকে পণ্ডিতি জ্ঞানভাষ্যের কর্তৃত্বময় বাকচাতুর্যে অধিভুক্ত করে নেয়া, এতে জ্ঞানের সামাজিক মর্যাদা নিহিত; কিন্তু সেই অচেনা অবস্থা তাফসীরকারীর নিকট থেকে কী বের করে নিয়ে এসেছে এবং কোন ক্ষমতা-কাঠামোয় তাফসীরকারীর কাজটি সম্ভব হয়েছে সে বিষয়ে কোনো উল্লেখ থাকে না। আমি সোজাসুজিই বলছি যে, পশ্চিমে ইসলাম সম্পর্কিত কোনো লেখক আজকাল প্রকাশ্যে স্বীকার করেন না যে "ইসলাম" গণ্য হয় একটি শত্রু সংস্কৃতি হিসেবে, কিংবা একজন পেশাজীবী পণ্ডিত ইসলাম সম্পর্কে যা কিছু বলেন তা বলেন করপোরেশন, প্রচারমাধ্যম ও সরকারের প্রভাব বলয়ের মধ্যে থেকে; ফলে এসব কিছুই তাফসীর সৃষ্টিতে বড়োসড়ো ভূমিকা পালন করে এবং ইসলাম-বিষয়ক জ্ঞানকে পরিণতি করে কাম্য বিষয়ে ও "জাতীয় স্বার্থের" অনুকূল ব্যাপারে। আমার আলোচিত যুক্তিতর্কের একটি আদর্শ নমুনা হলেন লিওনার্দ বাইন্ডিং: এ ব্যাপারগুলো তিনি উল্লেখ করেন, অতপর গায়েব করে ফেলেন পেশাবৃত্তিতা ও "শাস্ত্রসমূহের" প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদনের জন্য লেখা একটিমাত্র বাক্যে; এগুলোর জোটবদ্ধ কাজ হলো যৌক্তিক বিষয়মুখিনতার মুখোশের জন্য যা কিছু সমস্যা তৈরি করে তার সবকিছু বাতিল করে দেয়া। এই হলো সামাজিকভাবে গ্রহণযোগ্য জ্ঞানের নমুনা, যা মুছে ফেলে তার উৎপাদক ধাপগুলোকে।

তাফসীরের একটি দিক হিসেবে "স্বার্থ"কে আরো দৃষ্টিগ্রাহ্য ও নিরেট করা সম্ভব। কেউ ঘটনাক্রমে ইসলাম, ইসলামী সংস্কৃতি বা সমাজের দেখা পেয়ে যায় না। পশ্চিমের শিল্পায়িত দেশগুলোর মানুষদের সাথে ইসলামের দেখা-শোনা, হয় রাজনৈতিক তেল-সংকটের বদৌলতে, না হয় মৌলবাদ ও সন্ত্রাসের মাধ্যমে, নয়তো প্রচার মাধ্যমের মনোযোগ মারফত, নতুবা বিশেষজ্ঞতার দীর্ঘ ঐতিহ্য অর্থাৎ ইসলাম সম্পর্কে প্রাচ্যতাত্ত্বিক ভাষ্যের বদৌলতে। আধুনিক মধ্যপ্রাচ্যের ইতিহাসে বিশেষজ্ঞ হতে মনস্থ করেছেন এমন একজন তরুণ বা তরুণী ঐতিহাসিকের ব্যাপারটিকে উদাহরণ হিসেবে নেয়া যাক। তিনি এ বিষয়টি অধ্যয়ন করতে আসেন তিনটি উপাদানের সক্রিয়তার মধ্যে, যেগুলো পরিস্থিতি ঢালাই করে আকার দেয়; এই পরিস্থিতিতেই "বাস্তব ঘটনাবলী"—তথাকথিত কাঁচা উপাত্তসমূহ—অনুমানে ধরা নেয়া হয়। এর মধ্যে তার ব্যক্তিগত ইতিহাস, সংবেদনশীলতা, বুদ্ধিবৃত্তিক গুণাবলীকেও হিসেবে ধরতে হবে। বিষয়টি সম্পর্কে তার আগ্রহের একটা গুরুত্বপূর্ণ দিক গঠিত এইসব নিয়ে। নিখাদ অনুসন্ধিৎসা আবার আরো কিছু ব্যাপার দ্বারা প্রভাবিত হয়: স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, সেনাবাহিনী বা তেল কোম্পানীর পরামর্শকের কাজ পাওয়ার সম্ভাবনা; কনফারেন্স, টেলিভিশন বা বক্তৃতা মঞ্চে আবির্ভূত হওয়ার বাসনা; বিখ্যাত পণ্ডিত হওয়ার অর্থাৎ ইসলাম যে একটি চমৎকার (এবং সে কারণে ভয়াবহ) সাংস্কৃতিক পদ্ধতি তা "প্রমাণ" করার আকাঙ্ক্ষা; সেই সংস্কৃতি ও তাকে জানার আকাঙ্ক্ষা এ দুয়ের মধ্যে উপলব্ধির

www.pathagar.com

সাঁকো হয়ে ওঠার উচ্চাকাঙ্ক্ষা। এই ঐতিহাসিক যা অধ্যয়ন করতে যাচ্ছেন তাতে ছাপ ফেলে সংশ্লিষ্ট রচনাসমূহ ও অধ্যাপকবৃন্দ, পণ্ডিতি ঐতিহ্য ও সংশ্লিষ্ট বিশেষ মূহূর্তটিও। শেষে, বিবেচনাযোগ্য আরো কিছু দিক থাকে। দৃষ্টান্তস্বরূপ, কেউ যদি উনিশ শতকের সিরিয়ায় প্রচলিত ভূমিস্বত্ব নিয়ে গবেষণা করে থাকেন তা হলে, তার অধ্যয়ন যতই খটখটে ও বিষয়মুখি হয়ে থাকুক না কেন, তা সমকালীন নীতির সাথে প্রাসঙ্গিক হওয়ার সম্ভাবনা চৌদ্দ আনা, বিশেষ করে এমন কোনো সরকারী কর্মকর্তার ক্ষেত্রে যিনি সিরীয় বাথ পার্টির ক্ষমতার বিপরীত-শক্তি হিসেবে ঐতিহ্যক্রমিক কর্তৃত্বের (যা ভূমিস্বত্বের সাথে সম্পর্ক যুক্ত, তার) গতি-প্রকৃতি বুঝতে খুবই উদগ্রীব।

তবে প্রথমত, দূরবর্তী সংস্কৃতির সংস্পর্শ লাভের জন্য যদি কোনো দমনমুক্ত চেষ্টা চালানো হয়ে থাকে, দ্বিতীয়ত, তাফসীরকারী যদি তার নিজের তাফসীরী পরিস্থিতি সম্পর্কে সজাগ থাকেন (অর্থাৎ তাফসীরকারী যদি বুঝতে পারে অন্য সংস্কৃতি সম্পর্কিত জ্ঞান পরম জিনিষ নয়, বরং সেই জ্ঞান উৎপাদনকালীন তাফসীরী পরিস্থিতির সাথে আপেক্ষিক সম্পর্কে সম্পর্কিত) তাহলে এমন সম্ভাবনাই বেশি যে, তিনি অনুভব করতে পারবেন ইসলাম ও অন্যান্য "অচেনা" সংস্কৃতির প্রতি ঐতিহ্যিক মনোভাব খুবই সঙ্কীর্ণ। সে তুলনায়, ঐতিহ্যিক মনোভাবের সঙ্কীর্ণতা উত্তরে যাওয়ার লক্ষ্যে বিরোধীজ্ঞান তা থেকে প্রয়োজনীয় দূরত্বে অবস্থান নেয়। কারণ বিরোধী পণ্ডিতেরা এই ধারণা প্রত্যাখ্যান করেন যে ইসলাম সম্পর্কিত জ্ঞানকে অব্যবহিত সরকারী নীতিমালার স্বার্থের তাঁবেদার হতে হবে, কিংবা একে প্রচার মাধ্যমের বানানো ইসলামের ভাবমূর্তিতে মালমশলা সরবরাহ করতে হবে, যে প্রচার মাধ্যম আবার গোটা বিশ্বকে সংহিসতা ও জঙ্গীবাদের যোগান দেবে; ঐসব পণ্ডিতেরা তুলে ধরেন জ্ঞান ও ক্ষমতার জটিল সম্পর্ককে। এর মধ্য দিয়ে তার যা চান তা হল ইসলামের সাথে ক্ষমতার প্রয়োজনে স্থাপিত সম্পর্কের বাইরে অন্য সম্পর্ক স্থাপন। বিকল্প সম্পর্ক খোঁজার অর্থ হলো অন্য কোনো তাফসীরী পরিস্থিতির খোঁজ করা; এর ফলে তৈরি হয় অনেক বেশি সতর্ক একটি পদ্ধতিগত বোধ।

সবশেষে, যাকে সমালোচকেরা বলেছেন তাফসীরকারী চক্র, তার থেকে সহজ মুক্তির কোনো উপায় নেই যদিও। সংক্ষেপে বলা যায়, সামাজিক পৃথিবী সম্পর্কিত জ্ঞান তার ভিত্তিস্বরূপ তাফসীরের চেয়ে কখনো ভালো কিছু নয়। ইসলামের মতো একটি জটিল ও বোধ-ফাঁকি দেয়া বিষয়ে আমাদের যাবতীয় জ্ঞান আসে বইপত্র, ভাবমূর্তি ও অভিজ্ঞতা মারফত; কিন্তু এগুলো ইসলামের প্রত্যক্ষ মূর্তি নয় (দৃষ্টান্ত দিলে যা বোঝা যাবে), বরং প্রতিনিধিত্ব বা এর তাফসীর। অন্য কথায়, ভিন্ন সংস্কৃতি, সমাজ ও ধর্ম-সম্পর্কিত জ্ঞান আমাদের নিকট পৌছায় পণ্ডিতের—সময়, স্থান ও অন্তর্গত গুণাবলীর সমন্বয়ে গড়ে ওঠা—ব্যক্তিক পরিস্থিতি, ঐতিহাসিক পরিস্থিতি ও সামগ্রিক রাজনৈতিক পরিস্থিতির সাথে অপ্রত্যক্ষ প্রমাণাদির সংমিশ্রণের মাধ্যমে। যে সমাজে এই জ্ঞান উৎপন্ন হয় তার চাহিদা সাপেক্ষে নির্ধারত হয় ঐ জ্ঞানের যাথার্থ্য বা অযাথার্থ্য, ভালোত্ব বা মন্দত্ব। তবে বাস্তব ঘটনার একটা ব্যাপার তো অবশ্যই আছে, যা না হলে

www.pathagar.com

জ্ঞান অসম্ভব: আরবী, বারবার এবং মরক্কো সমাজ ও দেশটি সম্পর্কে কিছুই না জেনে কিভাবে মরক্কোর ইসলামকে জানা যাবে? তবে, এ ছাড়াও, মরক্কোর ইসলাম-সম্পর্কিত জ্ঞান ওখানকার সাথে এখানকার যোগাযোগ—একটি নিষ্ক্রিয় বস্তু ও তার ধারকের সংযোগের জিনিষ নয়, তা হচ্ছে (সচরাচর) উভয়ের মিথষ্ক্রিয়ার ব্যাপার, যা কোনো উদ্দেশ্যে পরিচালিত যেমন একটি পণ্ডিতি নিবন্ধ, বক্তৃতা বা টেলিভিশন সম্প্রচারে আবির্ভূত হওয়া অথবা নীতি-নির্ধারকদের পরামর্শ প্রদান। উদ্দেশ্য পূরণ হলে ধরে নেয়া হয় জ্ঞান উৎপাদিত হয়েছে। জ্ঞানের অন্য ব্যবহার আছে (এতে এর ব্যবহারহীনতাও অন্তর্ভুক্ত), তবে প্রধান প্রধানগুলো কার্যকর ও সহায়ক।

কাজেই যা জ্ঞান হিসেবে চলছে তা অত্যন্ত মিশ্রিত জিনিষ; তা নির্ধারণে আভ্যন্তরীণ চাহিদার চেয়ে বাইরের চাহিদার ভূমিকা বেশি। আমেরিকার নামধন্য কোনো পণ্ডিত কর্তৃক পাহলভী শাসনামলের ইরানের এলিটদের সম্পর্কে গবেষণা সেইসব কর্মকর্তার কাছে খুব জরুরী মনে হবে, যারা রাজকীয় শাসনের সাথে লেনদেনে নিয়োজিত। কিন্তু রক্ষণশীল বৃত্তের বাইরের কোনো ইরান বিশেষজ্ঞের বিচারে ঐ গবেষণাকে মনে হবে ভুলভ্রান্তি ও ত্রুটিপূর্ণ বিবেচনায় ভরা।[৩১] বিচারের ভিন্ন ভিন্ন আদর্শের অর্থ এই নয় যে, আরো ভালো নিয়ামক খুঁজতে হবে, আরো কড়া কষ্টিপাথর দরকার। বরং এতে আমাদের স্মরণ হওয়া দরকার যে, তাফসীরের প্রকৃতিই আমাদেরকে আবার তাফসীরের সৃষ্ট সমস্যার দিকে ফিরিয়ে নিয়ে যায়; যেন প্রশ্ন করি কার জন্যে, কী উদ্দেশ্যে এবং কেন এই পরিপ্রেক্ষিতে করা তাফসীরটি অন্য আরেক পরিপ্রেক্ষিতের তাফসীরের তুলনায় অধিক গ্রহণযোগ্য। তাফসীর, জ্ঞান, যেমন ম্যাথুউ আর্নল্ড বলেছেন, এবং সংস্কৃতি হচ্ছে লড়াইয়ের ফসল, এগুলো বেহেশতের উপহার নয়।

এ বইয়ে আমার বক্তব্য হচ্ছে, আমরা প্রতিষ্ঠান, সরকার ও প্রচার মাধ্যমে ইসলাম সম্পর্কে মতাদর্শ-প্রভাবিত, রক্ষণশীল ধারার যে-প্রচার দেখি সেগুলো পরস্পর সম্পর্কিত: এবং পশ্চিমে অন্যান্য ধারার প্রচারের তুলনায় এটি বেশি বিস্তৃত, প্রভাবশালী, প্ররোচক। এ জাতীয় প্রচারের সাফল্যে কারণ এই নয় যে তা সত্য ও নিখুঁত; বরং এর সাফল্যের আসল কারণ হচ্ছে এর স্রষ্টা ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের রাজনৈতিক প্রভাব। আমি এও বলেছি যে, এ প্রচার কাজ ইসলাম সম্পর্কে জ্ঞান অর্জনের চাহিদার খুব সামান্যই পূরণ করতে পেরেছে। তা ইসলাম সম্পর্কে বিশেষ এক ধরনের জ্ঞানের বিজয় নয়, মূলত বিশেষ এক ধরনের তাফসীরের জয়। কিন্তু সেই তাফসীর চ্যালেঞ্জবিহীন থাকেনি এবং অনুসন্ধানী ও অ-রক্ষণশীল মনের প্রশ্নের সামনে অভেদ্যও নয়।

এ কারণে উপসাগরীয় যুদ্ধ ব্যাখ্যায় "ইসলাম" কথাটা কাজে আসেনি, যেমন বিশশতকের কালো আমেরিকানদের অভিজ্ঞতা ব্যাখ্যায় "নিগ্রো মেন্টালিটি" কথাটাও ব্যর্থ হয়েছে। যে-সব বিশেষজ্ঞ এগুলো ব্যবহার করে এবং এগুলোর ওপর নির্ভর করেই খেয়ে পরে বাঁচে, এগুলো তাদেরকে আত্মকামী তৃপ্তি দেয় বটে, কিন্তু এইসব সর্বাত্মকবাদী ধারণাসমূহ ঘটনার তীব্র গতিবেগ কিংবা ঘটনাসমূহের উৎপাদক জটিল শক্তির সাথে তাল মিলিয়ে চলতে পারে না। এর ফলে সমরূপমুখি ধারণার বিবৃতি ও

www.pathagar.com

প্রকৃত ইতিহাসের বহুগুণ শক্তিশালী ধারণা ও ধারাহীনতার বিবৃতির মধ্যে থেকে যায় ক্রমবর্ধমান ফাঁক। মাঝে মধ্যে এই ফাঁকের মধ্যে পা দিয়েছেন এক এক জন মানুষ, সঙ্গত প্রশ্ন তুলেছেন, আশা করেছেন যুক্তিসঙ্গত উত্তরের।

আমাদের আবাসিত বিশ্বের যাবতীয় বিষয় সম্পর্কে জানা কারো পক্ষে সম্ভব নয়। কাজেই বুদ্ধিবৃত্তিক শ্রম-বিভাজন ভবিষ্যতেও বজায় থাকবে। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর জন্য এ বিভাজন দরকারী, জ্ঞান নিজেই তা দাবী করে, একে ঘিরেই সংগঠিত পশ্চিমের সমাজ। তবু আমার মনে হয় মানবসমাজ সম্পর্কিত অধিকাংশ জ্ঞানই সাধারণ বোধবুদ্ধি দিয়ে বোঝা সম্ভব—অর্থাৎ সেই বুদ্ধি যা সাধারণ মানবিক অভিজ্ঞতা থেকে বেড়ে ওঠে; এবং এই জ্ঞান একরকম সমালোচনামূলক মূল্যায়নেরও আওতায়। এই দুইটা জিনিষ, সাধারণ বোধবুদ্ধি আর সমালোচনামুখি মূল্যায়নই সামাজিক ও সাধারণ বুদ্ধিবৃত্তিক গুণাবলী যা সবার নাগালের ও চর্চার মধ্যে, কেবল গুটিকয় মার্কা মারা বিশেষজ্ঞের বাড়তি সুবিধা নয়। তবু চীনা আরবী শেখার জন্য কিংবা অর্থনৈতিক, ঐতিহাসিক ও জনসংখ্যার প্রবণতা বুঝার জন্য প্রশিক্ষণের দরকার আছে। এবং প্রতিষ্ঠানকেই এ ধরনের প্রশিক্ষণ প্রাপ্তির স্থান হিসেবে গড়ে তুলতে হবে; এ বিষয়ে আমার কোনো সন্দেহ নাই। সমস্যা হলো যখন প্রশিক্ষণ চক্র তৈরি করে ও সাংবাদিক স্বভাবের বিশেষজ্ঞ বানায় যারা সম্প্রদায়ের বাস্তবতা, শুভবোধ ও বুদ্ধিবৃত্তিক দায় থেকে দূরে সরে গিয়ে যেকোনো মূল্যে বিশেষ স্বার্থান্বেষী দলকে সহায়তা করে অথবা স্বেচ্ছায় ও প্রশ্নছাড়া নিয়োজিত হয় ক্ষমতার সেবায়। উভয়ক্ষেত্রেই, ইসলামের মতো ভিন্ সমাজ ও সংস্কৃতিকে বিশদ বিশ্লেষিত ও উপলব্ধ করার বদলে কাভার করা হয়। এর মধ্যে ভয়ও থাকে যে নতুন কল্পকাহিনী সৃষ্টি হতে পারে, এবং অজানা ধরনের সব তথ্য-বিচ্যুতি ঘটতে পারে।

গত কয়েক বছরের যে-কোনো সময়ের বিবেচনায় দেখা যায়, অনেক প্রমাণও আছে যে, সামগ্রিকভাবে অপশ্চিমা সমাজ ও বিশেষভাবে ইসলামী বিশ্ব মার্কিন বা ইউরোপীয় সমাজবিজ্ঞানী, প্রাচ্যতাত্ত্বিক ও অঞ্চলবিশেষজ্ঞদের চিহ্নিত বিন্যাসের সাথে খাপ খায় না। এ ব্যাপারটাকে সবচেয়ে ভালোভাবে দেখিয়েছেন সরবোনে ইসলামী চিন্তার অধ্যাপক আলিজিরিয়ার পণ্ডিত সমালোচক মোহাম্মদ আরকন :

> "ইসলামী অধ্যয়ন" বিষয়ক বিদ্যায়তনিক জ্ঞানভাষ্য এখনো ব্যাখ্যা দেয়নি যে, কিভাবে এত বিচিত্র ক্ষেত্র, তত্ত্ব, সাংস্কৃতিক পরিসর, শাস্ত্র ও ধারণাসমূহ একটি মাত্র শব্দ "ইসলাম"-এর সাথে জড়িয়ে গেছে এবং কেন ইসলাম বিষয়ক আলোচনা এমন একমাত্রিক। অন্যদিকে, পশ্চিম সমাজ সম্পর্কিত অধ্যয়নের বৈশিষ্ট্য হচ্ছে সযত্ন নিরীক্ষণ, খুঁটিনাটির প্রতি মনোযোগ, সূক্ষ্ম পার্থক্য বিচার ও তত্ত্ব রচনা। বস্তুত, পশ্চিমা সমাজ সম্পর্কিত অধ্যয়নের বিকাশ এখনো এ ধারাতেই অব্যাহত এবং তা সরে যাচ্ছে "ইসলাম" ও "আরব বিশ্বের" অধ্যয়নে গৃহীত দুর্ভাগ্যজনক পন্থা থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন দিকে। (১৯৯৬ সালের আগষ্টের ১ তারিখের লন্ডন রিভিউ অব বুকসে ম্যালিস রুথভেনের লেখায় উদ্ধৃত)।

www.pathagar.com

এটি নিশ্চিত সত্য যে গোটা ইসলামী বিশ্ব মার্কিন-বিরোধী ও পশ্চিম-বিরোধী নয়, তেমনি তৎপরতার মধ্যেও সে জগত একীভূত না, এমনকি ভবিষ্যৎবাণী করার মতোও নয়। এইসব পরিবর্তনের বিরক্তিকর তালিকা না দিয়ে আমি বলছি যে এই অবস্থার অর্থ হল ইসলামী বিশ্বে নয়া ও অনিয়মিত বাস্তবতা দেখা দিচ্ছে; এও সত্য যে, বিগত বছরগুলোয় প্রদত্ত তত্ত্বমালার শান্ত বিবরণে বাধ সেধে উত্তর-উপনিবেশি বিশ্বের অন্যান্য অঞ্চলেও এখন একই রকম অনিয়মিতি দৃশ্যমান। "অনুন্নয়ন" বা "আফ্রো-এশীয় মানসিকতা"র পুরনো সূত্র পুনরায় আওড়ানো যথেষ্ট বোকামীর কাজ। কিন্তু এগুলোকে পশ্চিমের দুঃখজনক পতন, উপনিবেশবাদের দুর্ভাগ্যজনক অবসান, এবং আমেরিকার ক্ষমতা হ্রাসের সাথে সম্পর্কিত করা—আমি সর্বোচ্চ দৃঢ়তার সাথে বলবো—খাঁটি নির্বুদ্ধিতা মাত্র। স্থান ও আত্ম-পরিচয়ের বিচারে আটলান্টিক থেকে হাজার হাজার মাইল দূরবর্তী দেশগুলোকে আমার আকাঙ্ক্ষামতো পরিবর্তন করার কোনো উপায় নাই। কেউ একে নিরপেক্ষ বাস্তবতা বলে স্বীকার করে নিতে পারেন, সেইসাথে একে ভালো কোনো ব্যাপার বলে ভাবতে নাও পারেন (আমি যেমন মনে করি)। এক নিঃশ্বাসে ইরানকে হারানো তাই ইরানের হুমকি এবং পশ্চিমের পতনের কথা এক নিঃশ্বাসে বলে যাওয়ার মধ্য দিয়ে আমরা পদক্ষেপ-গ্রহণে অধিকাংশ উপায় আগাম বন্ধ করে দিই; কেবল খোলা থাকে পশ্চিমের উত্থান এবং ইরান ও উপসাগরীয় এলাকা পুনর্দখলের পথ, যে প্রবণতা দেখা যাচ্ছে গত দুই যুগ ধরে। ইসলামী বিশ্বে বৃটিশ বা ফরাসি কিংবা মার্কিন আধিপত্যের অবসানের কারণে যেসব "বিশেষজ্ঞরা" তাদের লেখায় বিলাপ করেন (বা আধিপত্য পুনরুদ্ধারের ওকালতি করেন) তাদের সাম্প্রতিক সাফল্য—আমার মতে—আসলে ভয়ংকর এক প্রমাণ যে, নীতি-নির্ধারকদের মনের গভীরে কোন ইচ্ছা ঘাপটি মেরে থাকতে পারে; তেমনি আগ্রাসন ও পুনর্দখলের প্রয়োজনীয়তা কত তীব্র তারও ইঙ্গিত[৩২]। জেনে বা না জেনে এই প্রয়োজনীয়তার পক্ষে কাজ করছেন বিশেষজ্ঞরা। স্থানীয়দের মধ্যে অনুগত যে-অংশটি একই সুরে গলা মেলাচ্ছে তারাও মোসাহেবীর জীর্ণ ইতিহাসেরই অংশ; এরা কিছুতেই তৃতীয় বিশ্বের নয়া পরিপক্কতার চিহ্ন নয় (যদিও কেউ কেউ তা-ই মনে করেন)।

আজকাল পশ্চিমে দখলের প্রসঙ্গ বাদে, অন্য ক্ষেত্রে যে "ইসলাম" বোঝানো হয়ে থাকে তা আসলে ইসলাম নয়। সেক্ষেত্রে আমাদেরকে একটি বিকল্প হাজির করতে হবে। যদি "ইসলাম" যতটা বলার কথা তার চেয়েও কম অবহিত করে, এবং যদি এটি যতটা না প্রচার করে তার চেয়েও বেশি আড়াল করে তাহলে কোথায় এবং কীভাবে আমরা সেই তথ্যের খোঁজ করব যা ক্ষমতার নয়া স্বপ্ন বা পুরনো ভীতি ও পক্ষপাতিত্বের কোনোটাকেই উৎসাহিত করবে না। কোন ধরনের অনুসন্ধান এ পর্যায়ে সবচেয়ে কার্যকর ভূমিকা পালন করবে তা আমি এই বইয়ে উল্লেখ, কোনো কোনোটির বর্ণনাও দিয়েছে; আমি বলেছি এগুলোর শুরু এই ধারণা নিয়ে যে, জ্ঞান হচ্ছে তাফসীর; এও বলেছি সদাসতর্ক ও মানবীয় হতে হলে এবং জ্ঞানে পৌঁছতে হলে তাফসীরকে তার গৃহীত পদ্ধতি ও লক্ষ্য-উদ্দেশ্য সম্পর্কে সচেতন থাকতে হবে। কিন্তু

www.pathagar.com

অন্য সংস্কৃতি, বিশেষত ইসলাম-বিষয়ক তাফসীরের ক্ষেত্রে অন্তরালস্থিত পছন্দের বিষয়টির মুখোমুখি হচ্ছেন ব্যক্তি পণ্ডিত ও বুদ্ধিজীবীরা: তিনি ক্ষমতার সেবায় তার বুদ্ধি নিয়োজিত করবেন, নাকি সমালোচনা, সম্প্রদায়, সংলাপ ও নৈতিক বোধের কাজে লাগাবেন। এ যুগে তাফসীরের প্রথম পদক্ষেপ হচ্ছে পছন্দ ঠিক করা; কিন্তু তা স্থগিত করে রাখলে চলবে না, সিদ্ধান্তরূপে গৃহীত হতে হবে। পশ্চিমে ইসলাম সম্পর্কিত জ্ঞানের ইতিহাস যদি দখল ও আধিপত্যের সাথে অত্যন্ত ঘনিষ্ঠভাবে বাঁধা হয়ে থাকে, তাহলে এখন সেই বাঁধন ছিড়ে ফেলে দেয়ার সময় এসে গেছে। এ ব্যাপারে কোনো মাত্রার জোরপ্রদানই বেশি বলে গণ্য হবে না। কারণ তা না হলে আমরা যে এক দীর্ঘস্থায়ী উত্তেজনা—হয়তো যুদ্ধেরও মুখোমুখি হব কেবল তা-ই নয়, বিভিন্ন মুসলিম সমাজ ও রাষ্ট্রসমেত গোটা মুসলিম বিশ্বের কাছে তুলে ধরব বহু যুদ্ধ, অকল্পনীয় দুর্ভোগ ও সর্বনাশা অভ্যুত্থানের সম্ভাবনাও। এ ছাড়াও আছে এমন এক বিজয়ী "ইসলাম"-এর প্রসঙ্গ যা তার ভূমিকা পালনের জন্য প্রতিক্রিয়া, রক্ষণশীলতা ও বেপরোয়া মনোবৃত্তির মধ্য দিয়ে প্রস্তুত হয়ে থাকবে। জোর আশাবাদিতার আলোকেও কিছুতেই সুখকর নয় সে সম্ভাবনা।

www.pathagar.com

সংক্ষিপ্ত গ্রন্থপঞ্জি

ভিন্টেজ সংস্করণের ভূমিকা

1. Lustick, "Fundamentlism. Politicised Religion and Pietism," MESA Bulletin 30, 1996, p. 26.

ভূমিকা

1. Edward W. Said, *Orientalism* (New York : Pantheon Books, 1978; reprint ed., New York : Vintage Books, 1979).
2. Edward W. Said, *The Question of Palestine* (New York: Times Books, 1979; reprint ed., New York: Vintage Books, 1980).
3. এ বিষয়ের জন্য দেখুন: Robert Graham, "The Middle East Muddle," *New York Review of Books*, October 23, 1980, p. 26.
4. J.B. Kelly, Arabia, *The Gulf, and the West: A Critical View of the Arabs and Their Oil Policy* (London: Weidenfeld & Nicolson, 1980). p. 504.
5. Thomas N. Franck and Edward Weisband, *World Politics: Verbal Strategy Among the Superpowers* (New York: Oxford University Press, 1971).
6. দেখুন: Paul Marijnis, "De Dubbelrol van een Islam-Kennen," *NRC Handelsblad*, December 12, 1979.
7. দেখুন: Noam Choam Chomsky and Edward S. Herman, *The Washington Connection and Third World Fascism and After the Cataclysm: Postwar Indochina and the Reconstruction of Imperial Ideology*, vols. 1 and 2 of *The Political Economy of Human Rights* (Boston: South End Press, 1979).
8. দেখুন: David F. Noble and Nancy E. Pfund, j"Business Goes Back to College," *The Nation*, September 20, 1980, pp. 246-52.

প্রথম অধ্যায়: সংবাদ হিসাবে ইসলাম

1. দ্রষ্টব্য: Edward W. Said, *Orientalism*, pp. 49-73.
2. দ্রষ্টব্য: Norman Daniel, *The Arabs and Medieval Europe* (London: Longmans. Green & Co., 1975); *Islam and the West: The Making of an Image* (Edinburgh: University Press, 1960).
3. এ বিষয়ে আমার আলোচনা আছে "Bitter Dispatches From the Third World," *The Nation*, May 3, 1980, pp. 522-25-এ।
4. Maxime Rodinson, *Marxism and The Modern World*, trans. Michaedl Palis (London: Zed Press 1979). আরো দেখুন: Thomas Hodgkin, "The Revolutionary Tradition in Islam," *Race and Class* 21, no. 3 (Winter 1980): 221-37.
5. দেখুন সাম্প্রতিক তিউনিসিয়ান বুদ্ধিজীবীর আলোচনা: Hichem Djait, *L'Europe et l'Islam* (Paris: Editions du Seuil, 1979).Alain Groscichard, *Structure du serail: La Fiction du despotisme asiatique dans l'Occident classique* (Paris: Editions du Seuil, 1979).
6. দেখুন: Maxime Rodinson, *La Fascination de l'Islam* (Paris: Maspero, 1980).

www.pathagar.com

7. Albert Hourani, "Islam and the Philosophers of History," in *Europe and The Middle East* (London: Macmillan & Co., 1980), pp. 19-73.
8. এ বিষয়ে অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্ন আলোচনার জন্য: Syed Hussein Alatas, The Myth of the Lazy Native: *A Study of the Image of the Malays, Filipinos, and Javanese from the 16th to the 20th Century and in the ideology of Colonial Capitalism* (London: Frank Cass & Co., 1977).
9. দ্রষ্টব্য: Martin Kramer, *Political Islam* (Washington, D.C.: Sage Publications, 1980).
10. *Atlantic Community Quarterly* 17, no. 3 (Fall 1979): 291-305, 377-78.
11. Marshall Hodgson, *The Venture of Islam*, 3 vols. (Chicago and London: University of Chicago Press, 1974).
12. এর একটি সূচী হচ্ছে: "Middle Eastern and African Studies: Developments and Needs" commissioned by the U.S. Department of Health, Education and Welfare in 1967, written by Professor Monroe Berger of Princeton. আরো দেখুন: Said, *Orientalism*, pp. 287-93.
13. Michael A. Ledeen and William H. Lewis, "Carter and the Fall of the Shah: The Inside Story," *Washington Quarterly* 3, no. 2 (Spring 1980): 11-12-তে উদ্ধৃত।
14. Hamid Algar, "The Oppositional Role of the Ulama in Twentieth Century Iran," in Kikki R. Keddie, ed., *Scholars, Saints, and Sufis: Muslim Religious Institutions Scince 1500* (Berkeley, Los Angeles, and London: University of California Press, 1972), pp. 231-55.
15. ব্যাপারটি ফ্রেড হ্যালিডের ক্ষেত্রে সবচেয়ে সত্যি। দেখুন: Fred Halliday, *Iran: Dictatorship and Development* (New York: Penguin Books, 1979),
16. দেখুন: Edward Shils, "The Prospect for Lebanese Civility," in Leonard Binder, ed., *Politics in Lebanon* (New York: John Wiley & Sons, 1966), pp. 1-11.
17. Malcolm Kerr, "Political Decision Making in a Confessional Democracy," in Binder, ed., *Politics in Lebanon*, p-209.
18. এ বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ তথ্যের জন্য দেখুন: Moshe Sharett *Personal Diary* (Tel Aviv: Ma`ariv, 1979); এবং দেখুন প্রাক্তন সিআইএ উপদেষ্টার রচনা: Wilbur Crane Eveland, *Ropes of Sand: America's Failure in the Middle East* (New York: W.W. Norton & Co., 1980).
19. Elie Adib Salem, *Modernization Without Revolution: Lebanon's Experience* (Bloomington and London: Indiana University Press, 1972), p. 144.
20. Clifford Geertz, "The Integrative Revolution: Primordial Sentiments and Civil Politics in the New States," in *The Interpreatation of Cultures* (New York: Basic Books, 1973), p. 296.
21. দেখুন: Paul and Susan Starr, "Blindness in Lebanon," *Human Behavior* 6 (January 1977): 56-61.
22. দেখুন: আমার রচনা *The Question of Palestine*, pp. 3-53.
23. এ বিষয়ে অসাধারণ আলোচনার জন্য: Ali Jandaghi (pseud.), "The Present Situation in Iran," *Monthly Review*, November 1973, pp. 34-47.
24. দেখুন:James A. Bill, "Iran and the Crisis of '78," *Foreign Affairs* 57, no. 2 (Winter 1978-79): 341.
25. William O. Beeman, "Devaluing Experts on iran," *New York Times*, April 11, 1980; James A. Bill, "Iran Experts: Proven Right But Not consulted," *Christian Science Monitor*, May 6, 1980.
26. দেখুন: Noam Chomsky, "Objectivity and Liberal Scholarship," in *American Power and the New Mandarins: Historical and Political Essays* (New York: Pantheon Books, 1969), pp. 23-158.
27. দেখুন: Said, *Orientalism* pp. 123-66.

www.pathagar.com

www.pathagar.com

www.pathagar.com